# KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

| | |
|---|---|
| Record No. : KLMLGK 2007 | Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলি - ১৩ |
| Collection : KLMLGK | Publisher মীনা চৌধুরী |
| Title চতুরঙ্গ | Size 7" x 9.5" 17.78 X 24.13 c.m. |
| Vol. & Number ৬০/১<br>৬০/2 | Year of Publication : বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৭ ।। Aug 2000<br>শ্রাবণ - আশ্বিন ১৪০৭ ।। Dec 2000 |
| | Condition : Brittle Good ✓ |
| Editor আবদুর রাউফ | Remarks : |

| |
|---|
| C.D. Roll No. : KLMLGK |

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

# চতুরঙ্গ

বর্ষ ৬০ সংখ্যা ২ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৭

ইতিহাসকে সাধারণ পাঠক ও ছাত্রদের কাছে চিত্তাকর্ষক একটি বিষয় হিসাবে উপস্থাপনার শৈলী নিয়ে আলোচনা করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ অধ্যাপক বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়।

সাম্প্রতিক কালের কয়েকজন ভারতীয় ঐতিহাসিকের রচনায় নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতিরোধের রাজনীতি এবং ধর্মীয় চেতনার পারস্পরিক সম্পর্ক যেভাবে প্রাধান্য পেয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছেন অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা।

তাপস সেনের ধারাবাহিক আত্মকথন 'আলোছায়ার পথিক'-এ এবার মিনার্ভা-পর্ব। মিনার্ভা থিয়েটারের উজ্জ্বল দিনগুলিতে উৎপল দত্ত-রবিশঙ্কর-তাপস সেনের সম্মিলিত সৃজনপ্রয়াস — সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী।

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত-র 'বঙ্গসংহার এবং' ধারাবাহিকে এবারের আলোচ্য ঢাকার ভাষা আন্দোলনের সূচনাপর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ার কাহিনী।

'শ্রীচৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান' গ্রন্থটি নিয়ে অনিল আচার্য লিখিত বিশেষ নিবন্ধের প্রতিপাদ্য -- ইউরোপীয় ছাঁচে না হলেও নিম্নবর্গের মানুষদের একত্রিত করে সেই চতুর্দশ শতকেই দেশবাসীর চৈতন্যে প্রকৃতপক্ষে নবজাগরণ এনেছিলেন শ্রীচৈতন্য।

চতুরঙ্গের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আতাউর রহমানের সময়ের স্মৃতিচারণ।

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' নিয়ে বিতর্ক এবং অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ।

FERROUS SCRAP
Constituted by Ministry of Steel, Govt. of India
COMMITTEE

ACTIVITIES OF THE COMMITTEE

Development of Steel Scrap Handling & Processing Facilities

Promotion of Steel Consumption & Use of Ferrous Scrap

Development of Ship-breaking Industry in India

Promotion of Secondary Steel Industry in India

Commissioning of Studies for Projecting Availability of Steel Scrap



Secretariat
Development Commissioner for Iron & Steel,
Nizam Palace, 7th Floor,
234/4, Acharya Jagadish Chandra Bose Road,
Calcutta – 700 020
Phone : 247 9771-74 & 287 0928

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৭
বর্ষ ৬০ সংখ্যা ২

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গরেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০


- ইতিহাস : তত্ত্বের চেয়ে জরুরি আখ্যান — বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় — ১০৫
- প্রতিরোধ, ধর্ম ও নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক — দিব্যেন্দু হোতা — ১১০

**ধারাবাহিক আত্মজীবনী**

- আলোছায়ার পথিক — তাপস সেন — ১১৪
- এখানে আশ্বিন — সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় — ১২৭
- বন্যা — সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত — ১২৮
- আমাদের হাওয়া বদল — বাসুদেব দেব — ১২৯
- কুরুক্ষেত্র — একরাম আলি — ১৩০
- অবক্ষয় — আরতি মুখোপাধ্যায় — ১৩১
- মহাজীবন — তৃষ্ণা বসাক — ১৩২
- বিদায় — জয়নাল আবেদীন — ১৩৩
- গীতাঞ্জলি আকাশ — সুদীপ চক্রবর্তী — ১৩৪

**ধারাবাহিক সন্দর্ভ**

- বঙ্গসংহার এবং — সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত — ১৩৫

**বড় গল্প**

- যেখানে সীমান্ত নেই — প্রফুল্ল রায় — ১৪৭

**সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি**

- আতাউর রহমান : প্রাসঙ্গিক চালচিত্র — বারীন্দ্রনাথ দাশ — ১৫৭
- রাঢ় বাংলার আখ্যান : কথক রামকুমার — মেঘ মুখোপাধ্যায় — ১৫৯

**গ্রন্থসমালোচনামূলক নিবন্ধ**

- চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান — অনিল আচার্য — ১৬৩

**গ্রন্থসমালোচনা**

- সুরজিৎ দাশগুপ্ত · পুলক নারায়ণ ধর · বেণু গুহঠাকুরতা — ১৬৮
- অসীম রেজ · উৎপল ঝা

**স্মরণ**

- মতাদর্শ ও কবি অরুণ মিত্র — অর্ধেন্দু চক্রবর্তী — ১৭৯
- সময়ের কবি মণীন্দ্র রায় — সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত — ১৮২
- বোধি-স্পৃষ্ট কবি মণীন্দ্র রায় — পবিত্র মুখোপাধ্যায় — ১৮৪

**চিঠিপত্র**

- প্রসঙ্গ : 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-এর নাট্যসমালোচনা — ১৮৬


মূল্য: ১৫ টাকা
ডাকে: ১৮ টাকা
শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ইম্প্রেশন হাউস, ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা - ৯ থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা – ১৩ থেকে প্রকাশিত
দূরভাষ : ২৩৭-৩৭৭০
শিল্প পরিকল্পনা: রণেন আয়ন দত্ত
অক্ষর বিন্যাসে – নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা – ৬
সম্পাদক : আবদুর রউফ

# সাক্ষরতাই দেশের মূল সম্পদ

বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে
রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে শিক্ষার আলো।
কমছে নিরক্ষরতা
বাড়ছে নবসাক্ষরের সংখ্যা।
কেবল উৎসাহদান নয়
আসুন, আমরাও নেমে পড়ি কাজে।
শিক্ষা আমাদের প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
আই.সি.এ. ৪৯৯৯/২০০০/তথ্য ও সংস্কৃতি


প্রবন্ধ

# ইতিহাস ঃ তত্ত্বের চেয়ে জরুরি আখ্যান


বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়


বছর পাঁচেক আগের কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ আয়োজিত এক শিক্ষক-শিক্ষণ কর্মশালায় যোগ দিতে এসেছিলেন দেশের নানা প্রান্ত থেকে জনা তিরিশ ইতিহাসের অধ্যাপক। কেউই বিশেষ তরুণ নয়, অনেকে তো রীতিমত প্রৌঢ়। কথাটা বলার উদ্দেশ্য, এঁদের বেশির ভাগই অনেক দিনের পোড় খাওয়া শিক্ষক, এবং সেই সুবাদে ধরে নেওয়া যায় ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকিবহাল। প্রায় একুশ দিনের কর্মশালা। তাই নানা সময়ে, কখনও বা অবসরেও, এঁদের নানা প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম। সাধ্যমত উপদেশ বা পরামর্শও দিতাম। এঁদেরই একজন যতদূর মনে পড়ে নাগাল্যান্ড অথবা মেঘালয়ের কোনও কলেজে কর্মরত এক অধ্যাপক, এমন একটা কথা বললেন যা আমাদের প্রায় হতবাক করে দিল। বললেন,তাঁর অঞ্চলে বিষয়কে ভালবেসে কেউ ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনো করতে আগ্রহী নয়। অন্য পছন্দসই বিষয়ে সুযোগ না পেলে নেহাত দায়ে পড়ে ইতিহাস নিতে বাধ্য হয়। বিষয়ে ছিটেফোঁটাও আগ্রহ নেই। খোঁচাখুঁচি করলে বরং পাল্টা প্রশ্ন করে, ইতিহাস পড়ে কী হবে? অকপট এই কথাগুলো শুনে স্মৃতির উজান বেয়ে বছর পঁচিশ আগের একটা অভিজ্ঞতা মনে পড়ল। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি, আশুতোষ কলেজে তখন সদ্য পড়াতে ঢুকেছি। গা থেকে কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ধ পুরোপুরি কাটেনি, গেটের বুড়ো দারোয়ানও অনেক সময় ছাত্র ভেবে ভুল করে। তবে বয়স কম থাকার একটা বড় সুবিধা হচ্ছে, ছাত্রদের সঙ্গে অনেক সহজে বন্ধুর মতো মেশা যায়। হাজার হোক ব্যবধানটা তো আর প্রজন্মের নয়। কিছুদিন ধরে লক্ষ করছিলাম একটি ছাত্র লেখাপড়ার ব্যাপারে ধারাবাহিকভাবে অমনোযোগী। ক্লাসে উপস্থিতি অনিয়মিত, অথচ কলেজে প্রায় রোজই আসত, ইতি-উতি ঘুরে বেড়ায়, ক্যান্টিনে সময় কাটায়, অথবা কলেজের সামনে রেলিং-এর উপর বসে বন্ধুদের সঙ্গে গুলতানি করে। একদিন তাকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মা-বাবা কি তোমার পড়াশুনোর দিকে একেবারেই লক্ষ রাখেন না? একটু আমতা আমতা করে যা বলেছিল তার সারমর্ম হল,বাবা মহাকরণে সেই সময়ের এক ডাকসাইটে আমলার ব্যক্তিগত সহকারী। তাঁর এ সব তুচ্ছ দিকে নজর দেবার সময় নেই। মা অবশ্য গৃহবধূ, তবে উঠতি বয়সের ছেলেকে একটু সমঝে চলেন। তবু যে ছেলের পড়ার ঘরে অতর্কিতে হানা দেননি তা নয়। গল্পের বই পড়তে দেখলেই বাবার কাছে নালিশ করেন। ছেলেটিকে তাই মার চোখে ধুলো দেবার জন্য নিত্যনতুন নানা ফন্দিফিকির খুঁজে বার করতে হয়। ইতিহাসের মোটা বই-এর মধ্যে অশ্রীশ বর্ধনের গোয়েন্দা গল্পের বইটাকে রেখে সে একাগ্রচিত্তে পড়ে শেষ করছিল তখন। গল্পের বইয়ে যার এত অখণ্ড মনোযোগ, ইতিহাসের বই তাকে টানে না কেন? উত্তরে বলল,ইতিহাস মানেই তো কেবল সন তারিখ আর ঘটনার শুকনো নামতা। কোনও গল্প নেই, কেবলই মুখস্ত করার বিষয়। কত আর মনে রাখা যায়! চেষ্টা যে করি না তা নয়, তবে একদিক যদি মনে থাকে,অন্য দিক ভুলি। এ আর ভাল লাগে না। নেহাৎ বাবা রাগারাগি করবেন, না হলে ইতিহাসের বইগুলোকে কবে বিসর্জন দিয়ে দিতাম।

সেদিনই প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম, ইতিহাসে সাধারণ ছেলেমেয়েদের আগ্রহ কত দ্রুত কমতে শুরু করেছে, তবে শুধু ইতিহাসই নয়। অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছিল, জ্ঞানচর্চার সাধারণ সব পাঠক্রমেই তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। এটা আজও সমান সত্য। আমাদের ছাত্রজীবনে দেখেছি, বিজ্ঞানের উজ্জ্বল ছাত্র আই.আই.টি তে ভর্তি হবার সুযোগ অবহেলাভরে প্রত্যাখ্যান করে কলকাতার ভাল কলেজে পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়ে পড়তে এসেছে। পরে হয় বিশিষ্ট শিক্ষক অথবা প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক হিসাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিতও হয়েছে। অথবা মফস্সলের

অনামা স্কুলের থেকে চোখ-ধাঁধানো রেজাল্ট নিয়ে পাশ করে ইতিহাস অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে তার পছন্দের বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছে। এমন নয় যে তারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে পারত না। যে কোনও কলেজের বিজ্ঞান বিভাগ তাদের লুফে নিত। এরা ব্যতিক্রম নয়, এই দলে অনেকেই থাকত। এবং শহরের দু'একটা বড় কলেজেই শুধু নয়, মফস্‌সলের দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকা অনেক কলেজেই এই ধরনের অনেককে খুঁজে পাওয়া যেত। তারপর ধীরে ধীরে ছবিটা কত বদলে গেল। এখন তো স্কুলের গণ্ডি পেরোবার অনেক আগে থেকেই জয়েন্ট এন্ট্রান্সের স্বপ্ন তাদের মনে পাকাপোক্ত জায়গা করে নেয়। মা-বাবা-শুভার্থীরা সেই স্বপ্নকে কীভাবে সফল করা যায় তার রসদ জোগান দিয়ে যান। স্কুলের সময়টুকুন বাদ দিয়ে সারাক্ষণ এক টিউটর থেকে অন্য টিউটর, যাঁদের মুখ্য পরিচিতিই হল জয়েন্ট উতরোবার কারিগর। কার কোচিং থেকে গড়ে কতজন জয়েন্ট এন্ট্রাসে পাশ করছে তাই দিয়ে তাঁদের পণ্যমূল্য নির্ধারিত হয়। যাঁর সাফল্যের হার যত বেশি, তাঁর বাজারদরও তত চড়া। হবু ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার তৈরির এই সব ছোট ছোট কারখানায় যারা ভর্তির জন্য অগ্রিম আসন সংরক্ষণ করে রাখছে তারা যে সবাই মনে প্রাণে এই পেশাগুলোকে ভালবাসে তা মনে করার কোনও কারণ নেই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, এবং জোর দিয়ে বলতে পারি, এদের অনেকেই যে কোনও মূল্যে সাধারণ পাঠক্রম থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিয়ে বেরিয়ে যাবার সুযোগ পেলে তো কথাই নেই। মোটামুটি নিখরচায় পড়া শেষ করে একটা ভদ্রগোছের চাকরি পাওয়া যায়। যদি দু'তিনবারের চেষ্টাতেও সফল না হতে পারে, তা হলেও ক্ষতি নেই। মা-বাবার আর্থিক সাচ্ছল্য থাকলে হাতের কাছেই অজস্র প্রাইভেট মেডিক্যাল অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছড়াছড়ি। এগুলো সবই চলে ফেল কড়ি মাখ তেল নীতিতে। নিজের দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থা লাটে ওঠার ফলে বাঙালি রোগী যেমন হায়দ্রাবাদ বা চেন্নাই দৌড়োয়, এও ঠিক তাই। অন্যান্য প্রদেশ চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা মেডিক্যাল কলেজ খুলেছে। সেগুলোতে জয়েন্টে ব্যর্থ বাঙালি ছাত্রদের ভিড়। মরশুমে অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের দেখে মনে হবে বুঝি বা বাংলারই কোনও মফস্‌সল শহর। তবে ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার এত ব্যাকুলতা দেখে এ কথা মনে করার কারণ নেই যে এই সব ছাত্ররা নিজেদের পেশায় সাফল্যের জোয়ার আনবে। আমার এক সহকর্মীর কথা জানি। তাঁর ছেলে খড়গপুর আই.আই.টিতে একটা সাদামাটা বিষয় নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পায়। একই সঙ্গে যাদবপুরেও সুযোগ পেল আরও ভাল বিষয় নিয়ে পড়ার। সে কিন্তু যাদবপুরের দিকে না তাকিয়ে চলে গেল খড়গপুরে। তারপর তুলনায় নিরেশ বিষয়ে বি.ই. পাশ করেই পরের ধাপ, সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে জোকায় ম্যানেজমেন্ট কোর্সে ভর্তি হওয়া। একবছর পর সেখান থেকে বেরিয়ে একটা মার্কিন ব্যাঙ্কে সহকারী ম্যানেজার। বর্তমানে সে পাড়ি জমিয়েছে মার্কিন মুলুকে, এর সঙ্গে তুলনীয় উদাহরণ আমার আপনার হাতের কাছেই অনেক পাবেন। আজ ভারতীয় প্রশাসনে এমন অনেক কর্মীকে পাবেন যাঁরা শিক্ষাগত যোগ্যতায় ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার। ফি-বছর হায়দ্রাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জাতীয় পুলিশ অ্যাকাডেমিতে আই.পি.এস-এ সদ্যনিযুক্ত অথবা কর্মরত অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি চিকিৎসক অথবা কৃৎকৌশলীদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। এই সব বিচ্ছিন্ন উদাহরণগুলো একত্রিত করলে একটা ছবিই বেরিয়ে আসে। অধীত জ্ঞানের ভিত্তিতে নিজ নিজ পেশায় সাফল্য অর্জন করার কষ্টার্জিত পথের সহজ বিকল্প খুঁজতেই এঁদের অনেকেই ব্যস্ত। কেউ চাইছেন অর্থকৌলিন্য, আবার অন্য কেউ চাইছেন ক্ষমতা। নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান, অবশ্যই উজ্জ্বল ছাত্রদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিষয়কে ভালবাসেন না। বরং তাঁরা বিষয়কে ব্যবহারিক জীবনে সাফল্যের সোপান হিসাবে ব্যবহার করছেন। এই প্রবণতা উদ্বেগজনক। সবচেয়ে বড় কথা, এ দেশে লেখাপড়া শেখা ছেলেমেয়ে চাঁদির হাতছানিতে বিদেশে পা বাড়ালে আমরা সমালোচনা করি। প্রায়শই বলি গরিব করদাতার পয়সায় চিকিৎসক অথবা প্রযুক্তিবিদ হয়ে বিনিময়ে কিছু ফিরিয়ে দিল না, সবটাই আত্মসাৎ করল। দেশের মধ্যে থেকেও যাঁরা বিজ্ঞানের বিশেষ শাখায় অর্জিত জ্ঞানের এইভাবে অপচয় করেন তাঁরাও কিন্তু গরিব করদাতার সঙ্গে প্রকারান্তরে তঞ্চকতাই করছেন, হয়ত বা করতে বাধ্য হচ্ছেন, আক্ষেপ এইখানেই। বিষয়ের প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ থাকলে হয়ত তার জন্য কিছুটা কষ্টস্বীকার করা যেত, সেই আকর্ষণ অনেকের ক্ষেত্রেই কমে আসছে।

বিজ্ঞানেরই যদি এই হাল, সমাজবিজ্ঞানের অবস্থা যে আরও নৈরাশ্যজনক সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় ইতিহাসের খোঁজখবর একটু বেশি রাখি, তাই ইতিহাসের সমস্যা একটু বেশি করেই চোখে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের তিনটে বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা বলছি। পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজকর্মে যেতে হয়। সর্বত্রই একই ছবি, খুব একটা ইতরবিশেষ নেই। গবেষণাপত্র পরীক্ষা করার অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরা জানেন, গবেষণার বিষয়বস্তুতেও প্রায়শই ক্লান্তিকর একঘেয়েমি। নেহাতই যেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুর কমিশনের ঠেলায় পড়ে কিছু একটা বিষয়



নিয়ে গবেষণা করতে হয় তাই করা, তার মধ্যেও যে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম নেই তা নয়, তবে বেশির ভাগই যেন দায়সারা কাজ। না করলে চাকরির পরের ধাপে ওঠা যাবে না, তাই যা হোক তা হোক করে কিছু একটা দাঁড় করানো দরকার। আদতে যেটা দরকার সেটা হল ডিগ্রি। বিষয় যত তুচ্ছাতিতুচ্ছ হোক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না, এরই অন্য নাম স্পেশালাইজেশন। আচার্য যদুনাথ সরকার তাঁর জীবনসায়াহ্নে লেখা শেষ প্রকাশিত প্রবন্ধে অকিঞ্চিৎকর বিষয় নিয়ে গবেষণার এই প্রবণতাকে তীব্র শ্লেষে বিদ্ধ করেছিলেন। এর বিরুদ্ধে যথাসময়ে সতর্কও করে দিয়েছিলেন, কিন্তু কিছু ফল হয়নি। এর নানা কারণ। তার মধ্যে একটা হল, ষাটের দশকের গোড়ার দিক থেকেই যদুনাথ এবং তাঁর গবেষণার অন্তর্লীন তত্ত্বের বিরুদ্ধে সচেতন এবং প্রায়শই অহেতুক প্রতিক্রিয়া। যদুনাথের দিগন্তপ্রসারী ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি, তথ্যকে বিশ্লেষণ করার তাঁর বিরল দক্ষতা, সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অনায়াসে বিচরণের ক্ষমতা এগুলোকে অনুধাবন না করে অনেকে কাদাখোঁচার মতো তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণের সহজ পথ বেছে নিলেন। এমনও কথা তখন কানে এসেছে যে যদুনাথ নাকি ভালমত ফার্সিও জানতেন না। সন্দেহ নেই এইসব অভিযোগের অনেক কিছুই ছিল অসূয়াপ্রসূত। যদুনাথের মতো ইতিহাসের বিশাল দিগন্তে ডানামেলে স্বচ্ছন্দে উড়ে চলার ক্ষমতা যাঁদের ছিল না, তাঁদের অনেকেও প্রকৃত সমালোচকদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে জাহির করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। অবশ্যই আমি সদর্থক সমালোচনার কথা বলছি না। যদুনাথের ইতিহাসচর্চার কিছু অনিবার্য সীমাবদ্ধতা অবশ্যই ছিল। পরবর্তীকালে সতীশচন্দ্র, ইরফান হবিব, আথার আলি প্রমুখের গবেষণা সেইসব সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে মুঘল ইতিহাসকে সমাজ এবং অর্থনীতির প্রেক্ষিতে স্থাপন করতে পেরেছে, ফলে অনেক নতুন বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়েছে। আজকাল তো শুনি মুঘল সাম্রাজ্য আদপে একটা কেন্দ্রীভূত স্বৈরতন্ত্র ছিল কি না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ইতিহাসে বিতর্ক অবশ্যই কাম্য। বিতর্কের মধ্য দিয়েই ইতিহাস এগিয়ে চলে। তবে যদুনাথ এবং তাঁর প্রজন্মকে যাঁরা কারণে অকারণে ঠেস দিয়ে কথা বলেন, তাঁরা অনেকেই একটা কথা প্রায়ই ভুলে যান। যদুনাথ, সুরেন্দ্রনাথ সেন বা যদুনাথের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু জি.এস. সরদেশাই-রা ইতিহাসকে পাঠযোগ্য করার দিকে বিশেষভাবে নজর দিতেন। অর্থাৎ একজন বিশেষজ্ঞের লেখা বই কেবলমাত্র তাঁর ঘরানার অন্তর্ভুক্ত অন্য বিশেষজ্ঞরাই পড়বেন, সীমিত সংখ্যক পাঠকের মধ্যে সান্ধ্যভাষার মতোই তা ঘোরাফেরা করবে — এই তত্ত্বে তাঁরা বিশ্বাস করতেন না। যদুনাথের কথাই ধরুন। নিজে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন। ইংরেজিতে এম.এ.পাস করার পর প্রথমে তিনি ইংরেজি সাহিত্যেরই অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। সাহিত্যের কৃতী ছাত্র হবার সুবাদে অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গেও তিনি বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। কোথায় যেন দেখেছিলাম, এখন আর তথ্যসূত্র সঠিক মনে নেই, যদুনাথের পাঁচ খণ্ডে লেখা ঔরঙ্গজেবের জীবনীতে পঞ্চমাঙ্ক গ্রীক ট্র্যাজেডি-র প্রভাব পড়েছিল। গ্রিক বিয়োগান্ত নাটকের নায়কের মতো ঔরঙ্গজেবের ওপরেও নেমেসিসের অমোঘ প্রভাব। তাই বিরল প্রতিভার অধিকারী, আদর্শ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের কাছে ঔরঙ্গজেব হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। যদুনাথের ইতিহাস-চেতনার প্রশ্নে আপাতত যাচ্ছি না। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের জীবনী লেখার ক্ষেত্রে অথবা মুঘলসাম্রাজ্যের পতনের আলেখ্য আঁকবার সময় যদুনাথ আখ্যানের দিকে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন, এবং এই ক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার তুলনা ঐতিহাসিকদের মধ্যে খুব বেশি পাওয়া যায় না। মাঝেমধ্যে গুরুপাক নীতিকথা আখ্যানের ছন্দপতন ঘটালেও শেষ পর্যন্ত পাঠক তাঁর বর্ণনাভঙ্গির মোহে আবিষ্ট হয়ে থাকেন। মনে হয় যেন ইতিহাসের আধারে সাহিত্যপাঠ। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাদু ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়ার সময় মনে হয়, স্থান-কাল-পাত্রকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি যেন যদুনাথেরই অনুসারী। একই কথা কালিকারঞ্জন কানুনগো-র 'রাজস্থান-কাহিনী'র ক্ষেত্রেও খাটে।

এই কথাগুলো বলার একটা বিশেষ কারণ আছে। ইদানীং ইতিহাস থেকে আখ্যান যেন ক্রমশ পিছু হঠছে। আর তার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা থেকে ধার করে আনা তত্ত্ব অথবা রাশিবিজ্ঞান। যদুনাথ-সরদেশাই-সুরেন্দ্রনাথ সেন-রা মুঘল-মারাঠা ইতিহাসের নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করার সময় ভাষাবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব অথবা সমাজতত্ত্বের চটকদার মোড়ক খুঁজে বেড়াননি। তাঁদের তা প্রয়োজনও হয়নি। যা তাঁরা বলেছেন তা এতই গুরুত্বপূর্ণ, যেভাবে বলছেন তা এতই আকর্ষণীয়, যে স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হবার কোনও তাগিদই তাঁরা অনুভব করেননি। ধার করা তত্ত্ব যে সব সময়েই নিষ্ফলা তা বলছি না, কিন্তু এর জন্য অধিকারীকে উপযুক্ত হতে হয়। অনধিকারীর হাতে পড়লে তত্ত্বও ফুটবে না, ইতিহাসও হবে না। অশীন দাশগুপ্তের 'মালাবার-ইন এশিয়ান ট্রেড' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা উপলব্ধি করেছেন বাণিজ্যের ইতিহাসও কত সুখপাঠ্য হতে পারে, জাহাজের আনাগোনা অথবা আমদানি-রপ্তানির ওঠাপড়ার ফাঁকে মার্তণ্ডবর্মার রক্তমাংসের অবয়বটাকে সঠিকভাবে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না, হাতের কাছের দু-একটা উদাহরণ দিলাম। এ ছাড়া আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। এঁরা কিন্তু তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত থেকেও

তার প্রলোভন থেকে দুরে থেকেছেন, যেমন পরবর্তীকালে নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বা অমলেশ ত্রিপাঠীর মতো প্রথিতযশা ঐতিহাসিকেরা। সিংহ তো তাঁর ভাষায়, 'পপ্ সোসিওলজি'-র থেকে শতহাত দূরে নিজের অবস্থান বেছে নিয়েছিলেন, অমলেশ ত্রিপাঠীও তাঁর জীবনের শেষের দিকের এক সাক্ষাৎকারে এ-বিষয়ে তাঁর অভিমত নির্দ্বিধায় জানিয়েছিলেন, লেভি-স্ত্রাউস-ফুকো-দেরিদার ককটেল তাঁর কাছে লোভনীয় মনে হয়নি, ইতিহাসকে তিনি কেবল অর্থ ও ব্যাখ্যার সমস্যা হিসাবে দেখতে চাননি। বিনির্মাণের চাইতে পুনর্নির্মাণ তাঁর কাছে অনেক জরুরি বলে মনে হয়েছিল। এঁরা কেউ হয়ত তথ্য-সংগ্রহে বেশি জোর দিয়েছিলেন, কেউ আবার তথ্যের সঙ্গে আখ্যানকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন, কিন্তু ইতিহাসের জগতে যাঁরা টাইটান, তাঁরা কেউই শুধু ধার করা পোশাক আর কথার ফুলঝুরি দিয়ে ক্লিওকে সাজাতে চাননি। কারণ, তা হলে আর যাই হোক, ক্লিওকে ইতিহাসের মিউজ বলে চেনা যাবে না, ক্লিওর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সে রহস্যময়ী। লিটন-স্ট্র্যাচি অবশ্য একটু অন্যরকম ভাবতেন, তাঁর মতে মিউজদের মধ্যে ক্লিও-ই সবচেয়ে উজ্জ্বল। কিন্তু তার বোনের মতো ক্লিওরও এতোকটা বিশেষ চারিত্রিক ত্রুটি ছিল, সে হল অসম্ভব দাম্ভিক, তার জমকালো পোশাক আশাক বা অন্যদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার স্বভাবের জন্য তাকে এক এক সময় অসহ্য মনে হয়। স্তাবক-পরিবৃত হয়ে এমন দর্পিত পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে চলেন যেন মনে হয় মাটিতে তাঁর পা পড়ছে না। এটা অবশ্য লিটন-স্ট্র্যাচির কল্পনা। এ-থেকে ক্লিও-র চাইতে লিটন-স্ট্র্যাচিকেই বেশি চেনা যায়। স্তাবকরা অবশ্য চিরকালই ছিল এবং আছে। তারা মন-রাখা অর্ডারি ইতিহাস লিখতেই অভ্যস্ত, কিন্তু দেবীর প্রকৃত ভক্তরা তাঁকে রহস্যময়ী বলেই চেনে। শুধু সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে এই রহস্যের ঘেরাটোপকে ভাঙতে চাইলে বড়-জোর তাকে বে-আব্রু করা যাবে, তার বেশি নয়। এ কথাটাই খুব প্রাঞ্জল করে বলেছেন প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক রিচার্ড কব্। জন্মসূত্রে ইংরেজ হলেও কব্-এর পছন্দের দেশ ছিল ফ্রান্স, ফ্রান্সের ইতিহাসেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তিনি সেই বিরল প্রজাতির ঐতিহাসিক যিনি তত্ত্বের কচকচির চেয়ে আখ্যানে বিশ্বাস করতেন। রাশিবিজ্ঞান দিয়ে ইতিহাসকে বোঝারও তিনি ছিলেন তীব্র বিরোধী, তিনি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলতেন, ধার করা তত্ত্ব ছাড়া যদি ইতিহাসকে বোধগম্য করা না যায় তা হলে বরং না বোঝাই ভাল। তিনি বারে বারে তাঁর শিক্ষকপ্রতিম ফরাসি ঐতিহাসিক রজর্জ লেফেভ্‌র-এর দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়ে দেন। লেফেভ্‌র নিজেকে মার্কসবাদী ঐতিহাসিক বলে দাবি করতেন। এতদসত্ত্বেও অভিজ্ঞ এবং সংবেদনশীল ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি জানতেন, কোনও লৌহ-আইন ইতিহাসের গতিপ্রকৃতিকে সবসময় নিয়ন্ত্রণ করে না। অভাবিত এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনার অভিঘাত সব হিসাবকেই বানচাল করে দিতে পারে।

ফ্রান্সে একশ্রেণীর ঐতিহাসিকরা আখ্যান-বর্জিত, সংখ্যাতত্ত্ব নির্ভর, নিরস ইতিহাসচর্চার ধারার বিরুদ্ধে নীরবে নিরন্তর সংগ্রাম করে প্রগাঢ় আগ্রহ জাগাতে সক্ষম হয়েছেন। লেফেভ্‌র এর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তাঁর সমতুল্য ঐতিহাসিক বিরল। ইতিহাসকে ধার করা পোশাকে না সাজিয়েও তিনি তাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন তাঁর নিজস্ব মুন্সিয়ানা দিয়ে। তাঁর চোখ দিয়ে ফরাসি বিপ্লবকে চেনা এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা। ঠিক যেমন মার্ক ব্লখের দৃষ্টিতে ইউরোপের সামন্ত সমাজ। মতাদর্শের প্রতি অন্ধ আনুগত্য এঁদের দৃষ্টিকে খণ্ডিত করেনি, চেতনাকে রুদ্ধ করেনি। ব্লখের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়। ইহুদি পরিবারের লোক, ইহুদিদের ধর্মীয় আচারের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব রাখেন, তবে নিজে ধর্মাচরণে উৎসাহী নন। মধ্যযুগের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য,কিন্তু তা কোনও অঞ্চলের প্রতি আনুগত্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত নয়। মার্কসের-এর দ্বারা প্রভাবিত, অথচ তাঁর রচনায় ব্যক্তিমানুষ সমষ্টির মধ্যে হারিয়ে যায় না। তাঁর শেষ জীবনের ইতিহাস তো সকলেই জানেন। হিটলার যখন ফ্রান্সের দখল নিয়ে সেখানে একটা তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তখন ফ্রান্সের তাবড় তাবড় বুদ্ধিজীবী-শিল্পী, বৈজ্ঞানিকেরা দলে দলে দেশত্যাগ করে ইংল্যান্ড-আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিলেন। সহজে নিরাপত্তার এই হাতছানি ব্লখের সামনেও ছিল। বোধকরি অন্যদের থেকে বেশিই ছিল, কারণ তখন তিনি বরেণ্য ঐতিহাসিক হিসাবে বিশ্বে সুপরিচিত। অথচ ব্লখ তাঁর প্রিয় দেশ ছেড়ে চলে যেতে রাজি হলেন না। দেশের মধ্যে থেকে, নাৎসি নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে যাঁরা গোপন প্রতিরোধ সংগঠিত করার সাহস দেখিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে হাত মেলান। এই বেনজির দেশপ্রেমের পুরস্কারও তিনি পেয়েছিলেন, প্রথমে নাৎসি কারাগারের নির্জন সেল, যেখানে বসে লিখেছিলেন তাঁর শেষ বই, 'হিস্টোরিয়ান'স্ ক্রাফট্'। শেষ করতে পারেননি, তার আগেই তাঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে শেষ করেছিল নাৎসি বুলেট। ব্লখ নিজেই ইতিহাস।

ল্য রোয়া লাদ্যুরি-র অনন্য বর্ণনাশৈলীর কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। পিরেনিজ পাহাড়ের কোলে একটা ছোট্ট গ্রাম মঁতাইউ। চতুর্দশ শতকের একটা সময়ে এই গ্রামটার সম্পর্কে অভিযোগ উঠল, এটা নাকি অপধর্মের কেন্দ্রবিন্দু। এ বিষয়ে তদন্ত করে অপধর্মের প্রভাব থেকে গ্রামবাসীকে মুক্ত করতে এসেছিলেন রোমান ক্যাথলিক বিশপ ফুরনিয়ে। তাঁর তদন্ত, যাকে ধর্মীয়





পরিভাষায় বলা হয় 'ইনকুইজিশন', খণ্ডে খণ্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এগুলিকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করে লাদ্যুরি তাঁর অনবদ্য ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন প্রায় হারিয়ে যাওয়া গ্রামটার দুর্লভ ইতিহাস। তাঁর হাত ধরে পৌঁছে যাওয়া যায় কৃষক পরিবারগুলোর অন্দরমহলে। কৃষক জীবনের হাসি-কান্না, সুখ দুঃখ, আশা-নিরাশা, ধর্ম-অধর্ম, সবকিছুই কত সহজভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন উপন্যাসের চেয়েও স্বাদু 'মঁতাইউ' নামের গ্রন্থটিতে, এইরকমের আরও কত উদাহরণই তো দেওয়া যায়। ইংরেজ ঐতিহাসিক আইলিন পাওয়ারের 'মিডিয়েভাল পিপ্‌ল্' তো ক্লাসিকেরই পর্যায়ে পড়ে। স্মৃতির উজান বেয়ে খুঁজে বার করেছিলেন কত অখ্যাত আর অনামা মানুষের জীবনচর্যা। এই কোলাজ তৈরি করার সময় তাঁকে কোনও চটকদার তত্ত্বের দ্বারস্থ হতে হয়নি, অথচ ইতিহাস কত অন্তরঙ্গ, কত সরস, কত জীবন্ত! অন্য মেজাজে লেখা হলেও ওলন্দাজ ঐতিহাসিক যোহান হুইজিঙ্গার 'ওয়েনিং অফ দি মিডল্ এজেস'-এর কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। একটা যুগের গোধূলি-বেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজনীতির জগতে কি উথাল পাথাল হচ্ছে তা ভিন্ন কথা। হুইজিঙ্গা তাকিয়েছেন সমাজের দিকে, কয়েকটা মোহময় তুলির টানে গোধূলির ধূসর ক্যানভাসে পালাবদলের এমন একটা ছবি এঁকেছেন যা দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আবিষ্ট করে রাখে। কয়েকটা মাত্র উদাহরণ দিলাম। আরও কত নামই তো করা যায়। এইসব ঐতিহাসিকরা প্রগতিবাদী না দুর্গতিবাদী সে চুলচেরা বিচার অন্যদের হাতে থাক, আমাদের কাছে এ প্রশ্ন অবান্তর। আসল কথা হল তথ্যের কাছে দায়বদ্ধ থেকেও এঁরা ইতিহাসকে প্রাণবন্ত করে তুলতে জানতেন, এঁরা ইতিহাস থেকে আখ্যানকে বিদায় দেননি। ইতিহাস তাই তাঁদের হাতে বাঙ্ময়।

এই কথাটা আমরা অনেকেই মনে রাখি না। তত্ত্বের গুরুভারে ক্লিষ্ট, আখ্যানবর্জিত পণ্ডিতি গবেষণা সহযাত্রী পণ্ডিতকে তৃপ্ত করলেও সাধারণ পাঠককে করে না। পন্ডিতি গবেষণার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সাধারণ পাঠককেও ইতিহাসের কাছে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন আছে। এর জন্য আরও অনেক কিছুর সঙ্গে আমাদের স্কুল কলেজে ইতিহাস শিক্ষণের পদ্ধতিরও পরিবর্তন প্রয়োজন। আমার-আপনার চোখের সামনেই দেখি, স্কুলের গোড়ার দিক থেকেই ইতিহাসের নাম করে ধারাপাত মুখস্ত করার প্রাণান্তকর প্রয়াস শুরু হয়ে যায়। পাখি পড়ার মতো করে পড়ুয়াদের শেখানো হয়, যত পারো মুখস্ত করো। রাজা বাদশার নাম, যুদ্ধ-বিগ্রহের নাম, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সন-তারিখের গন্ধমাদন। যত মুখস্ত করবে খাতায় তত উদগীরণ করতে পারবে। কারণ, ইতিহাসের তো পাতা গুনে নম্বর! ক্লিশের মতো এই কথাগুলো আওড়াতে দেখেছি অন্ততপক্ষে গত তিরিশ বছর। কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম অবশ্যই দেখেছি, উদাহরণ হাতের কাছেই আছে। আমার শিক্ষক প্রয়াত আব্দুল ওয়াহাব মামুদকে দেখেছি। তাঁর কাছে ইতিহাসের পাঠ নেওয়াটা ছিল এক বিরল অভিজ্ঞতা। আখ্যানের মধ্যে থেকেও তিনি বিশ্লেষণ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বা তাঁর মতো অন্যান্য যাঁরা ছিলেন বা এখনও আছেন তাঁরা একদিকে যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ইতিহাসে আগ্রহ জাগান, অন্যদিকে চিন্তাভাবনার দরজাগুলোকেও উন্মুক্ত করে দেন। আগাথা ক্রিষ্টির 'মুভিং ফিংগারে'র সেই ছোট্ট স্কুলের ছাত্রীটির সরল প্রশ্নটা আজকাল প্রায়শই মনে পড়ে। স্কুল-ফেরতা বিভ্রান্ত মেয়েটা বলছে, 'অনেক বিষয়ই আমার কাছে অর্থহীন মনে হয়, যেমন ধর ইতিহাস, এক একটা বই-এ এক এক রকম। এ কেন?' তার প্রশ্নের উত্তরে বয়োজ্যেষ্ঠ উত্তর দিয়েছিলেন, 'ইতিহাসের আসল মজা তো ওইখানেই'। আখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যেতে বসা এই মজাটাকে ফিরিয়ে আনা খুবই জরুরি।

**বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের আশুতোষ অধ্যাপক। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার নিয়মিত লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আছে Crime and Control in Early Colonial Bengal, 1770-1860 (Calcutta,2000), The Town Hall of Calcutta : A Brief History (Calcutta 1998), FortWilliam in Historical Perspective (Calcutta 1995) ইত্যাদি।

প্রবন্ধ

# প্রতিরোধ, ধর্ম ও নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক

দিব্যেন্দু হোতা

ঔপনিবেশিক ভারতে নিম্নবর্গের প্রতিরোধ আন্দোলনের ইতিহাস বৈচিত্রে ভরা। এ বিষয়ে স্বাভাবিক কারণেই ঐতিহাসিক মহলে বিতর্কের শেষ নেই। সাধারণ মানুষের প্রতিবাদী চেতনা কতটা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ছিল, কতটাই বা স্থানীয় শোষকদের সঙ্গে মূলত শ্রেণীসংগ্রাম, কীভাবে এই শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের একটা সন্ধি গঠিত হয়েছিল এই ধরনের নানা প্রশ্ন ইতিহাস গবেষণার কেন্দ্রে অবস্থান করছে। জাতীয় আন্দোলন ও নিম্নবর্গের প্রতিরোধ — এই দুই-এর সম্পর্ক নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলেন জাতীয় আন্দোলন নিম্নবর্গীয় প্রতিরোধকে শক্তিশালী করেছিল, কারওর মতে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদী চেতনা, জাতীয়তাবাদ অনেকটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সাধারণ মানুষের সংগ্রামী চেতনার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে বিশ শতকের গোড়ায় বেশ কয়েকজন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী মার্কসবাদী তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে এই বিষয়ের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। সাধারণ মানুষের শ্রেণীসংগ্রাম ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সম্পর্ক বুঝতে চাইছিলেন। History from below এই ধারণা ছিল সঞ্চালক ভূমিকায়। রজনীপাম দত্তের কথা সকলেই জানেন। তিনি কংগ্রেসকে সমাজের উচ্চশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়েছে কীভাবে অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন শ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জাতীয় কংগ্রেস সাধারণ কৃষক-শ্রমিকের জীবনের দাবিগুলিকে ততটা গুরুত্ব দেয়নি। তারা ভয় পেয়েছিলেন যে এর ফলে শ্রেণীসংগ্রাম এমন একটা মাত্রা পাবে যাতে ব্রিটিশবিরোধী ঐক্যে সংকট দেখা দিতে পারে। পরবর্তী কালে আরও বিশদ আলোচনায় অনেক ঐতিহাসিক এই ভাবনার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

মার্কসীয় ইতিহাস চর্চার প্রাসঙ্গিক পর্যায়ে প্রতিরোধ আন্দোলনের বিশ্লেষণের কেন্দ্রে রয়েছে শ্রেণী সম্পর্ক ও শ্রেণী সংগ্রাম। মার্কসীয় অর্থে শ্রেণী কাকে বলে তা নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। একটি পরিপূর্ণ সংগ্রামী চেতনাসম্পন্ন শ্রেণী হিসাবে শ্রেণীর অস্তিত্ব নির্ভর করে অনেকটা তার চৈতন্যের উপর, তার ভাবনার উপর। এই চৈতন্য নির্ধারিত হয়ে যায় উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত শ্রেণী সম্পর্ক ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের দ্বারা। মানুষের আত্মপরিচিতি, চিন্তা এবং চেতনায় ধর্ম জাতপাতের রাজনীতি ও অন্য নানা ধরনের সত্তার প্রভাব প্রাথমিক পর্যায়ের মার্কসীয় আলোচনায় স্থান পায়নি। ধর্মীয় চেতনা ও শ্রেণীচেতনার মধ্যে মৌলিক বিরোধিতার কথা বলা হয়েছে। ধনতান্ত্রিক শিল্পায়ণের প্রথম যুগ থেকে শিল্পাঞ্চলগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের একটি মৌলিক বক্তব্য ছিল যে এই নতুন সামাজিক বাতাবরণে শ্রমিকশ্রেণী প্রাচীন সামাজিক আদর্শের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পুরনো ভাবনা ও চেতনা কাটিয়ে একটি নতুন চৈতন্যের অংশীদার হবে, যার মূলকথা হল শ্রমিক ও পুঁজিপতির শ্রেণীসংঘাত বা দ্বন্দ্ব। এই নতুন চেতনা হল ধনতান্ত্রিক শিল্প ব্যবসায় শ্রমিকশ্রেণীর একই ধরনের সর্বজনীন অভিজ্ঞতা, যেখানে জাত-ধর্মের ভেদাভেদ অপ্রাসঙ্গিক। শ্রেণীচেতনা শ্রমিকশ্রেণীর 'আসল চেতনা'এবং ধর্ম একটি 'মিথ্যা চেতনা'। তাই ধর্মকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সনাতন মার্কসবাদী তত্ত্বে 'opium of the people', 'sigh of the oppressed' বলা হল। কৃষকদের প্রতিরোধ আন্দোলনে প্রতিবাদের ভাষা ধর্ম জোগালেও আসল শক্তি নিহিত রয়েছে শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্যে। মার্কসীয় ইতিহাসভাবনায় তখন ধর্ম ছিল অলীক চেতনা, মানুষের শ্রেণী সত্তাকে বিকৃত করাই তার প্রধান ভূমিকা। নিম্নবর্গের প্রতিরোধ আন্দোলনের উৎস খুঁজতে গিয়ে তাই দৃষ্টি পড়ে উৎপাদন সম্পর্কের উপর। আজকের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে সম্পর্ক তার দিকে। আন্দোলনে নিম্নবর্গীয়



মানুষের মধ্যে শ্রেণী বহির্ভূত সত্তার প্রভাব স্বাভাবিক কারণেই ততটা নজর কাড়েনি। বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে যখন শ্রেণী সংগ্রামের নানা দুর্বলতা ঐতিহাসিকদের ভাবাতে শুরু করল এবং শ্রেণীর অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেকেই সন্দিগ্ধ হয়ে পড়লেন, তখন মানুষের চেতনার অন্য স্তরগুলির দিকে দৃষ্টি পড়ল, যার সঙ্গে জড়িত রয়েছে ধর্মবোধ, ধর্মীয় সত্তা, জাত্যভিমান ও জাতিসত্তা। যত সহজে প্রথম প্রজন্মের মার্কসবাদী ঐতিহাসিক এই চেতনাকে অলীক, অসম্পূর্ণ ও মিথ্যা বলে অস্বীকার করেছিল — নতুন প্রজন্মের ঐতিহাসিক কিন্তু এতটা প্রত্যয়ের সঙ্গে এ জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। অগ্রণী মার্কসবাদী ঐতিহাসিক K.N. Panikkar এর Against Lord and State. গ্রন্থে বলা হয়েছে : ধর্ম মোপলা বিদ্রোহীদের একাধারে দিয়েছে সংগঠন যা অনেকখানি মসজিদ কেন্দ্রীক ছিল এবং ধর্মীয় চেতনা থেকে সামাজিকসম্পদের বণ্টন সম্পর্কে ভিন্ন নীতিবোধ জাগ্রত হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে মালাবারের উপকূলে উচ্চবর্ণের ভূস্বামীদের যে শোষণ তাকে প্রতিরোধ করা মোপলা কৃষকেরা অনেকটা আঞ্চলিক মুসলমান ধর্মযাজকদের প্রভাবে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করেছিল। ধর্ম কিংবা ধর্মীয় সত্তা প্রতিরোধের সহযাত্রী। আপাতদৃষ্টিতে দুইয়ের মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষ বিরোধ বা সংঘাত নেই। ধর্মবোধ শুধুমাত্র শোষিতের দীর্ঘশ্বাস নয় তাদের প্রতিরোধের উপজীব্যও বটে। কুমার সুরেশ সিং এর মতো নৃতাত্ত্বিক যারা আদিবাসী বিদ্রোহগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন — তাদের লেখায় এটা স্পষ্ট যে আদিবাসীদের চেতনায় ধর্মবোধ ও শ্রেণীচেতনা -- দুই মিলেমিশে গিয়েছিল। অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরীর অনেক লেখাতেও দেখা যায় ধর্মবোধ কীভাবে প্রতিবাদী ও প্রতিরোধমুখী চৈতন্যের সৃষ্টি করেছিল।

নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতিরোধের রাজনীতি ও ধর্মীয় চেতনার পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস নতুন মাত্রা পেয়েছে ইদানীং কালের নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চায় (subaltern studies)। মার্কসীয় আলোচনায় 'Subaltern' শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায় ইতালির কম্যুনিস্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তনিও গ্রামশির (১৮৯১-১৯৩৭) বিখ্যাত কারাগারের নোটবইতে। রণজিৎ গুহ এর বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন 'নিম্নবর্গ'। সাবলটার্ন স্টাডিজ নামক প্রবন্ধ সংকলনগুলিতে এবং জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, ডেভিড্ হার্ডিম্যান, রণজিৎ গুহ, শাহিদ আমিন, পার্থ চ্যাটার্জি, গৌতম ভদ্র, দীপেশ চক্রবর্তী প্রমুখ ঐতিহাসিকদের লেখায় এই ধারণাটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই কথা বলা হয়েছে যে 'গ্রামশির ইঙ্গিতগুলিকে অনুসরণ করেই "নিম্নবর্গের" ধারণার উদ্ভব। কিন্তু তার প্রয়োগ ও বিস্তার করা হয়েছে ভারতবর্ষের সমাজ ইতিহাসের ক্ষেত্রে। এর ফলে মার্কসীয় তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিতেও কয়েকটি নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে'। সাবলটার্ন পন্থীরা নিজেদের মার্কসবাদী বলে পরিচয় দিলেও তাঁদের রচনা ধ্রুপদী মার্কসবাদী তত্ত্ব থেকে অনেকটাই সরে এল। নিম্নবর্গের প্রতিরোধের ইতিহাস রচনার নতুন আঙ্গিক শুধুমাত্র একটি ঐতিহাসিক মত বা রচনাপদ্ধতি নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সাবলটার্ন রচনায় কৃষকদের ভূমিকা ও কৃষক চৈতন্যের স্বাতন্ত্র্যের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিরোধের রাজনীতিতে কৃষক-চৈতন্যের স্বাতন্ত্র্য মুখ্য ভূমিকা নেয়। ইতিপূর্বে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে সংগঠিত রাজনীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরাও দিয়েছেন। বলা হয়েছে কৃষকদের যে সনাতন, অসংগঠিত রাজনীতি তাকে সুসংগঠিত করার জন্য প্রথম পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী সংগঠিত রাজনীতি (যেখানে কংগ্রেসের ভূমিকা মুখ্য) এবং পরবর্তীকালে বামপন্থী কৃষক আন্দোলন (১৯৪০ এর দশক থেকে কম্যুনিস্ট দল মুখ্য) কাজ করেছে। সাবলটার্নপন্থীদের বিশ্লেষণে কৃষকদের নিজস্ব যে প্রতিবাদ তার গুরুত্ব অনেক বেশি। এঁরা বলেন যারা সংগঠিত রাজনীতি পরিচালনা করছেন তাঁদের কৃষকেরা বহিরাগত হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এই প্রসঙ্গে জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে ও মাজিদ সিদ্দিকির বিতর্ক স্মরণ করা যেতে পারে। সিদ্দিকির মতে উঃ প্রদেশে কংগ্রেস রাজনীতি ও কংগ্রেস সংগঠন কৃষকদের শক্তিশালী করেছিল। কংগ্রেসই কৃষকদের নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি জুগিয়েছে। জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে বলছেন কংগ্রেস সংগঠকরা উত্তরপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলে কাজ শুরু করার আগেই আঞ্চলিক কৃষক নেতৃত্ব নিজেদের প্রয়াসে সংগঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ কৃষক চৈতন্যে নিজস্ব রাজনীতির অস্তিত্ব ছিল, বহিরাগতদের আগমনের পূর্বেই। রণজিৎ দাশগুপ্ত ও দীপেশ চক্রবর্তীর লেখায় একই বিতর্কের পুনরাবৃত্তি। রণজিৎ দাশগুপ্ত মনে করেন যে শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম থেকেই বামপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্ব (যার বড় অংশ এসেছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থেকে) প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছে। অন্য দিকে দীপেশ চক্রবর্তীর (Rethinking working class history) লেখায় বলা হয়েছে সাধারণ শ্রমিকের চেতনায় একজন বামপন্থী ভদ্রলোক আদর্শবাদ সত্ত্বেও বহিরাগত। নিম্নবর্গের নিজস্ব জগৎ রয়েছে, যেখানে সাংগঠনিক রাজনীতির মাধ্যমে মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের অনুপ্রবেশ ঘটলেও নিম্নবর্গের নিজস্বতা অটুট ছিল। এই স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য আসলে শ্রমিক-কৃষকের প্রতিরোধের রাজনীতির ভিত্তি গড়ে দিয়েছে।

বিংশ শতকের সাম্যবাদী রাজনীতির সাংগঠনিক দুর্বলতা,

অনেকক্ষেত্রে স্ট্রাটেজির নামে সমঝোতা, সংসদীয় রাজনীতির প্রাধান্য ইত্যাদির ফলে এই ধারণার জন্ম হল যে সাম্যবাদী দলগুলি বৈপ্লবিক আদর্শ রূপায়ণে অক্ষম। ফলে দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে সংগঠিত রাজনীতির বাইরে নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনার উপর। এই চেতনার ঐতিহাসিক উদাহরণ প্রাত্যহিক প্রতিরোধের মধ্যে দেখতে চাইছেন সাবলটার্ন ইতিহাসবিদেরা। হয়ত মানুষের প্রাত্যহিক প্রতিরোধের মধ্য থেকেই বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নিম্নবর্গের মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক চৈতন্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সাবলটার্নপন্থীরা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। কীভাবে তারা এই চৈতন্যকে দেখছেন তার তাত্ত্বিক অভিঘাত অনেক বেশি স্পষ্ট হয় দীপেশ চক্রবর্তীর পূর্ববাংলার শিল্পশ্রমিকদের আলোচনায়। এতদিন মার্কসপন্থী চিন্তাবিদেরা ভাবতেন আধুনিক ধনতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থায় যে ভাবে শ্রমিকশ্রেণী গড়ে ওঠে তাতে পুরনো যে সামাজিক বন্ধন সেগুলি ভেঙে একটি নতুন শ্রেণী চেতনার সৃষ্টি হয়। এখানে বিশদ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। দীপেশ দেখালেন যে এই ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাধিক্য ঘটলেও একটি পরিপূর্ণ শ্রেণীচেতনা ও মার্কসীয় ধারণা অনুযায়ী সম্পূর্ণ প্রলেতারীয় চরিত্র শ্রমিকশ্রেণীর গড়ে উঠছে না। তাদের মধ্যে ধর্মের, জাতির (caste) ও নানা ধরনের সনাতন ভাবনার প্রভাব যথেষ্ট প্রবল। দীপেশ ভারতের ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সীমাবদ্ধতার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। ইউরোপের ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা যেভাবে গড়ে উঠেছিল, ভারতে তা হয়নি। ঔপনিবেশিক কাঠামোয় ধনতান্ত্রিক শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। এই কাঠামোয় যে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছে তাদের গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক কখনওই ছিন্ন হচ্ছে না। জুট মিলে নিযুক্ত শ্রমিকেরা গ্রামের চাষীও বটে। তারা আধা কৃষক, আধা শ্রমিক। উত্তরবঙ্গের চা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের অবস্থাও একই। কাজেই তাদের যে সনাতন বাসভূমি সেখানে যে ধরনের সামাজিক ভাবনায় তারা আবদ্ধ ছিল, সেই অবস্থা থেকে তারা মুক্ত হতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে ধর্মীয়চেতনা এবং শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-চেতনার পারস্পরিক সম্পর্ক নতুন করে গুরুত্ব পাচ্ছে। শ্রেণী-চেতনা যেহেতু সরাসরি গড়ে উঠছে না এবং শ্রমিক চৈতন্যে প্রাচীন সামাজিক আদর্শগুলি যথেষ্ট প্রভাব ফেলছে তাই তাদের জীবনের ইতিহাসের ক্ষেত্রে ধর্মকে একটি গুরুত্বহীন উপাদান হিসাবে দীপেশরা ভাবতে পারছেন না। কৃষক চৈতন্যে ধর্মের প্রভাবকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নিম্নবর্গের প্রতিবাদী রাজনীতিতে ধর্মীয় চেতনা ও ধর্মের গুরুত্ব যখন স্বীকৃত হচ্ছে তখন ধর্মকে শোষিত মানুষের চৈতন্যে একটি গুরুত্বহীন অংশ হিসাবে ভাবা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। ধর্মবোধের সঙ্গে একটি সম্প্রদায়গত আনুগত্যের (Community allegiance) প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। ধর্মীয় চৈতন্য গুরুত্বহীন এবং শ্রেণীচৈতন্য আসল কথা — এই প্রশ্ন যখন উঠছে তখন ধর্মীয় আনুগত্যকে কেন্দ্র করে যে রাজনীতি, সাধারণ মানুষের জীবনে তার অবস্থান কোথায় তা নিয়ে মৌলিক, অনেকাংশে তাত্ত্বিক প্রশ্ন নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার বিভিন্ন আলোচনায় উঠে আসছে। সাবলটার্নপন্থীরা ধর্ম ও শ্রেণী সহাবস্থানের মধ্যে নিম্নবর্গের প্রতিবাদীচেতনার আধার দেখছেন।

'ইমান ও নিশান' গ্রন্থের গৌরচন্দ্রিকায় গৌতম ভদ্র কৃষক চেতন্যে রাজনীতি ও ধর্ম সম্পর্কে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে বলেছেন। 'রাজনৈতিক ইতিহাসের সর্বোত্তম প্রকাশ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের ইতিবৃত্ত' এই ধারনা থেকে ঐতিহাসিকেরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে 'ধর্মীয় চেতনা বা ধর্মাশ্রয়ী চৈতন্যের রাজনৈতিক প্রভাব সীমিত, কৃষক আন্দোলন ও বিদ্রোহী চৈতন্য কখনই বৃহত্তর কাঠামোকে প্রভাবান্বিত করতে পারে না' (নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ ও পরবর্তীকালে হব্‌সবম্‌ এই অভিমত পোষণ করেন)। এই অভিমত গৌতম মানেননি। রাষ্ট্রের ইতিহাসের মধ্যেই সমাজের যাবতীয় অভিজ্ঞতাকে ধরার চেষ্টা, বিশ্লেষণের যথাযথ পদ্ধতি নয়। অধ্যাপক বিনয় চৌধুরী পূর্ববাংলার কৃষক আন্দোলনে ধর্মের ভূমিকার বিশদ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কিন্তু যেভাবে অধ্যাপক চৌধুরী ধর্মকে গুরুত্ব দিয়েছেন তা গৌতম মানতে পারেননি। বিনয় চৌধুরী কোনও কোনও পর্যায়ে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে ফারাক টানেন এবং বিশ্বাস করেন যে শুধু কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রেই ধর্ম ও রাজনীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে যায়। ধর্ম ও আর রাজনীতির সম্পর্কে কোনও অনিবার্যতা নেই, তার মধ্যে ভেদ আছে, ছেদ আছে। কিন্তু গৌতমের কথায় : 'নিম্নবর্গের চৈতন্যে এমন কোন ধর্ম বোধ নেই যা ক্ষমতা রহিত অতএব রাজনীতি বিবর্জিত। নিম্নবর্গের নিম্নতম আন্দোলনেও যে আদর্শ থাকে তা দীন অথবা আদাব দ্বারা পরিষিক্ত, তা শুধু সংহতি বা জমায়েতের সূত্র নয়। আদর্শ ছাড়া, রাজনীতি ছাড়া নিম্নবর্গের আন্দোলন হয় না এবং সেই রাজনীতির মূলে থাকে কোন না কোন ইমান বা বিশ্বাস' (ইমান ও নিশান, পৃঃ ১৭)। কৃষকদের যে স্বতন্ত্র চৈতন্যের কথা এঁরা বলছেন তার অন্যতম প্রধান উপাদান হল সংগঠিত শহুরে রাজনীতি থেকে কৃষকসমাজের দূরত্ব। কৃষকদের প্রতিরোধের রাজনীতিতে এরা শ্রেণী চেতনাকে প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে দেখছেন না। গ্রামীণ চাষিদের আধার হল Community বা সম্প্রদায়গত চেতনা -- শ্রেণীসত্তা, সনাতন সমাজে ধর্মীয় বা জাতিসত্তার একটি মিশ্রণ। এই চৈতন্য নিজের



রাজনীতির পথ ঠিক করে নেয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Bengal 1920--47: The Land Question-য়ে) দেখিয়েছেন পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক সংগ্রাম। হিন্দু জমিদার-মহাজন শ্রেণীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে এমন একটি কৃষক শ্রেণী যাদের কৃষকসত্তা সংহতি পেয়েছিল ইসলাম ধর্মের কাছ থেকে। গৌতম ভদ্রের কৃষকবিদ্রোহের কাহিনীগুলিতেও এই ধরনের বক্তব্যের উপস্থাপনা। মালাবারের কৃষকবিদ্রোহ সম্পর্কেও এই কথা বলা যায়। আদিবাসী বিদ্রোহে শ্রেণীচৈতন্য এবং জাতিসত্তার মধ্যে ধ্রুপদী মার্কসীয় চুং-য়ে কোনও ভেদরেখা এরা টানেননি। নিম্নবর্গের চেতনার আলোকে নিম্নবর্গকে বুঝতে হবে। ধর্মের সার্বিক এবং এককরূপী চরিত্র হতে পারে না। শোষক ও শোষিতের কাছে ধর্মের অর্থ ভিন্ন। উচ্চবর্গের কাছে পরাজয়ের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা এবং ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হওয়া থেকে মুক্তি এবং ক্ষমতা করায়ত্ত করার পথ নিম্নবর্গ খুঁজে পায় ধর্ম-বিশ্বাসে।

নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার তাত্ত্বিক বিষয়গুলির মধ্যে ধর্মের স্থান উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য প্রসঙ্গগুলি এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে ভাল হত। পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। সাম্প্রতিক এই ইতিহাসচর্চার মূল তাত্ত্বিক প্রস্তাবগুলি সমালোচিত হচ্ছে এবং সাম্প্রদায়গত বোধে ধর্মের ভূমিকার বিপজ্জনক দিকগুলি সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করতে বলা হচ্ছে। পশ্চিমি এনলাইটেনমেন্ট বিরোধী মতাদর্শের আলোকে সম্প্রদায়গত বোধ (notion of community) স্বীকৃত হওয়ায় নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের ব্যাখ্যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মীয় সৃজনশীলতা বিষয়ে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল অভিমতকেই যেন মেনে নেওয়া হচ্ছে। ঐতিহাসিক বলতেই পারেন যে তাঁরা তথ্যনির্ভর সঠিক ঘটনার বর্ণনা দিতে চান, তা ভাল হচ্ছে, কি মন্দ হচ্ছে, তা দেখার দায়িত্ব তাঁদের নয়। উত্তর আধুনিকতার ধাঁচে যে ঐতিহাসিক বিবরণ লেখা হচ্ছে তাতে সাম্প্রদায়িকতাকে পরোক্ষে সমর্থন জানানো হচ্ছে কি না — এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। রণজিৎ গুহ বলেছেন: 'নিম্নবর্গের ইতিহাস যেমন অসম্পূর্ণ, পরিবর্তনশীল, নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাও ঠিক তেমনই অবদ্ধ। আরও সচল রাখার চেষ্টা করা প্রয়োজন।' সচল থাকলেই ইতিহাসচর্চায় নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হবে এবং ইতিহাসচর্চা আরও সদর্থক ও অর্থবহ হয়ে উঠবে — এ প্রত্যাশা আমরা করতে পারি।

ধারাবাহিক আত্মকথা

# আলোছায়ার পথিক

## তাপস সেন

*[পূর্ব প্রকাশিতের পর]*

উৎপলরা যখন মিনার্ভা থিয়েটার নেয় তখন দলের সঙ্গে খুব সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলাম না। আলোর কাজকর্ম করি। সতীকান্ত গুহর পৃষ্ঠপোষকতায় ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্স সাউথ পয়েন্ট স্কুলে রিহার্সাল হত। রবি সেনগুপ্তর স্টুং ডিসিপ্লিনের মধ্য দিয়ে দল চলত। কালিন্দী সেন, রাধা, প্রেমাশিস, শোভা সেন, রবি ঘোষ, সুনীল রায়, ভোলা দত্ত, শ্যামল সেন — এঁরা সব ছিলেন সেখানে। মিনার্ভা নেবার প্রস্তাব নিয়ে সম্ভবত নাট্যকার অজিত গঙ্গোপাধ্যায় এসেছিলেন। অজিতবাবুর সঙ্গে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের সম্পর্ক ভাল ছিল। এল.টি.জি-র আগে বহুরূপীকে অজিতবাবু এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বহুরূপী অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে' নাটকটা করেছিল। কিন্তু বহুরূপী অজিতবাবুর এই প্রস্তাবে রাজি হয়নি। মিনার্ভা থিয়েটারে এর আগে বহুরূপীর দু-একটি অভিনয় করতে গিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। বোর্ডের পরিবেশটাও সম্ভবত তাঁদের ভাল লাগেনি। তাই তারা নেয়নি, কিন্তু এল.টি.জি-কে প্রস্তাবটা দিতে তারা সানন্দে রাজি হল। সকলেই খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। দলে অ্যাকটিভলি না থাকলেও আমার সঙ্গে অনেক আলোচনাই হত। আমি সেই জোরেই এই কাজটার বিরোধিতা করেছিলাম। বহুরূপীর সঙ্গে গিয়ে মিনার্ভায় যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সে কথা মৃদুভাবে বলেছিলাম। যাই হোক, এল.টি.জি হলটা নেবে ঠিক করল এবং সেই সুবাদে দশ-পনেরো হাজার টাকার প্রয়োজন হল। দলে টাকা নেই। একদিন শুনলাম, ওরা উত্তমকুমারের কাছে যাবে। শোভাদির সঙ্গে উত্তমকুমারের যথেষ্ট ভাল পরিচয় ছিল। তাই সেখানে যাওয়া ঠিক হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়েছিল কি না আমার জানা নেই। আমাদের এক বন্ধু যিনি এল.টি.জির সঙ্গে নানা প্রয়োজনে থাকতেন, সেই সতীন সেন, দু'জন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন। জ্যোতিষ পাল, কানু পাল এই দু'জনের সঙ্গে। এঁরা ছিলেন গ্রেট ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের থেকে কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে মিনার্ভা নেওয়া হল। তখন মনে হয়েছিল ওই টাকাতেই থিয়েটার চালানো যাবে। সেই সময় দলের সভাপতি ছিলেন চিত্ত চৌধুরি। সতীকান্ত গুহ তখনও দলের সঙ্গে ছিলেন কি না মনে নেই। মিনার্ভায় এল.টি.জি-র যাত্রা শুরু হল ১৯৫৯ সালের জুন মাসে। শুরু হল উমানাথ ভট্টাচার্যের গোর্কির 'লোয়ার ডেপথ' নাটকের অ্যাডাপটেশান 'নীচের মহল', উৎপলের লেখা 'ছায়ানট' আর শেকসপিয়রের 'ওথেলো'র অনুবাদ নিয়ে।

'ছায়ানট' আমার অত্যন্ত প্রিয় নাটক। তখনকার দিনে সিনেমার নায়ক উত্তমকুমারদের মতো একটা চরিত্র, যার নাম দেওয়া হয়েছিল মনোজকুমার, তাকে নিয়ে বক্স অফিস, প্রযোজক ইত্যাদি নিয়ে অত্যন্ত ভাল হিলারিয়াস নাটক। কিন্তু দু'মাসের মধ্যেই দল ধারদেনায় পড়ে গেল। কারওরই কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকায় দেখা গেল আরও অনেক টাকার দরকার। জ্যোতিষ পালেরা আরও টাকা দিলেন। কিন্তু প্রথম দিকের নাটকগুলি আর্থিক দিক থেকে ভীষণ ক্ষতি করল। লোকজনদের মাইনে দেওয়া যাচ্ছেনা, ধারদেনায় চূড়ান্ত অব্যবস্থা। মনে পড়ল অহীন্দ্র চৌধুরি মশায়ের কথা। তিনি মিনার্ভার সঙ্গে বহুদিন যুক্ত ছিলেন। এল.টি.জি মিনার্ভা অধিগ্রহণের পর একটা অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, মিনার্ভা থিয়েটারের ঐতিহ্য তো আমরা জানি। মিনার্ভার ইতিহাস, মামলামোকদ্দমা, ডিক্রির ইতিহাস। এখানে অনেক দল এসেছে গেছে। এরা বয়সে নবীন-তরুণ এরা পারবে



তো? বিশ্বরূপার দক্ষিণেশ্বর সরকার মশাই বলেছিলেন, ইউ আর ব্যাকিং এ রং হর্স, ডেড হর্স। নিমতলা শ্মশানঘাটে রাম নাম সত্য হ্যায়, বলহরি হরিবোল করতে করতে সবাই যায়, ওই শ্মশান ঘাটের রাস্তায় আপনি যাবেন না। আমাকে বোঝাতে না পেরে উনি টেলিফোন করে আমার স্ত্রীকে পর্যন্ত বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। দু'তিন মাসের মধ্যে দলের এই অবস্থা দেখে এইসব কথাই মনে পড়তে লাগল। সবাই মিলে ভাবছে কী করা যায়? এভাবে সব ছেড়ে দেব সবাই? তখন উৎপলই একদিন প্রস্তাব দিল একজন কমারশিয়াল ম্যানেজার রাখবার। দলেরই কমল মুখার্জিকে এই দায়িত্ব দেওয়া হল। পরে এই দায়িত্ব বর্তেছিল সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর। কল্লোলের সময় অনেক দায়িত্ব সমরেশই পালন করেছে।

সেই কমল একদিন আমার পূর্ণদাস রোডের বাড়িতে এসে বলল, দাদা কী করা যায়? নানা আলোচনা করতে করতে আমি 'সেতু' নাটকের কথা বললাম। দ্যাখো সেতু নাটক এইভাবে হয়েছে — একটা পিকিউলিয়ার সিচুয়েশন নিয়ে নাটক হতে পারে এবং সবকিছু মিলিয়ে একটা স্পেকটাকেল করতে পারলেই লোককে বোধ হয় টানা যায়। তখন কমলই বলল, তা হলে কয়লাখনি নিয়ে একটা নাটক করুন না দাদা। কমলেরই মাথায় প্রথম ভাবনাটা আসে। আমিও বললাম, হ্যাঁ, মন্দ হয় না। এমিল জোলার 'জারমিনাল' উপন্যাসটা পড়েছিলাম বহু বছর আগে। সেটা আমার আবছা আবছা মনে ছিল। একদল কয়লা-শ্রমিক জলের তলায় ডুবে গেছে; দিন রাতের কোনও হিসাব নেই; জলের তলায় ভাসছে — এই সিচ্যুয়েশানটা আমার মনে দাগ কেটেছিল। যাই হোক, এই ভাবনাটা সবারই ভাল লেগেছিল। দলের সংকট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সতীন সেনের বাড়িতে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের সকলের আলোচনা সভা ডাকা হল। আমিও ছিলাম। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হল। সেই খাওয়াটাকে আমরা নাম দিয়েছিলাম ফাঁসির খাওয়া। সেদিন ওই নাটক নিয়ে আলাপ-আলোচনা হল। সকলেই চাইল ওই বিষয়ে নাটকটা হোক। কে একজন বলল, রবিশঙ্করকে দিয়ে মিউজিক করানোর কথা। সেই ফাঁসির খাওয়া খেতে নীলিমা দাস এসেছিল। তাকেই দায়িত্ব দেওয়া হল রবিশঙ্করকে রাজি করানোর জন্য। নির্মলেন্দু চৌধুরির সঙ্গেও কথা বলা হবে ঠিক হল। তাঁর সঙ্গে এল.টি.জি-র আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল। আর ঠিক হল উৎপল ও উমানাথ নাটকটা লিখবে। রবি ঘোষের এক ভগ্নীপতি গুহসাহেব থাকতেন আসানসোলের কাছে কোলিয়ারিতে, বোধ হয় সিকিউরিটি অফিসার ছিলেন। এই গুহসাহেবের কথা আমাদের নাটকেও ছিল। গুহসাহেবের বাংলো থেকে পেয়ারা আনার কথা। সুলতা চৌধুরি চরিত্রটার অভিনয় করত। রবি ঘোষের সহায়তায় দলবল নিয়ে আমরা মানে উৎপল, আমি, নির্মল গুহরায়, কমল, রবি চ্যাটার্জি সবাই গেলাম। দিন দুই ঘুরলাম, কয়লাখনির নীচে নামলাম, ছবি তুললাম এবং টেপ রেকর্ডারে কোলিয়ারি শ্রমিকদের গান তুললাম, নির্মল অনেক স্কেচ তৈরি করল, উৎপলও নোট নিল, একটা খসড়া তৈরি করল। পরে অবশ্য উৎপল একাই 'অঙ্গার' নাটকটা লিখল। নীলিমা দাসের সূত্রে রবিশঙ্করের সম্মতি পাওয়া গেল। নির্মলেন্দু চৌধুরিও রাজি। নির্মল সেটের ডিজাইন করতে লাগল। একদিন মিনার্ভা থিয়েটারের তিন তলায় উৎপল নাটকটা পড়ল, সকলেরই ভাল লাগল। একটা সময় আমরা সবাই দেখলাম, আমরা যে সব স্কেচ, ফোটোগ্রাফি ইত্যাদি যা এনেছিলাম তার কোনওটার সংগেই মিনার্ভা মঞ্চের অবস্থানটা খাপ খায় না। কয়লাখনির যে আসপেকটগুলো আমাদের ইমপ্রেশ করেছিল তার সব কিছু ভুলে, সব ভাবনাকে একত্রিত করে একটা কম্পোজিট ইমপ্রেশন ও সেটের ভাবনা ভাবতে হবে। কল্লোলের জাহাজ যেমন আসল জাহাজের দশভাগের এক ভাগও নয়, অথচ জাহাজ দেখানো হয়েছিল, তেমনই মঞ্চের কয়লাখনি আসল কয়লাখনির মাপজোকের সংগে মেলে না। মাপের গোলমাল হবেই কিন্তু কয়লাখনির ইম্‌প্রেশনটা দেবার জন্য নির্মল পুরো স্টেজ জুড়ে কয়লাখনি তৈরি করেছিল। সবকিছু ভুলে এমন কতগুলি উপকরণ সাজাল নির্মল, উৎপল আর আমার সঙ্গে পরামর্শ করে, যাতে পুরো মঞ্চটা কয়লাখনি অঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এমন কাজটা সম্ভব হবার পিছনে আমাদের অরগানিক অন্ডারস্ট্যান্ডিংটাও যথেষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল। ওদিকে রবিশঙ্করের সঙ্গেও উৎপল বসে, নাটকের গল্প শুনিয়ে রিহার্সাল দেখিয়ে, মিউজিক করতে আরম্ভ করলেন।

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্পর্কে দু'জন লোকের অসাধারণ দখল ছিল। সেই দু'জন হল সত্যজিৎ রায় ও উৎপল দত্ত। পঞ্চাশের দশকে দেখেছি রাতের পর রাত ওরা ক্লাসিকাল মিউজিক শুনতে যেত। আমারই মনে হত ওদের কী মাথা খারাপ নাকি! অথচ বার বার বুঝেছি ওদের মিউজিকের পাণ্ডিত্য কতখানি! সেই কারণে রবিশঙ্কর মাত্র পাঁচ-সাতটা হ্যান্ড নিয়ে পথের পাঁচালির মিউজিক করেছিলেন, ক্যামেরাম্যান সুব্রত মিত্র সেতার বাজিয়েছিল। দইওয়ালা কাঁধে বাঁক নিয়ে যাচ্ছে — সেই সময়ের মিউজিক পিসটা সুব্রত মিত্রর, রবিশঙ্করের নয়। সত্যজিৎ রায়ের মতো উৎপলের কম্বিনেশানটা সত্যিই মিনিং ফুল হয়ে উঠেছিল অঙ্গারের কাজে। নাটকের একজায়গায়, যেখানে সই হচ্ছে, আগের দিন রাতে সবাই মিলে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যেও

সিদ্ধান্ত নিল সই করবে। তারা জানে নীচে নামলে মরে যাবে কিন্তু কিছু কমপেনসেশন পাবে। তাই একে একে সই করতে আসছে। বৃদ্ধ-যুবক, কেউ কাঁপছে, কেউ সই করতে জানে না— তাই উল্টোপাল্টা করছে, কেউ ফস্ করে সই করে দিল। পুরো সময়ের সাসপেন্সটাকে রবিশঙ্কর অসাধারণ মিউজিকে ধরেছিলেন। অনেকগুলো মটকা আর পারকাশন দিয়ে মিউজিক পিসটা করেছিলেন।

আর একটা জায়গাও খুবই রিমার্কেবল ছিল। যেখানে একস্‌প্লোশন হত, ভীষণ বিস্ফোরণ। রবি ঘোষ করত সনাতন চরিত্রটা। আগেও চরিত্রটার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, সেই হ্যালুসিনেশানে সে আতঙ্কিত। সাইকোলজিক্যাল পেশেন্ট। সে কেবল চিৎকার করে 'জান বাঁচাও', 'জান বাঁচাও' বলে। যখন একস্‌প্লোশনটা হত, তখন সনাতন 'জান বাঁচাও' 'জান বাঁচাও' বলে চেঁচাতে থাকে আর সেই চিৎকারের সঙ্গে একটা অদ্ভুত মিউজিক তিনি করেছিলেন। চড়া স্কেলে মিউজিকটা করেছিলেন। সেই চিৎকার আর মিউজিক মিলে যে সিচ্যুয়েশান হত তখন গায়ে কাঁটা দিত। ভীষণ সাউন্ড, সনাতন দাঁড়িয়ে আছে, একদিক থেকে তীব্র আলো এসে পড়ত একেবারে ফ্রোজেন পজিশনে। পর্দাটা তখন বন্ধ হয়ে যেত।

আগেই বলেছি, অঙ্গারের বিষয়টা ছিল ইংরেজ আমলের শোষণ নিয়ে। সেখানে খনির মালিকদের যে গালাগাল দেওয়া হয় তা হয়ত একটু উগ্র কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট। তবে শুধুই গালমন্দ নয়, সেখানে হিউম্যান আসপেক্টও ছিল। ছেলে খেতে খেতে রাগ করে উঠে চলে গেল, আর ফিরল না। শোভাদি যে চরিত্রটা করতেন, মায়ের রোলটা। শ্যামল সেন ছেলে বিনুর চরিত্র করত। তারা সব খেতে বসে আর্থিক অনটন নিয়ে তর্ক করছে, তার পর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে, বাড়ি-ঘর-দোর হবে, তাদের ছোট বোনটা স্কুলে যাবে — এই সব প্রসঙ্গগুলো নাটকটার মধ্যে ছিল। কেবলই উগ্রতা নয়, এই সব চরিত্রদের সমাবেশ ঘটিয়ে, তাদের অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে তুলে ধরা। কয়লাখনি এলাকার নানা ছোটখাটো ইনট্রিকেসিজ, এখানকার পিকিউলিয়ার লোকাল কন্ডিশানে পলিটিক্যাল ম্যাটারগুলোকে কত সুন্দরভাবে নাটকের মধ্যে এনেছিল তা ভাবলে আমার খুব বিস্ময় লাগে। উৎপল দত্তকে সকলে চিনত মাইকেল চরিত্রের অভিনেতা হিসাবে। শুধু তাই নয়, উৎপলের অনেক কিছুই মাইকেলের মতো। সে মনেপ্রাণে ইংরেজি নাটকের, ইংরেজি ভাবনার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু বাংলা নাটক লিখতে আরম্ভ করল এই ভাবেই। মাইকেলের মতোই বাংলা ভাষা, সংস্কৃত ভাষা, উর্দু ভাষা এরকম আরও অনেক ভাষার ওপর তার অসম্ভব দখল ছিল। উৎপলকে নাকি তরুণ রায় চিঠি লিখেছিলেন, উৎপল, তুমি বাংলা নাটক লেখো। উৎপল বলেনি। তরুণ রায় আমার কাছে গল্প করেছিলেন। উৎপল সে চিঠির উত্তর দেয়নি। কিন্তু যখনই তরুণ রায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে, বলেছেন নাটক লিখতে। শেষ পর্যন্ত নাট্যকার উৎপলকে আমরা পেলাম।

এবার আলোর কথায় আসি। বিশেষত শেষ সিন। রবিশঙ্কর সেই জলে ডুবে যাবার রিহার্সাল দেখে বললেন, এখানে কী হবে? উৎপল সটান বলে দিল, তাপস কী করবে জানি না। জল আসবে কিন্তু কি করে আসবে আমিও জানি না। আমি ভেবে বসে আছি মিউজিক্যালি একটা ফ্লাড হবে। রবিশঙ্কর সেতারে একটা মিউজিক পিস করেছিলেন। রিহার্সাল চলছে। আলো ঠিকঠাক করা হচ্ছে, হঠাৎ উৎপল গেল রেগে, রিহার্সাল বন্ধ করে সবাইকে গালাগাল করছে। আমি গিয়ে বললাম, প্লিজ মাথা ঠাণ্ডা কর। রাগারাগি করিস না। আমি প্যাসিফাই করলাম উৎপলকে। আবার রিহার্সাল শুরু হল, হঠাৎ দেখি লাইট উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। তখন আবার আমি রেগে গিয়ে স্টেজে লাফ মেরে পড়লাম শিফটার আর লাইটের ছেলেদের বকাবকি করতে লাগলাম। তখন উৎপল আমাকে বলছে, মাথা ঠাণ্ডা কর। আমাদের এই মাথা ঠাণ্ডার ব্যাপারটায় রবিশঙ্কর খুব অ্যামিউজড হতেন। বলতেন, আরে এ রেগে যাচ্ছে ও ঠাণ্ডা করছে আবার ও রেগে যাচ্ছে এ ঠাণ্ডা করছে — আর খুব হাসতেন। আমার রেগে ওঠার পেছনে কারণ বোধহয় ছিল এই যে, আমি তখনও ফ্লাড সিনটার আলো কীরকম হবে ভেবে পাচ্ছিলাম না। তার আগে রেসকিউ সিনের আলোটা মাথায় আছে। তার স্কিমিংও হয়ে গেছে। কতগুলি লোক নীচে আটকে পড়েছে, তাদের তুলে আনার চেষ্টা চলছে। প্রথমে পাখির খাঁচা নামিয়ে দেখা হল বিযাক্ত গ্যাস আছে কি না! তারপর খড়খড় শব্দে লোকও নামানো হল। কিন্তু উদ্ধার করা গেল না। হুলুস্থুল ব্যাপার। বুড়োবুড়ি, আত্মীয়স্বজন, স্বামী ভাই সকলেই খুব টেনসড। একসময় ম্যানেজার বলল, 'সিল দ্য পিট', ক্রেন সরে গেল, একসক্যাডটার চলে গেল। সব আলোগুলোও কমে এল, কিষণকুমার একটা টর্চ জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখছে। টাইম গুনতে গুনতে সমস্ত স্টেজ অন্ধকারে ডুবে যায়। এই করতে করতে একপ্লোশানের দারুণ আওয়াজ হয়। টোটাল সাইলেন্স, আর কিছু দেখা যাবে না। কেবল স্টেজের এক কোণা থেকে আরেক কোণায় যেখানে ক্রেন ফিট সেখানে একটা করে আলো জ্বলছে, একটা নিভছে, সার বেঁধে আলোর জ্বলানেভা চলতে থাকে। বিজ্ঞাপন বা ডেকরেশনে যেমন রানিং লাইট থাকে সেরকম করেছিলাম। সব কম পাওয়ারের সাদা আলো জ্বলতে জ্বলতে পিট হোলের কাছে একটু বেশি পাওয়ারের লাল আলো জ্বলে নিভে যায়,



তারপর গ্রিন, তারপর আবার সাদা। কেবল আলোর দৌড়টাই চলে। আর সব স্তব্ধ ও অন্ধকারে ডুবে থাকে। উৎকণ্ঠিত লোকগুলোকে আবছা, কাটা আলোয় দেখা যেত। আমার মনে হয়েছিল শব্দ, গোলমাল সবটা বন্ধ হয়ে যাবার পর, দমবন্ধকরা অনুভূতিটাকে এভাবে প্রকাশ করা যাবে। রাতে রেসকিউ অপারেশান হয় কি না জানি না। কিন্তু নাটকে রাতেই হয়েছিল। তাই ইম্‌প্রেশনিস্টিক্যালি আমি ও ভাবেই করেছিলাম। এর ফলে দমবন্ধ করা একটা অবস্থা সত্যিই তৈরি হয়েছিল। আমাদের হার্ট বিট সেটাকেই রিপ্রেজেন্ট করে ওই আলোর দৌড়াদৌড়িটা। শেষে অফ স্টেজে শোভাদিরা সব চলে যায়, কেউ আর এগোল না। বিনু, বিনুরে...., সেই ছেলেটি যে খেতে বসে নানা স্বপ্নের কথা বলতে বলতে, খাওয়া অসম্পূর্ণ রেখেই খনিতে চলে আসে — সেই ছেলের নাম ধরে বিনুর মায়ের আর্ত চিৎকার — সেই চিৎকারের সঙ্গে রবিশঙ্করের বাঁশি আর সারেঙ্গি দিয়ে তৈরি হৃদয় মোচড়ানো সুর পুরো অডিটোরিয়ামকে ছেয়ে ফেলত। আর সাইকেলের চাকার চকচকে জায়গায় একটা ব্লুইশ-গ্রিন আলো পড়েই একটা কাটা লাল আলো পড়ত। আঠারো-বিশ ফুট উপরে সেই চাকা, কোনও মানুষ নয় একটা ভাঙা চাকার ওপর লাল আঁচড়ের আলোটা পড়ে যে ছবি তৈরি হয় তা দর্শকদের বিপুলভাবে নাড়া দিত। ওই ভিশুয়াল থেকে মিউজিকে রিচ করে যেত সমস্ত আর্তনাদ, মিউজিকের সেই ভাষা কথায় বর্ণনা করা যায় না। ওই আর্ত মানুষদের সঙ্গে দর্শকরা আইডেন্টিফায়েড হয়ে যেত। রবিশঙ্করের মিউজিক টেক ওভার করে যেত, রিলে হয়ে যেত ভিশুয়াল থেকে সাউন্ডে।

কয়লাখনির ভিতরটাকে দৃশ্যমান করে তোলাও সমস্যা ছিল। পেপার ম্যেশিয়ে দিয়ে নির্মল গুহরায় কয়লাখনির ভেতরের দৃশ্যটা তৈরি করেছিল। কিন্তু সমস্যা হল, খনির অন্ধকার দেখালে লোককে দেখাব কী করে? মানুষগুলোকে তো চেনাতে হবে। প্রথমে ভেবেছিলাম কয়লাখনি ও লোকগুলোর দাঁত-চোখগুলো চকচক করবে, এ রকম অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে পেন্ট করাব। কিন্তু ভেবে দেখলাম শ্বাসরোধকারী মানুষগুলোকে দেখাতে হবে, তাদের দমবন্ধ হয়ে আসছে এমন যন্ত্রণাটা দেখাতে হবে। তাই ছোট ছোট লাইট দিয়ে আলাদা আলাদা করে ইনডিভিজুয়াল ক্যারেকটারসগুলোকে দেখাবার চেষ্টা করলাম। শুধু চেষ্টা করলেই হবে না, প্রথম রো থেকে শেষ রো, ব্যালকনির সবাইকেও দেখাতে হবে অথচ অন্ধকারও থাকবে। এই কনট্রাডিকসনটা ভয়ানক। ততদিনে আমরা কিছু বইপত্র জার্নাল মারফত অনেক রকম লাইটের কথা জেনেছি। বহুরূপীর 'রক্তকরবী' করার সময় বিশু-নন্দিনীর দৃশ্যের জন্য ইকড়ি-মিকড়ি তৈরি করেছিলাম। প্রথমে সেটা করেছিলাম দুটো বিরাট বিরাট ঢাউস ঢাউস ফ্লাড লাইটের সামনে মোটা কাগজ ছুরি দিয়ে ফালাফালা করে কেটে। রক্তকরবীর স্টেজ রিহার্সালে মাথায় এসেছিল বুদ্ধিটা। পরে মিরর স্পটে দুটো লেনস দিয়ে তার মধ্যে টিন দিয়ে ডিজাইন করে ওটা করেছিলাম। আমার মনে হল, ওইরকম মিরর স্পট দিয়ে করা যেতে পারে। কিন্তু অনেকগুলি স্পষ্ট লাগবে। এত পাব কোথায়? সেই লাইট একমাত্র বহুরূপীতে আছে, বহুরূপীর লাইট দিয়ে দু-একদিন কাজ চালানো যায়; কিন্তু সেটাই বা চাই কি করে? ওদেরও তো শো আছে, বিদেশ থেকে আনানো যায়। দিল্লির আইফ্যাকস্ হলে ওরকম লাইট আনিয়েছি। কিন্তু লিট্‌ল থিয়েটারের আর্থিক দুরবস্থা চরমে। ফলে ওটা ভাবা যাবে না। তা ছাড়া বিদেশ থেকে আলো আসতেও তিন চার মাস লাগবে। ফলে কী করা যায় সেটা ভেবেই অস্থির। একদিন প্রাকৃতিক কাজ সারতেই মিনার্ভার পিছনে গেছি। সেখানে বহুবছরের পুরনো লোহা-লক্কড় সব পড়ে আছে। ওখানে সবাই ওই জন্যই যায়। আমিও গেছি। তা কি ভেবে আমি ভাঙা একটা টুকরো হাতে নিলাম। দেখলাম পুরনো মিনার্ভা থিয়েটারের EXIT লেখা ভাঙা লোহার টুকরো। লেখাটা ভেঙেচুরে আছে। ওটাতে ১০০ না ৬০ ওই ওয়াটের একটা বাল্ব লাগিয়ে ওই কয়লাখনির পেপার সারফেসের গায়ে বসিয়ে আলো জ্বেলে দিলাম। আমি চমকে উঠলাম। ওই ভাঙাচোরা EXIT-এর মধ্য দিয়ে আলোটা যখন বেঁকেচুরে আসছে তখন পিকিউলিয়ার সব ডিজাইন তৈরি হয়ে গেছে, যে ডিজাইনটা ভেবেচিন্তে বার করতে পারতাম না। তখন আরও ছোট ছোট কিছু নস্যির কৌটো, লজেন্সের কৌটো পেরেক দিয়ে এলোমেলো ফুটো করে মাইনের বিভিন্ন জায়গায় — যেখানে যেখানে অ্যাকটিং-এর মুভমেন্ট ছিল, কম্পোজিশন ছিল — তা ক্যালকুলেট করে লাগালাম। চরিত্রগুলির ট্র্যাজেডি, মুখগুলোর ভয়ঙ্করতা, তাদের ছায়া দূর থেকে, কাছ থেকে দেখা গেল। একটা পেন্টিং এফেক্ট চলে এল। উডকাট বা লিনোকাটের মতো চেহারা নিল। পুরো অন্ধকারের ফিলিংসটা রেখেও কাজটা করা গেল। যে কাজটা করতে হাজার পনেরো টাকার প্রয়োজন বলে মনে করেছিলাম, তা করতে পনেরোশোও নয়, গোটা কয়েক বালব, হোল্ডার আর টিনের কৌটোই যথেষ্ট। এই আলোর নাম হয়ে গিয়েছিল মটন-প্যারী। একটা জায়গায় যদি দিনের পর দিন কাজ করা যায়, স্টুডিওর মতো করে, ওয়ার্কশপের মতো করে, ল্যাবরেটারির মতো করে তখন ওই সার্টেন থিংকস, ওই ইমাজিনেশনটাকে কাজে লাগানো সম্ভব হয়। প্যাশান, ফ্রেম, ইমাজিনেশনের তাগিদ থেকে যে তাড়না আসে তার থেকেই সলিউশনটা বেরিয়ে আসে। কোনও উপকরণ ছিল না, সামান্য জিনিস দিয়ে ব্যাপারটাকে

জানতে হয়েছে, বুঝতে হয়েছে। লড়াই করতে হয়েছে আলোর দেবতা বা অন্ধকারের দানবের সঙ্গে। আলোর ভূত বা অ্যানজেলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি বই পড়ে, কাজ করে, তার সঙ্গে সহবাস করে। ইনটিমেট জীবনযাত্রার ফলে যে ইনার ফিলিংস হয়েছে তার সঙ্গে একাত্ম হয়েছি। যখন বৃষ্টির ফোঁটা জলের মধ্যে পড়ে তখন আলো কী করে? মোমবাতির আলোয় ছায়া কাঁপে তখন ছায়ার ভাষা কেমন? মোটরের হেড লাইটের আলো জ্বলাকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি। নিবিড়ভাবে, সূক্ষ্মভাবে ক্যারেকটারগুলিকে বুঝতে চেয়েছি। অনেক জিনিস থাকলে, অনেক ইকিউপমেন্ট থাকলে যা হয়, না থাকার ফলে, দরিদ্র অবস্থার ফলে, অভাবের ফলে, চ্যালেঞ্জের ফলে মনের তাগিদ দিয়ে নতুন নতুন ভাবনাকে খুঁজে পেয়েছি। যার শুরু করেছিলাম বছরূপীর 'রক্তকরবী' তে ইকড়িমিকড়ি দিয়ে।

তারপর 'সেতু' নাটকের ট্রেনের দৃশ্য। ড. চার্লস এলসন ফুল ব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে এখানে এসেছিলেন। ট্রেনের সিনের পর ইন্টারভ্যালে তিনি ভিতরে এসে দেখতে চেয়েছিলেন, কী করে হল? আমি তাঁকে দেখালাম। দেখার পর যে মন্তব্য করেছিলেন তা আমার আজও মনে আছে, অত্যন্ত ইনসপায়ারড্ হয়েছিলাম, বলেছিলেন,'হলিউড অ্যান্ড ব্রডওয়ে উইথ অল ইটস রিসোর্সেস অ্যান্ড মানি কুড নট হ্যাভ এভার ড্রেমপট্ অফ সাচ এ সলিউশন।' পরবর্তী কালে আরও অনেকের সাদিধ্যে এসেছি। রাশিয়া, জার্মানি, ইংল্যান্ডের থিয়েটারও অল্পস্বল্প দেখেছি; আমার দেখে মনে হয়েছে, যন্ত্রপাতি-কাগজ কলম তো সকলেরই আছে কিন্তু সকলেই কি এভাবে গড়তে পারে? প্রকৃতির মধ্য দিয়ে যে আলোআঁধার পাই, যা আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে তা কি কেবল টেকনোলজি দিয়ে গড়া যায়। আমি এই ইনার ফেনোমেনাগুলোকে বোঝার চেষ্টা করি; যে ভাল লাগাতে কবিতা হয়, গান হয়, ট্র্যাজেডি গড়ে ওঠে তাকে খোঁজার চেষ্টা করি। সেই উপলব্ধি থেকেই মিনার্ভায় উপায় খুঁজি — যা টাকার অংকে মাপা যাবে না। দারিদ্রের সংগে লড়াই করতে করতে খুঁজেছি।

প্রসঙ্গত আর একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। পঞ্চাশের গোড়ায় আমরা গিয়েছিলাম বিষ্ণুপুরে একটা নাটক করতে। মৃণাল সেন, গীতা সোম — তখনও মৃণালের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়নি, অনুপকুমার আরও অনেকে। একটা শ্যাডো প্লে হবে। মৃণালের স্ক্রিপ্ট। আমরা গেছি উত্তরপাড়ার ভদ্রকালি নাট্যচক্র থেকে। ওখানে গিয়ে দেখলাম কারেন্ট নেই। ইলেকট্রিসিটি ছাড়া শ্যাডো



সিন হবে কী করে? নাটকের মধ্যে ওই শ্যাডো সিনটা অত্যন্ত জরুরি, অনেকে বলল, ওটা বাদ দাও। আমি ভেবে নিয়ে ওখানকার কর্মকর্তাদের একজনকে বললাম — আচ্ছা আপনাদের এখানে কারও সাইকেল আছে? ডায়নামো দেওয়া লাইট থাকে, এরকম সাইকেল চাই। বলল, আছে। আমি বললাম, একটু এনে দেবেন। ডায়নামো লাইওয়ালা একটা সাইকেল এনে দিল। আমি সেটাকে পর্দার পিছনে কেরিয়ার স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে প্যাডেল করতে লাগলাম। চাকার স্পিড যত বাড়ে আলোও বাড়ে, যখন কমে আলোও কমে। ওই দিয়ে শ্যাডো সিন হয়ে গেল, আলোও পেলাম আবার ডিমাণ্ডও পেলাম স্রেফ চাকা ঘুরিয়ে। তাতে যে এফেকট হল তা ভোলবার নয়। বিষয়টা অতি তুচ্ছ আবার তুচ্ছ নয়ও।

'সেতু' নাটকের কথাটা বলি। সেতুর রেল গাড়ির সিনটা করা হয়েছিল আলো আর শব্দ দিয়ে। সত্যিকারের কোনও রেল ইঞ্জিন দেখাইনি। সেতু নিয়েও ভাবতে হয়েছে। অনেক টাকা দিয়ে নেট কেনা হল। নেট নড়বে গাছপালা নড়বে আর ঝমঝম্ ঝমঝম্ আওয়াজ হবে। রাত দুটোর সময় আমি হয়ত খালি গায়ে আন্ডারওয়ার পরে ওইসব পরীক্ষা করছি। পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলাম, যে স্পট থেকে আলোটা পড়ছে তা দিয়ে প্রথম পর্দায় একটা রিং সার্কেল হল, তারপরের পর্দায় একটু ঝাপসা হয়ে বড় একটা সার্কেল হল, তার পরেরটায় আরও বড়, আলোর একটা টানেল হয়ে গেল। ওই আলোর সার্কেলটা যে নেটেপড়বে সেটা ভাবিনি। আলোর বিম একটা পড়লে নেটে সেটা ক্যাচ করবে। তাই আমি ওগুলো সব খুলে ফেলতে বললাম। দক্ষিণেশ্বর সরকার বললেন, ও কি মশাই, কী করেছেন, কাজ করবেন না? আমি বললাম, না আজ করব না। নেটগুলো খুলে রাখা হল। মনে মনে ভাবছিলাম, দূর কী বোকার মত ভেবেছিলাম? রেল লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে ট্রেনের আসা যাওয়া দেখি। প্রতি মুহূর্তে যে অনুভূতিটা হয় তাকে ধরবার চেষ্টা করি। দেখলাম, দূর থেকে ছোট আলোটা যখন বড় হয়ে কাছে আসে তখন আমার মনকে বিভ্রান্ত করে দেয়, সোজা মোটরের হেড লাইটটা যখন চোখে পড়ে তখন আর কিছু দেখা যায় না। এই সলিউশনটা খুব জরুরি ছিল আমার কাছে। এই যে অন্য কিছু দেখা যায় না বুঝলাম, সেটা দেখাবার জন্য বিশ্বরূপার দেওয়াল কালো রংয়ের পেন্ট করালাম, গাছপালা দিয়ে রেললাইনের ধারগুলো যেমন হয়, সেরকম করবার চেষ্টা করলাম। ছোট থেকে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে আলোটা যখন বড় করলাম এবং ইঞ্জিনের শব্দটা বড় করে বাজতে থাকে তখন দর্শকও অন্য কিছু দেখতে পেত না, পায়ওনি কোনওদিন।



এই আলোটা করবার জন্য ব্যাটারি দেওয়া একটা ছোট ফ্যান কিনেছিলাম, ফ্যাসানেবেল মহিলারা যে ফ্যানগুলো ব্যবহার করেন। ওই ফ্যানের ব্লেডগুলি খুলে ফেলে একটা কার্ডবোর্ডের ক্রশ তৈরি করে সামনে লাগিয়ে দিলাম। একটা মিরার স্পটের সামনে ওই ফ্যানটা ফিট করে দিলাম। মিরারে একটা ন্যারো এ্যাঙ্গেল প্যাটার্ন টুয়েনটি থ্রি আলো হয়। আলোটা স্টেজের অন্যপ্রান্তে, দর্শকদের উল্টোদিকে স্টেটুি একটা জায়গায় বসানো হত। তার ফলে আলোটা যখন ছোট থেকে বড় হচ্ছে, ডিমারের সাহায্যে আলোর ইনটেনসিটি যখন বাড়ছে, তখন একটা বেড সুইচ টিপে ব্যাটারি ফ্যানটাকেও চালিয়ে দেওয়া হত। তাতে আলোটা ফ্লিকার করত। গাড়ির আওয়াজ, হুইলের, গাছপালার মধ্য দিয়ে ছোট আলোর রেখা পড়ত। এই দৃশ্যটাকে অনেক আগে থেকে গড়তে হত। যেমন, ওই দৃশ্যের আগে খুব ইমোশনাল একটা সিন ছিল। অসীমা — যে রোলটা তৃপ্তি মিত্র করতেন, সে বোনের ছেলের অন্নপ্রাশনে আশীর্বাদ করতে গেলে কনজারভেটিভ প্রাচীনরা বলল, ও মেয়ে বাঁজা, ও ছুঁলে অকল্যাণ হবে। অথচ দুই বোনের সম্পর্ক ছিল ভাল। অসীমা অপমানিত হয়ে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে যাবার সময় প্রচণ্ড মিউজিক থাকত। ওই দৃশ্যটা মঞ্চের সামনের দিকে করে হত। রিভলভিং স্টেজের ডেপথ বেশি থাকে না; ফলে খুব কম ডেপথে সাদামাটা আলোয় দৃশ্যটা হত। ডেলিবারেটলি আলোর কোনও কায়দাকানুন করিনি। কিন্তু পরের দৃশ্যটা-শিফটারররা বলত ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া, স্টেজটা ঘুরত পুরো খালি অবস্থায়, অন্ধকার আর গাছপালা। ওই গাছপালাগুলি এবং আরও কয়েকটা জিনিস শিফটাররা আগেই রেখে দিত, অন্ধকার সেই মঞ্চে অসীমা দেখছে তীব্র আলোর রেখা আবছা করে গাছগাছালি কেটে কেটে পুরো সার্কেলের মধ্যে রিভলভিং ডিস্কের ২৬ না ৩০ ফুট ডায়ামিটারে ঘুরে যাচ্ছে দর্শকের সামনে। কিন্তু কেউ কিছু দেখতে পারছে না। ওই কাটা কাটা তীব্র আলো আর ট্রেনের শব্দে সব নৈঃশব্দ ভেঙে খানখান হয়ে যেত। আর একটা জিনিস করেছিলাম। যেই অন্ধকার হত, তখন স্টেজের প্রায় চল্লিশ ফুট দূরে প্রথমে একটা লাল আলো তারপর নীল আলোর বিন্দু দেখা যেত, মানে ট্রেন আসবার সিগন্যাল দিল। তারপর একটা আলোর বিন্দু আর কু..... করে একটা হুইশেল। আজকাল ট্রেনের হুইসেল পাল্টে গেছে; কিন্তু আমি ওই আওয়াজটা জোগাড় করেছিলাম। ছোটবেলায় মাঝরাত্তিরে যখন ওই আওয়াজটা শুনতাম তখন প্রাণ কীরকম উদাস হয়ে যেত, মন টেনে নিত ওই শব্দে। অনেক দূর থেকে অনেক হাওয়া সাঁতরে যে শব্দ আসে তার একটা রূপান্তর হয়, স্কেল চেঞ্জ হয়ে যায়। তাই ওই শব্দটা নিয়েছিলাম, সব মিলিয়ে যে দৃশ্যটা তৈরি হত তা শব্দে — কথায় আমার পক্ষে বর্ণনা করা কঠিন। রেল লাইনের ওপর একটা ছায়ামূর্তি আসতে আসতে উঠছে। স্টেজ-ফ্লোর থেকে সাত-আট ফিট উঁচুতে — কাটা কাটা আলোয় আবছা মূর্তিটা একসময় তীব্র আলোয় কেটে বেরিয়ে যায়। তখন আলোর ইনটেনসিটি বেড়ে যেত, আলোর শাটার খুলে দিতাম; সেই সঙ্গে হাউসের স্পিকারে পুরো সাউণ্ডটা দেওয়া হত। নায়িকা রেললাইনের ওপরে আর নায়ক অসিতবরণের চিৎকার 'যেও না....' একমুহূর্তে নায়িকাকে জড়িয়ে ধরে লাইন থেকে সরিয়ে নেয়; মঞ্চটা ঘুরে যায়। এই সিনটা করবার জন্য নাটকের প্লটের অদলবদলও করতে হয়েছিল। ওই সিনটা করবার জন্য প্রথমে নাটকারকে, পরে শম্ভুবাবুর সঙ্গে কথা বলে তৃপ্তি মিত্রকে, সবশেষে প্রোপ্রাইটার দক্ষিণেশ্বর সরকারকে রাজি করিয়েছিলাম। দক্ষিণেশ্বরবাবু প্রথমে ওই সিনটার কথা শুনে বললেন, ছিঃ ছিঃ এ আপনি কি বলছেন? এই রকম সুইসাইড তো ছোটলোকেরা করে। এইরকম একটা অ্যারিস্টোক্র্যাট মহিলা এরকম করবে? তা ছাড়া মিসেস মিত্র রাজি হবেন? আমি বললাম, মিসেস মিত্রর সঙ্গে কথা বলে এসেছি, শম্ভুবাবুকেও বলেছি, বিধায়কবাবুকেও, উনি তখন কিছু বলেননি।

অরিজিন্যালি ওই সিনটা অন্য ক্যারেকটারের ছিল। কিন্তু আমার মনে হল, সেন্ট্রাল ক্যারেকটারদের দিয়ে সিনটা করলে তার ইমপাক্ট অনেক ভাল হবে। যাই হোক, এ সব কথাবার্তা বলে, একদিন রাতে বিধায়কবাবু বাড়িতে গেলাম। বললাম, বিধায়কদা, সিনটা যদি তুমি এরকম করে দাও। উনিও প্রথমে ভুরু কোঁচকালেন; তারপরে বললেন, আচ্ছা কাল সকালে এসো। তারপর দিন সকাল ছটা-সাড়ে ছটায় ট্যাক্সি করে বিধায়কদার বাড়ি গেলাম, আমি তখন প্রচণ্ড উত্তেজিত। বিধায়কবাবু আমার সামনে বুকে পাশ বালিশ দিয়ে শুয়ে শুয়ে একটা ফুলস্কেপ পাতার দু-পাতার একটা সিন লিখলেন। বিধায়কদা খুব সুন্দর নাটক পড়তে পারতেন। উনি দু-পাতা পড়লেন। আমি বললাম, ঠিক আছে। সেদিন দুপুরে যখন সবাই এল, তখন বলা হল। তাতে অনেক রকম অশান্তি হয়েছিল, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সিনটা রাখা গিয়েছিল।

সাউণ্ড ট্র্যাকের সময় আমার মনে হয়েছিল ট্রেনের দ্রুত শব্দ করে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না। কাটা কাটা অলটারনেটলি সাউণ্ডটা চাই। আলো-ছায়া-শব্দ দিয়ে নাটকের মুডের সঙ্গে ধরাতে গেলে এ ভাবেই করতে হবে। তখন মনে হল যে ব্রিজের ওপর দিয়ে ট্রেন যাবার সময় যে শব্দটা হয় সেটা থাকলে ভাল হয়। কমল চৌধুরি আর নুটুকে নিয়ে অনেক রকম সাউণ্ড তুলেছিলাম। কালভার্টের ওপরে ট্রেনের আওয়াজ, ব্রিজের ওপরের আওয়াজ।

সেগুলো কাজে লাগিয়েছিলাম। ধোঁয়ার জন্য ধুনো জ্বালাতাম। দর্শক হঠাৎ যাতে গন্ধটায় বনসাস না হয়ে ওঠে, তার জন্য অনেক আগে থেকে ধুনোর গন্ধটা ছড়িয়ে দিতাম। সব মিলিয়ে যে ম্যাজিকটা তৈরি হত তাতেই মানুষ উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ত। গল্পটা বললাম এই কারণে যে ১৯৫৯-৬০ সালে এই নাটকটা সাড়া জাগিয়েছিল, পাঁচ বছর টানা চলেছিল নাটকটা, সমস্ত জায়গায় মানুষের টকিং পয়েন্ট ছিল 'সেতু' — তার গঠনটা কীভাবে গড়ে উঠেছিল তা জানা জরুরি। এটা নাটকের সাকসেস না নাটককারের ফেলিওর না পরিচালকের ফেলিওর — এটা নিয়ে তর্ক শুরু হয়ে গেল। তখন থেকেই একটা অভিযোগ এল আমার সম্পর্কে, আঙ্গিক বড় না নাটক বড়। কাগজে অনেক লেখালেখি হয়েছে — তাপস সেন তার টেকনোলজি দিয়ে বাংলা নাটকের বুকের ওপর দিয়ে ট্রেন চালিয়ে দিল; বাংলা নাটককে জলপ্রাবনে ভাসিয়ে দিয়ে গেল, এইসব অভিযোগ শুনেছি।

নাটকের মনস্তত্ত্বের দিক থেকে, একটা ক্লাইমেক্স বা ট্র্যাজেডি যখন হয়, একজন মৃত্যুশয্যার অভিনয় যদি ভাল করে তা হলে তো দর্শক হাততালি দেয়। নাটকের ট্র্যাজেডির মধ্যে যদি চূড়ান্ত একটা জায়গায় পৌঁছে যায় তখন দর্শকের হাততালির সাইকোলজি কোনও স্পেক্টাকেল বা ম্যাজিকের অ্যাপ্রিসিয়েশন নয়। যা কোনওদিন দেখেনি বা অভাবিত ভাবে এসে পড়া কোনও ঘটনা, তাতে মানুষের মনে যে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় তা টেকনোলজি-আর্ট-সাইকোলজি-থিম সব মিলেমিশে একাকার হয়েই তৈরি হয়। আমি যদি খামকা একটা ট্রেনের সিন দেখাই উপযুক্ত কোনও কনটেনট ছাড়া বা জলপ্রাবনের সিন দেখাই ম্যাজিকের মতো করে তা হলে কি এই ইমোশোনগুলো, সেন্টিমেন্টগুলো মিলেমিশে একাকার করে দিয়ে টোটালিটি আনতে পারতাম? আমি মনে করি না সেতুর ট্রেনের সিন যদি নাটকের গোড়ায় বা শেষে হত তা হলে ওই ইমপ্যাক্ট তৈরি হত। বিষয়ের ভাবাবেগের সঙ্গে বিনুনির মতো পাকিয়ে পাকিয়ে দর্শক-ভাবাবেগ গড়ে তোলা গিয়েছিল বলেই ট্রেনের দৃশ্যের সাফল্য এসেছিল। 'অঙ্গার'ও স্টোরি বিলড-আপ না করে ওই জলপ্রাবনের দৃশ্য দেখালে তার কোনও এফেক্টই হত না। এই দৃশ্যরচনার যে ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি তা যেমন সৃষ্টিছাড়া তেমনই অত্যন্ত সহজ কতগুলো ফেনোমেনা, যা সর্বত্র দেখি — সেই সব উপকরণকে কাজে লাগিয়ে আমরা করেছিলাম — যা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু লোকের শুনতে বা জানতে কতটা ভাল লাগবে জানি না।

প্রসঙ্গত দুটো মজার কথা বলি, আমি দু'বার মঞ্চে উঠেছিলাম অভিনয় করতে। বহুরূপী একবার বর্ধমানে মহম্মদ ইস্রাইলের গ্রামে গিয়েছিল 'পথিক' নাটকের অভিনয় করতে। একটা দৃশ্যে একজনকে একটা বই মঞ্চে দিয়ে আসতে হবে। বোধহয় তুলসী লাহিড়িকে মঞ্চে দিতে হবে। যে এই পার্টটা করে সে আসেনি। তখন আমি জামাটা ওটিয়ে চুল এলোমেলো করে বই হাতে ঢুকে পড়লাম। তুলসীদা আমায় দেখে চমকে উঠে মঞ্চেই ফিসফিস করে বলে ফেললেন, আরে তুমি! ওই আমার প্রথম অভিনয় আর দ্বিতীয় অভিনয় এল.টি.জি-র অঙ্গারে। বম্বের রঙ্গভবনে। মিনার্ভা থিয়েটারে অনেকগুলি সুবিধা ছিল; স্টেজের তলায় যাওয়া যেত বলেই অনেকগুলি প্ল্যান করা হয়েছিল, সেখান থেকে আমরা ছোট ছোট আলো বসিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু বম্বের হলটি বড় এবং ওপেন এয়ার, স্টেজ কংক্রিটের, আশেপাশে টিউব লাইট ছিল। অসুবিধা অনেক, কিন্তু অঙ্গারের নামডাক অনেক হয়ে গেছে। বম্বের সাহিত্যিক-সাংবাদিক-ফিল্ম-থিয়েটার — ওয়ার্ল্ডের সবাই প্রায় আসবেন। ফলে দুশ্চিন্তা বাড়ল, আমি প্রথমেই বললাম, টিউব লাইট জ্বালানো যাবে না, দরজা বন্ধ করে সব কাজ করতে হবে যাতে কোনও আলো এসে না পড়ে। সব ঠিক ঠাক হল, কিন্তু শো চলাকালীন এক বিপদ দেখা গেল। জলের সিনের জন্য পলিথিন থাকত। সবচেয়ে সামনেরটা একটা সুতো দিয়ে বেঁধে রাখা হত। সিনের মাঝখানে অন্ধকারে সুতো দিয়ে টেনে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া হত। পলিথিনের চাদরগুলো একটা দুটো করে ডানদিক বাঁদিক করে উঠত। সেই সুতোর কয়েকটা ছিঁড়ে গেছে না পাকিয়ে গেছে। তখন কালো সুতো খোঁজা হচ্ছে। শো চলছে, কোথায় কোন বাক্সে রাখা আছে তাড়াতাড়ি করে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। মনে মনে 'হায় ভগবান' করছি, কী করব ভাবতে ভাবতে নিজের গায়ের জামাটা খুলে প্যান্ট গুটিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে টলতে টলতে ঢুকে গেলাম। মঞ্চে সবাই আমাকে দেখে অবাক, আরে তাপসদা! কেউ কেউ ডায়লগ গুলিয়ে ফেলল। ইলেকট্রিসিয়ানরা, উৎপল নিজেও টেনসড — কী হবে? সিন এসে গেছে। ওই অবস্থায় আমি পোজ-ফোজ দিয়ে আবছা আলোয় একবার বসি, একবার হাঁপাই — এই করতে করতে পলিথিন সিট এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে নিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। আমিও অন্যপ্রান্তে গেলাম আর সেই দৃশ্যও এসে পড়ল। কোনওভাবে রক্ষা পেয়েছিলাম সেদিন। ঠিক মুহূর্তে ওই দৃশ্যটা না করতে পারলে দর্শক কি চার্জড হতেন সেদিন? নাটকের ওই মুহূর্তটা নাটকেই গড়ে উঠেছিল বলে আমি কাজে লাগাতে পেরেছিলাম আলোকে নাটককে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অবশ্যই নয়।

'অঙ্গার'-এর পর একটা নাটক করেছিল এল.টি.জি — সেই নাটকটার নাম ভি.আই.পি। মজার একটা নাটক, কিন্তু আমার



একেবারেই ভাল লাগেনি। সেই কারণে আমি তখন মিনার্ভায় যেতামও না; আক্ষরিক অর্থেই যেতাম না। নাটকটা একদমই চলেনি। 'অঙ্গার'-এর পর এল.টি.জি-র সার্থক নাটক 'ফেরারী ফৌজ'। তিরিশের দশকের সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে নাটকটা লিখেছিল উৎপল। তার নায়ক শান্তি রায়। সাধারণে একজন মানুষ; কিন্তু ওই লোকটাই ছিল বিপ্লবী দলের নেতা; বাইরের কেউ সেটা বুঝতে পারত না। উৎপল অনেক ভেবেচিন্তে চরিত্রটা লিখেছিল। এল.টি. জি.-তে তখন উৎপলের প্রিয় অভিনেতা রবি ঘোষের কথা ভেবেই চরিত্রটা লিখেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে রবি ঘোষ এবং আরও কয়েকজন দল ছেড়ে চলে যায়। আমি তখন ছুটোছুটি করে ওদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। রবি ঘোষ, শ্যামল সেন, এরকম আরও কে কে ছিল মনে নেই — ওরা এল না। অথচ নাটক নামানোর সমস্ত প্রস্তুতি শেষ। তখন উৎপল ঠিক করল, ও নিজেই চরিত্রটা করবে। চরিত্রটা লেখা হয়েছিল রবি ঘোষের কথা বলার প্যাটার্ন, তার ছোটখাটো চেহারা — এসব ভেবে, উৎপলের সঙ্গে তা কোনওভাবেই খাপ খায় না। তবুও উৎপল চরিত্রটা করল। একদিনের কথা মনে আছে — উৎপল রিহার্সাল করছে, একটা সংলাপ ছিল, 'My comrades are leaving me one by one' — এই সংলাপটা বলতে বলতে স্টেজের ওপরেই হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল। উৎপলের মতো মানুষের এই আবেগ দেখে তখন সকলেই স্তম্ভিত। আমি তখন ছুটে গিয়ে ওকে সামলাতে চেষ্টা করলাম।

এই প্রযোজনার শেষ দৃশ্যটা রিহার্সাল করার সময় একটু অন্যভাবে ভেবেছিল উৎপল। সেটা ছিল, শান্তি রায় মারা যাবার পর কে একজন একটা ছাতা দিয়ে মৃতদেহটা ঢেকে দিয়েছিল। তারপর এক এক করে অনেকগুলি বৃষ্টিভেজা ছাতাওয়ালা মৃতদেহ ঢেকে দেয়া আর তার মধ্য দিয়ে শোনা যায় — 'শান্তিরায় অমর রহে'; স্লোগানটা ছিল সমবেত ভাবে, এই ভাবনা উৎপলের কোথা থেকে এসেছিল জানি না, আমার ভাল লেগেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত উৎপল ওটা রাখেনি। ও বলল, 'ধুর! পাবলিক থিয়েটার এভাবে শেষ হলে কেউ নেবে না। একটা স্পেক্টাকেল এন্ড দরকার। তারপর অনেক ভেবে আগুনের একটা দৃশ্য তৈরি করা হয়েছিল ওই শেষ দৃশ্যে।

এল.টি.জি-তে দ্বিতীয়বার রবিশঙ্কর এই নাটকে মিউজিক করেছিলেন। অঙ্গারের থেকে একেবারে আলাদারকমভাবে। ক্ল্যাসিক বেস কতগুলি পিস তৈরি করেছিলেন তিনি। এই নাটকের মঞ্চও হয়েছিল অন্যরকম। নির্মল গুহরায় নানা লেভেল ব্যবহার করেছিলেন, ব্রক তৈরি করেছিলেন — ব্রিজ একটা লেভেল, আবার রাধা নামে বারবণিতার ঘর আর একটা লেভেল-লাইট দিয়ে মস্তাজ দৃশ্য তৈরি করা হয়েছিল; বাজার-ঘর-ব্রিজ নিয়ে নির্বাক অভিনয় হত ওই দৃশ্যে। উৎপল ছাড়া হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাই ঘোষ, নীলিমা দাস — এরা সব অসম্ভব ভাল অভিনয় করেছিল। আমার মতে, উৎপলের সার্থক নাটকগুলির মধ্যে 'ফেরারী ফৌজ' একটি। নাটক লেখার শিক থেকেও এক একটা নাটকে এক একটা সময় ও পটভূমিকে উৎপল যেভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করত, সেটাও আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

এরপরেই যে নাটকটা উৎপল করল, তা আগের অন্যসব নাটকের থেকে আলাদা। অদ্বৈতদেব মল্লবর্মনের লেখা উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর প্রযোজনা — ভাবনা দেখে চমকে উঠেছিলাম। এই নাটকে অভিনয়ের জন্য বিজন ভট্টাচার্যকে আনা হয়েছিল। এটা একটা বিশেষ ঘটনা। মনে পড়ে, রিহার্সাল চলাকালীন বিজনদার পাঠ ভুলে যাওয়া, উৎপলের রাগারাগি — এরকম কত ঘটনা। এই প্রযোজনার সময় উৎপলের মাথায় ঢুকল, মিনার্ভা হলের মাঝখান দিয়ে একটা র‍্যাম্পের মতো করতে হবে। সেটা ওর চাই-ই চাই। সেটা করতে গিয়ে নানারকম বাধা এল। কারণ পাকাপোক্ত পঞ্চাশ-ষাটটা চেয়ার তুলে ফেলতে হবে। মালিক কন্ডাক্টারদের প্রবল আপত্তি, কর্পোরেশনেরও আপত্তি, আমি সত্যজিৎ রায়কে বললাম; কর্পোরেশনের রনজিৎ সিনহা আমাদের পুর্ব পরিচিত — তাকেও বললাম। একদিন উৎপল, আমি, সত্যজিৎ রায়, রনজিৎ সিনহা আলোচনায় বসলাম। সত্যজিৎবাবু বললেন, নাটকের প্রয়োজনে লাগলে ওটা তো করতেই হবে। ওঁর প্রভাব খাটিয়ে অন্য সব অবজ্ঞা করেই র‍্যাম্পটা করা হল। স্টেজ এবং অডিটোরিয়ামের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী একটা পাটাতন বানানো হল। এর আগে এ রকম কোনও কাজ হয়েছে বলে জানা নেই। তবে অডিটোরিয়াম ব্যবহারের কথা শুনেছি দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পি.ডবলু.ডি' নাটকে বা শিশির ভাদুড়ির 'রীতিমত নাটক', কিন্তু কোনওটাই উৎপলের এই প্রযোজনার মতো নয়।

এই 'তিতাস' নিয়ে কতরকম মজার ঘটনা ঘটেছিল, তা আজও মনে পড়ে। মিনার্ভায় রামকৃষ্ণদেবের একটা ছবি ছিল। উৎপলের দৌলতে সেটা একদিন খুলে ফেলা হয়। কিন্তু হলের কর্মচারীরা আপত্তি করায় আবার সেটা টাঙানো হয়। একদিন ভরদুপুরে, হলে তেমন লোকজন হচ্ছে না, উৎপল রামকৃষ্ণদেবের ছবির নীচে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, 'কিছু একটা করো না শালা, নটনাথ হয়ে বসে আছো, লোকজন নেই, কী করি?' আর একদিন আমি সবে গ্রিনরুমে ঢুকেছি, সেদিনও প্যাচপেচে গরম, লোকজন হচ্ছেনা। উৎপল আমাকে দেখে বলল, 'মারা গেছে?' আমি বললাম, 'কে?'

উৎপল বলল, 'নরেশ মিত্র ?' বললাম, 'না'। উৎপলের সরস মন্তব্য, 'মারা গেলে তো শো-টা বন্ধ করতে পারতাম। সেটাও তো একটা কাজের কাজ হত,'। নরেশ বাবু তখন খুবই অসুস্থ ছিলেন। কয়েকদিন বাদেই বোধহয় উনি মারা গিয়েছিলেন। আগে যে র‍্যাম্পটার কথা বললাম, ওটাতে গোকনঘাটের মেলার দৃশ্যটা হত। উৎপল ওটা দিয়ে আসত আর বলত, 'আসেন বাবুরা আসেন, গোকন ঘাটের মেলায় আসেন।' – আর তখন সমস্ত হল জুড়ে, এমনকী ব্যালকনিতেও লোকজন, ঢাকঢোল, পতাকা সব নিয়ে অসাধারণ একটা দৃশ্য তৈরি হত। একদিন উৎপল ঢোকার মুখে দেখে একজন শিফটার ঠোঙায় করে জিলিপি খাচ্ছে। উৎপল তার ঠোঙাটা কেড়ে নিয়ে, 'আসেন বাবুরা আসেন...' করতে করতে সেই র‍্যাম্প দিয়ে ঢুকে পড়ে আর দর্শকদের হাতে জিলিপি গুঁজে দেয়। দর্শকরা তো চমকে ওঠে। উৎপলের কালোবরণের পোশাক, বড় বড় চোখ নিয়ে 'জিলিপি খান' বললে দর্শক তো চমকে উঠবেই। তাই কেউ নিল, কেউ নিল না।

'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর একটা বিজ্ঞাপন করেছিলাম পৃথিবীর বহু নদীর নাম দিয়ে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-পদ্মা এগুলোও যেমন ছিল, তেমনই ছিল হোয়াং- হো, মিসিসিপি ইত্যাদিও। কাউকে না বলে ওরকম একটা বিজ্ঞাপন লিখে যখন উৎপলকে দেখালাম, তা দেখে উৎপল তো অবাক। কয়েকটা নদীর নাম তারপর 'তিতাস' আবার কয়েকটা নদীর নাম তারপর 'তিতাস' এরকমই ছিল বিজ্ঞাপনটা। তিতাসের সেই স্মৃতি আমার এখনও আছে। সেই বিজ্ঞাপনটাও আমার কাছে গর্বের। পরে আমার বন্ধু ঋত্বিক ঘটক তিতাস নিয়ে একটা সিনেমাও করেছিল। সেই সব নিয়ে তিতাসের স্মৃতি আমার কাছে বেশ উজ্জ্বল। একটি মেয়ের কথা বলি— তিতাসে মেলার দৃশ্যে অভিনয় করত একটি মেয়ে। তাকে আমিই নিয়ে এসেছিলাম এল.টি.জি-তে। ষাটের দশকের গোড়ায় লেকে রবীন্দ্র সরোবরের ছোট মঞ্চে একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছি, প্রোগ্রামের শেষে আমাকে প্রণাম করে বলল, 'তাপসমামা আমাকে চিনতে পারছেন ?' আমি প্রথমে ওকে চিনতে পারিনি। পরে মনে পড়েছে। আমি যখন পার্টির হোলটাইমার ছিলাম তখন টালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের কাছে একটা বস্তির ঘরে থাকতাম আর চারু এভিনিউয়ে সুনীল মুখার্জির বাড়িতে একবেলা খাবার ব্যবস্থা ছিল। সুনীলের মা একদিন জিজ্ঞেস করলেন, আর একবেলা কোথায় খাই ? আমি নিরুত্তর। তারপর থেকে উনিই জোর করে দু-বেলা খাওয়াতেন। তখন দেখেছিলাম সুনীলের দিদির এক দু-আড়াই বছরের ফুটফুটে মেয়েকে। এখন কুড়ি-বাইশ বছর বাদে তাকে মনে থাকার কথাও নয়। যাই হোক, পরিচয় জানার পর ও বলল, সিরিয়াসলি থিয়েটারে কাজ করতে চায়। আমি ওকে উৎপল- শোভাদির কাছে নিয়ে আসি। তিতাসে মেলার ভিড়ে কাজ শুরু করে। সেই মেয়েটি নিজের প্রতিভায় আর পরিশ্রমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই ছন্দা চ্যাটার্জি পরে 'টিনের তলোয়ার'-এ নায়িকার ভূমিকা ময়না চরিত্রে অভিনয় করেছিল। ওর গলায় সেই গানটা ছিল – 'ছেড়ে কলকেতা বন...'। পরে পেশাদার ও অপেশাদার মঞ্চে প্রচুর কাজ করেছে, সুনামও কুড়িয়েছে। তিতাস প্রসঙ্গে ওর কথাও মনে পড়ছে।

আলোর কাজটাও অন্যরকম ভাবনা থেকে করেছিলাম। একটা দৃশ্য ছিল, নদীতে নৌকায় বসে কালোবরণ রূপী উৎপল ষড়যন্ত্র করছে। নৌকাটা চলছে আর দূরে নদীর পারের গাছপালাগুলো সরে সরে যাচ্ছে। এর জন্য কোনও নৌকা বানাইনি। বাঁশের ডগায় একটা ছোট আলো বেঁধে দিতাম – যেন হারিকেনের আলোয় নৌকা বাঁধা, সেই বাঁশটাকে দুলিয়ে দিতাম, সঙ্গে জলের শব্দ, ঢেউয়ের রিফ্লেকশন দেখানো হত, দূর থেকে মনে হত অন্ধকার রাত্রে নদীর বুকে নৌকা চলছে। ষড়যন্ত্র করে ঠিক করেছিল মেঘনায় ডুবিয়ে মারবে, পর্দার সামনে উৎপল বলত, 'আইজ রাতে ম্যাঘনায়'– পর্দা সরে যেত। দেখা যেত মেঘনার দৃশ্য, তার অদূরের গ্রামের আবছায়া পটভূমি। জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। আর লাঠির মাথায় অর্ধগোলাকার বৃত্তের মধ্যে হালকা কমলা রঙের ম্রিয়মান একটা বালব ঝুলত। এ ভাবেই খুব সহজভাবে ওই হত্যাদৃশ্য গড়ে তুলেছিলাম। কাজটা খুবই ভাল হয়েছিল কিন্তু দর্শক সমাগম হয়নি। আবার দর্শক ফিরে এসেছিল 'কল্লোল' নাটকে।

'কল্লোল' প্রযোজনা একটা ইতিহাস তৈরি করে দিয়ে গেছে। কেবলমাত্র সাকসেসফুল প্রযোজনা হিসাবেই নয়, এর প্রভাব রাজনৈতিক-সামাজিক জীবনেও ভীষণভাবে পড়েছিল। 'দেশ', 'আনন্দবাজার'-এর মতো পত্রিকা, কংগ্রেস পার্টি এবং এ রকম আরও অনেকে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সামনে পড়ে গিয়েছিল। নাটকটির জনপ্রিয়তা ক্রমশই বাড়ছিল। এটা শুধুমাত্র থিয়েটারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এই নাটকের পটভূমি ছিল ১৯৪৬ সালের নৌবিদ্রোহ। তখন কম্যুনাল রায়টও চলছিল। নাটকটায় হিন্দু-মুসলমান সব ধরনের চরিত্র ছিল। মহারাষ্ট্রের লোকসঙ্গীত 'জাগা হায় ইনসান হামারা...' গানের ব্যবহার, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গীত; সুরেশ দত্তের জাহাজ — সব মিলিয়ে প্রযোজনাটি অন্যমাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল।

'কল্লোল' যখন নামবে তখন নির্মল গুহরায় ভারত সরকারের কি ইউনেস্কোর একটা স্কলারশিপ নিয়ে প্যারিস গিয়েছিল।



কল্লোলের জাহাজের সেট কী করে হবে সেই নিয়ে সবাই চিন্তিত। আমি তখন উৎপলকে বললাম, 'আমি করে দেব', উৎপল বলল, 'কী করে ?' বললাম, একটা ছেলেকে নিয়ে আসব। তাকে দিয়ে কাজটা করাব, এ রকম অনেককেই আমি এল.টি.জি-তে নিয়ে আসি। এমনকী শোভাদিকে আনার ব্যাপারেও আমার কিঞ্চিৎ ভূমিকা ছিল। সেন্ট্রাল স্কোয়াডে পানু পাল, মমতাজ আহমেদ খাঁ, ঋত্বিক ঘটক, উৎপল দত্ত, শোভা সেন – এরা সব অভিনয় করতেন। ওখানেই উৎপলের সঙ্গে শোভাদির আলাপ হয়। একদিন উৎপলই আমাকে বলল, শোভা সেন ভাল অভিনেত্রী, এল.টি.জি-তে অভিনয়ের জন্য কথা বলতে বলল। আমি একদিন শোভাদির বাড়ি গিয়ে শোভাদি এবং গোপাল সেনের সঙ্গে কথা বললাম। শোভাদি রাজি হয়ে গেল; শোভাদির স্বামী গোপাল সেনও মত দিলেন। শোভাদি এল.টি.জি-তে এলেন। যাই হোক, শিশুরঙমহলে কাজ করবার সময় একটি ছেলেকে দেখতাম, ভাঙাচোরা দেওয়াল তৈরি করে তাতে নানারঙ দিয়ে নাটকগুলোর নাম লিখছে, তারপর 'মুগলী' নাটকে দড়ি দিয়ে গাছপালার সেট বানাচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, ছেলেটির নাম সুরেশ দত্ত। বালকৃষ্ণ মেননের ছাত্র। সি.এল.টি-তে নাচের ক্লাশ করায়। ওর নাকি অনেক রকম আইডিয়া আছে। নজর পড়েছিল তখনই, ওকে নিয়ে এলাম উৎপলের কাছে;বললাম, 'এর নাম সুরেশ দত্ত, হাত নেড়ে নেড়ে পুতুল নাচায়,' শুনে উৎপল বলল, 'আমার তো সেট দরকার,' বললাম, 'পেয়ে যাবে,'। তো কী ভাবে হবে ? কিছু বইপত্র ঘেঁটে মিহির মুখার্জির সহায়তায় একদিন গঙ্গার ঘাটে গেলাম জাহাজ দেখতে। তারপর সুরেশ মিনার্ভার স্টেজের একটা প্ল্যান তৈরি করল। কোথায় কলাম আছে, কোথায় বিম ইত্যাদি মার্ক করে একটা কার্ডবোর্ড দিয়ে জাহাজের মডেল তৈরি করল। সাইড ভিউ, ফ্রন্ট ভিউ, লাইট হবে না হেভি এই সমস্ত প্রবলেমগুলি মনোহরপুকুর রোডের বাড়িতে বসে আমি, উৎপল, সুরেশ – তিনজনে বসে সলভ করতাম। সুরেশের সেটা প্রথম কাজ। তাই যতটা পারতাম উৎসাহিত করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু পরে সমস্ত ক্রেডিটটা সুরেশেরই। সেখানকার ছেলেপুলেদের আর মিস্ত্রিদের নিয়ে দিনরাত কাজ করে সেটটা তৈরি করেছিল। অসাধারণ কাজটা করেছিল। সেই সময় যৌথভাবে কাগজে নাম বের হত, আলো ও মঞ্চ তাপস সেন, সুরেশ দত্ত। সেই নাটকের জন্য আরও দু'জনের সাহায্য নিতে হয়েছিল। আমার দিল্লির স্কুলের সহপাঠী, বর্তমানে প্রয়াত কমলাকান্ত বসুকে নিয়ে এসেছিলাম নৌ সংক্রান্ত উপদেষ্টা ও পোশাক-পরিচ্ছদ সংক্রান্ত পরামর্শ নেবার জন্য। দীপক বসু নামে বিজ্ঞাপনে বের হত। আর একজন হলেন প্রাক্তন এল.টি.জি-র সদস্য শেখর চট্টোপাধ্যায়। ওর দীর্ঘ দেহ ও অনন্য কণ্ঠে শার্দুল সিং অভিনয়ের জন্য আবার প্রফেশনালি আনা হল তাকে। সেই মঞ্চ, জাহাজের বয়লার রুম, ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তি, নৌ বিদ্রোহের গোলাগুলি, কামান, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মিউজিক, মহারাষ্ট্রের লোকগীতির আদলে তৈরি থিম সঙ, সামগ্রিক অভিনয় – সব মিলিয়ে সেই প্রযোজনাটা দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তখন বাস কন্ডাকটাররা মিনার্ভার স্টপেজকে কল্লোল স্টপেজ বলতেন; বহু দূর দূর থেকে লোক আসতেন; রাজনৈতিব লেভেলে বিশেষত কম্যুনিস্ট পার্টির লোকজনেরা জেলা থেকে বাসভর্তি করে আসতেন নাটকটা দেখতে। হাউসফুল, দিনের পর দিন।

কল্লোলে ডেফিনিটলি একটা পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল ছিল এবং সে পলিটিকসটার মধ্যে অনেকে হয়ত কিছুটা ইতিহাসের বিকৃতিও খুঁজেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকলে তার জন্য নাটকের তথ্যাদির রদবদল অনেকেই করেন, উৎপলও করেছিল। ইতিহাসের তথ্য কতটা নিয়েছিল বা বদলেছিল সে আলোচনায় যাচ্ছি না। তবে এই নাটকগুলি অন্য একটা ব্যাপারও ঘটিয়ে দিয়েছিল। তখন রাজনৈতিক শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রটা কেমন যেন ঝিমানো, ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছিল। বহুরূপীর রক্তকরবী হয়ে গেছে, নিউ এম্পায়ারে রমরম করে চলেছে, কিন্তু 'অঙ্গার' সামাজিক দিক থেকে প্রচণ্ড সাড়া ফেলে দিয়েছিল। অঙ্গারের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে সমাজ-রাজনীতি-এক্সপ্লয়টেশন এসবের কাহিনী ছিল। কিন্তু সেখানে প্রত্যক্ষ কোনও রাজনীতির কথা আসেনি। ইংরেজ শোষকের পিরিয়ডটা ধরেছি উৎপল। ইংরেজ আমলের কোলিয়ারি জীবনের পটভূমিকায় ছিল সেই নাটক। শেলডন কোলিয়ারি কোম্পানির সাহেবমালিকদের বিরুদ্ধে ছিল সেই নাটক, যারা কয়লার শ্রমিকদের মেরেছিল জলপ্লাবিত করে। তারপরের নাটক 'ফেরারী ফৌজ' ছিল ৩০-এর দশকের পূর্ব বাংলার টেররিস্ট মুভমেন্টের নেতাদের নিয়ে ইংরেজ আমলের পটভূমিকায়। পূর্ববঙ্গের কোন ও এক গ্রাম-শহর ছিল নাটকের পটভূমি। শান্তি রায় নামক একজন বিপ্লবী – যে চরিত্রটি সাসপেন্স ও রোমান্স মিলিয়ে গড়ে উঠেছিল। তাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করেই নাটক। এই নাটকের মিউজিক করেছিলেন রবিশঙ্কর। এই প্রথম জোনাল লাইটিংয়ের কম্পোজিশন পেলাম। সেটা কখনও বাড়ি, কখনও গ্রামের বস্তি, কখনও ব্রিজ, কখনও আলাদা আলাদা জায়গায় মনতাজ সিন, ফেরারী ফৌজেই প্রথম রিয়েলিস্টিক সেট না বানিয়ে কতগুলি লেভেল ব্যবহার করা হয়। আমি প্রথম ডাইরেক্ট জোনাল লাইটিং-এর ব্যবহার করি। নাটকটা বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

কিন্তু কল্লোল-এর সময় ১৯৪৬-এর নৌবিদ্রোহ। তখন

কম্যুনাল রায়টও চলছিল। নাটকে হিন্দু মুসলমান সব ধরনের চরিত্র ছিল। মহারাষ্ট্রের লোকসঙ্গীত, 'জাগা হায় ইনসান হামারা...' গানের ব্যবহার, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মিউজিক, সুরেশের জাহাজ সব মিলিয়ে নাটকটা অন্য মাত্রায় পৌঁছে যায়। শ্রমিক বস্তি অ্যাটাকের সময়, বিদ্রোহ ভাঙবার জন্য মিলিটারি-পুলিশ আক্রমণ করেছে, এই সময় ওই গানটা বাজত ভয়ানক তেজের সঙ্গে। সেই স্পিডটাকে আমি আলোর মধ্য দিয়ে ব্যবহার করতে চাইছিলাম। সাঁজোয়াগাড়ির হেড লাইট, ওয়াটার ফ্রন্টের আর্চের ভেতর দিয়ে সেখানে শোভা সেন, গীতা সেন সহ কিছু শ্রমিকরা দাঁড়িয়ে আছে আর একটা আলো কেটে কেটে সেই উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। ওই আলোটার জন্য মস্তবড়ো লাটাইয়ের মতো একটা জিনিস তৈরি করেছিলাম। স্টেজের দিক থেকে একটা পাওয়ারফুল আলো অডিটোরিয়ামের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম। লাইটের স্পিডটা গানের স্পিডের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল আর সেই সময় ইনটারভেল কার্টেনটা পড়ত। একটা ভয়ানক মোমেন্ট সৃষ্টি হত। এ রকম আরও কয়েকটা মোমেন্ট ডিজাইন ছিল। যেমন অন্ধকারে একটা ইনটারন্যাশনাল গান হত। একটা একটা করে ফ্ল্যাগ উঠছে, অন্ধকার জাহাজে আলোছায়ার মধ্যে ফ্ল্যাগগুলো উড়ছে, কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ, লিগের ফ্ল্যাগ উড়তে উড়তে সমস্তটা অন্ধকারে ডুবে গিয়ে একটা লাল ফ্ল্যাগ উড়তে থাকে। তখন কমিউনিস্টদের একটা স্লোগান ছিল, 'কংগ্রেস-লিগ এক হো'.... তাই আলো আর ফ্যানের সাহায্যে যখন লাল পতাকাটা উড়ত তখন দর্শক হাততালিতে ফেটে পড়ত। এর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা পলিটিক্যাল পারপাস ছিল। নাট্যকার-পরিচালক চেয়েছিলেন একটা রাজনৈতিক ভাবনাকে তুলে ধরতে। সেটা ঠিক কি বেঠিক বা ইতিহাসের বিকৃতি কি না, বল্লভভাই প্যাটেল সম্পর্কে যে কমেন্ট উৎপল করেছিল তার যথার্থতা বিষয়ে উৎপলই বলতে পারবে। সে বলেছিল, বই ঘেঁটেই সে জেনেছে কংগ্রেস বিট্রেয়াল ছিল। তারা ইংরেজদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে নিগোশিয়েশন করেছিল। আমি সেই বিতর্কে যাচ্ছি না। কিন্তু প্রযোজনায় অত্যন্ত পারদর্শিতা ছিল। সেই নাটকের বিষয় নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক চিঠিপত্র পেয়েছি, পেয়েছি অভিনন্দনও, কল্লোলের পলিটিক্যাল বিতর্কের চেয়েও অনেক বেশি বিতর্ক হয়েছিল 'তীর' নাটকের সময়। যাই হোক কল্লোল নাটক করার জন্য উৎপল অ্যারেস্ট হয়ে গেল।

উৎপল একটা রোল করত, কংগ্রেস সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টের মনে হয়েছিল, উৎপলকে অ্যারেস্ট করলে নাটকটা বন্ধ হয়ে যাবে। উৎপল এল.টি.জি-র ফাদার ফিগার, মোস্ট ইমপরটেন্ট ড্রাইভিং ইনস্‌পায়ারিং ফোর্স, কল্লোল নাটকের পরিচালক, নাটকের কম্পোজিশন, কোরিওগ্রাফি, মিউজিক, লাইট, সেট সব ভাবনা তো তার মাথায়, ফলে কংগ্রেস সরকারের এটা ভাবা স্বাভাবিক। তাই উৎপল অ্যারেস্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দলে আলোচনায় বসলাম। উৎপলও জেল থেকে কিছু খবর পাঠাল, আমরা তখন নাটক চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। দলের একজন সদস্য জিতেন ভট্টাচার্যকে দিয়ে উৎপলের রোলটা করানো হল। রাতের পর রাত উৎপলের অভিনয় দেখেছে, তাই চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কল্লোল বন্ধ হল না। অ্যান্টি কংগ্রেস প্রোপাগান্ডা হচ্ছে বলে ওরা যে কাজটা করল তার ফলে বহু মানুষ আমাদের পক্ষে চলে এলেন। ইয়ংগার জেনারেশান, আর্টিস্ট, রাইটার — সকলে নাটকটা দেখতে আসতে লাগল। জনপ্রিয়তায় একটুও ভাঁটা পড়ল না। এ রকম সময়ে আর একটা কাণ্ড ঘটল। আনন্দবাজার পত্রিকা একটা খবর পাঠাল। তারা বিজ্ঞাপন ছাপবে না। দলের হয়ে বিজ্ঞাপন করার কাজটা আমিই করতাম। তখন আমি আনন্দবাজারে ফোন করে বললাম, বিজ্ঞাপন ছাপেননি কেন? তারা জানাল, কমিউনিজমের প্রচার করলে আমরা বিজ্ঞাপন ছাপব না। আমি বললাম, আপনাদের সঙ্গে কি এ রকম কোনও এগ্রিমেন্ট আছে? বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না তিনটে কারণে, এক নম্বর হচ্ছে, পেমেন্ট যদি বাকি থাকে; দু'নম্বর হচ্ছে, যদি বিজ্ঞাপনে অশ্লীল কোনও কথা থাকে; আর তিন নম্বর হল, আপনারা যদি কপি টাইমলি না পান, এই তিনটের কোনটা মাস্ট সেটা আপনি লিখে পাঠান। বললেন, না লিখে পাঠানো যাবে না, আপনারা অশোকবাবুর সঙ্গে কথা বলুন। আমি বললাম, অশোকবাবু আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। তাকে মিনার্ভা থিয়েটারে আসতে বলছি না কিন্তু আপনাদের কারও মাধ্যমে তিনিও কারণটা জানাতে পারেন। ওরা আর কিছু জানাল না, বিজ্ঞাপনও ছাপল না। তারপর যুগান্তর, বসুমতী, স্টেটসম্যানে বিজ্ঞাপন বের হল। দু'দিন বাদে ওরাও বিজ্ঞাপন ছাপা বন্ধ করে দিল। স্টেটসম্যান কিন্তু বিজ্ঞাপন বন্ধ করল না। স্টেটসম্যান বলল, আমরা নাটকটার ক্রিটিসাইজ করেছি কিন্তু বিজ্ঞাপন বন্ধ করব কেন? স্টেটসম্যানের এস.বি. চ্যাটার্জি একটা রিভিউ লিখেছিলেন, 'মিউটিনি অন বিডন স্ট্রিট' অথবা 'ইন বিডন স্ট্রিট' হেডিং দিয়ে, আমরা আবার প্রিপজিশনের ভুল নিয়ে বিজ্ঞাপন দিলাম পার্সোনাল কলামে, সেটাও ছাপল কিন্তু অন্য কাগজগুলি বিজ্ঞাপন নেওয়া বন্ধ করল, আমি তখন নির্মল কুমার ঘোষের (এন. কে.জি) মাধ্যমে তরুণকান্তি ঘোষের সংগে দেখা করলাম; গেলাম বসুমতীর বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়েরও কাছে, বিবেকানন্দবাবু আমাদের খুব সাপোর্ট করতেন, কিন্তু দু'জনেই বললেন, তারা নিরুপায়। কারণ প্রফুল্ল সেন চিফ মিনিস্টরের কাছ থেকে ব্যক্তিগত অনুরোধ



এসেছে, রাইটার্স থেকে, কংগ্রেস পার্টি থেকে অনুরোধ এসেছে। তার ওপর আনন্দবাজারও প্রভাব খাটিয়েছিল, সব কাগজ বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিল।

নতুন একটা সংকটে পড়লাম আমরা। একই সঙ্গে সমস্ত সংকট এসে পড়ায় আমরাও নতুনভাবে ভাবতে শুরু করলাম। বিজ্ঞাপন ছাড়া নাটক চলবে কী করে? একটা পোস্টার লিখলাম, 'আনন্দ-সংবাদ' – খুব বড় করে। আর লিখলাম 'কল্লোল চলছে চলবে।' অ্যাক্সিডেন্ট, বন্যা, ভাল-খারাপ ইত্যাদি আনন্দবাজারের সব ছবির নীচে লেখা থাকত 'আনন্দ চিত্র', আনন্দবাজার বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিয়েছে বলেই আমরা ওই ক্যাপশানটা আমাদের কাজে লাগাতে চাইলাম, আমি এইসব ব্যাপারগুলো খুব লক্ষ করতাম। আমরা গোপনে প্ল্যান করলাম যে মিনার্ভা থিয়েটারের হাউস ফুলের ব্যানার হেডিং সহ ভিড়ের একটা ছবি দিয়ে একটা পোস্টার করব যার নীচে খালি লেখা থাকবে 'আনন্দ-চিত্র', 'হাউসফুল'। পোস্টার ছাপতেও চলে গেল। কিন্তু পোস্টার রেডি হয়ে যেদিন বেরবে তার আগের দিন খবরটা লিক্ হয়ে গেল। আনন্দবাজারের ক্যাপশান চেনজ্ হয়ে গেল। আনন্দ চিত্র হয়ে গেল 'নিজস্ব চিত্র'।

আগেই বলেছি, উৎপল অ্যারেস্ট হবার পর বহু মানুষ আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন; তখন যে মুভমেন্টটা হয়েছিল তাতে মন্মথ রায়, মধু বসু, সত্যজিৎ রায়, মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়, ফাদার ফার্লো – এরকম অনেকেই ছিলেন। 'কল্লোল চলছে চলবে' পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছিল কলকাতা, পরে 'চলছে চলবে' কথাটা সব রাজনৈতিক দলের স্লোগান হয়ে ওঠে। কল্লোল আরও তিনগুণ পপুলার হয়ে গেল। আনন্দবাজার ও অন্য কাগজে সম্ভবত একবছর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত না হয়েও কল্লোলের জনপ্রিয়তা কমেনি।

উৎপলের সঙ্গে জোছনও গ্রেপ্তার হয়েছিল। তখন অনেকেই জেলে ছিলেন, জ্যোতি বসুও ছিলেন। উৎপল জোছনের ফ্যামিলিকে তখন টাকা পাঠাতাম আমরা। আমরাও দল থেকে কখনও কখনও টাকা পেতাম। কল্লোলের সময় নিয়মিত পেতাম। উৎপল-জোছন কে জেলে খাবারদাবারও পাঠানো হত। তখন পুরো দলটাকে জেল আর মিনার্ভা করতে হত। দু'দিক সামলে কল্লোল চালিয়ে গিয়েছিলাম আমরা। অবশেষে উৎপল ও জোছন রিলিজ পেল।

ওরা ছাড়া পাবার পর প্ল্যান হল মনুমেন্টের কাছে ময়দানে কল্লোল বিজয় উৎসব করব। আমার অবশ্য সামান্য আপত্তি ছিল। তবুও উৎসবে সামিল ছিলাম। তখন সকলের মধ্যেই ভীষণ উদ্দীপনা। সারারাত জেগে ময়দানে আমরা জাহাজের সেট তৈরি করেছি, সেই উৎসবে জ্যোতি বসু, ই.এম.এস. নাম্বুদ্রিপাদ সহ কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় সমস্ত নেতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নানা জায়গা থেকে নাটকের দলের মানুষেরা মিছিল করে আসতে লাগল; তারা আনন্দবাজার অফিসের সামনে ঢাক ঢোল বাজিয়ে আসতে লাগল। কারণ এ জয় তো কেবল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নয়, আনন্দবাজারের বিরুদ্ধেও, সাধারণ মানুষের কি সাঙঘাতিক পার্টিসিপেশন; এবং রাইটলি রংলি এটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত পলিটিক্যাল চেহারা নিল। এই পলিটিক্যাল চেহারা দেবার ব্যাপারেই আমার আপত্তিটা ছিল, বিজয় উৎসবের ব্যাপারে নয়। যাই হোক, ষোলো আনা নেতাদের উপস্থিতিতে খুব ইনস্‌পায়ারিং বিজয় উৎসব হল। এই সময়ের পরে আস্তে আস্তে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটতে লাগল।

এই সময় আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। কৃষ্ণনগরের ফুড মুভমেন্টের ওপর পুলিশ গুলি চালায় এবং অনেক লোক মারা যান। এর বিরুদ্ধে সেই একটা অন্যতম ঘটনা ঘটেছিল। শিল্পীদের একটা মৌন মিছিল ওয়েলিংটন থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত গিয়েছিল। অন্যতম ঘটনা বলছি এই কারণে যে সেই মিছিলে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, উৎপল দত্ত, রুমা গুহঠাকুরতা, দিলীপ রায়, জোছন দস্তিদার ইত্যাদি মঞ্চ ও চলচ্চিত্র জগতের মানুষেরা যেমন ছিলেন তেমনই ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, অভিনেতৃ সংঘও যোগ দিয়েছিল সেই মিছিলে। সেই মৌন মিছিল মানুষের মনে ভীষণ সাড়া ফেলেছিল। পরের দিন আনন্দবাজার দারুণভাবে কভার করেছিল। আনন্দবাজার বামপন্থী বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও অসম্ভব ভাল কভারেজ করেছিল। মানুষের মনে সাড়া জাগিয়েছিল, আমি নিউজ ডিপার্টমেন্টের অমিতাভ চৌধুরিকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ক্যাপসানটা কে করেছেন? উনি জানালেন, সন্তোষকুমার ঘোষ। এই সমস্ত ব্যাপারটার সঙ্গে কমবেশি যুক্ত ছিলাম।

কাছাকাছি সময়ে আবার একটা নির্বাচন এল। এর আগের নির্বাচনে বামপন্থীরা এক হতে না পারায় কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছে। তার আগে, স্বাধীনতার পর প্রথম নির্বাচনে আমি আমার পুরনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দলের হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন শরৎ বসু, তার হয়ে খুব খেটেছিলাম। বাড়ি বাড়ি প্রচার করেছিলাম। সেই নির্বাচনে শরৎ বসু জয়ী হয়েছিলেন। সেই প্রথম নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব প্রকাশ্যে এবং প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল। মাঝের নির্বাচনে বামপন্থীদের দ্বিধাবিভক্তি কংগ্রেসকে সুযোগ করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গে আবার নির্বাচন এল। বামপন্থীরা দ্বিধাবিভক্ত। একপক্ষ হল, ইউ.এল.এফ অর্থাৎ ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট অন্যটা

পি.এল.এফ মানে পিপলস লেফট ফ্রন্ট। একদিকে অজয় মুখার্জি এবং সি.পি.আই ও অন্যান্য দল অন্যদিকে জ্যোতি বসু সহ এখনকার সি.পি.আই-এমের সকলে। রোজই কাগজে বের হয়, দু'পক্ষ ইউনাইটেড হয়ে গেল আবার পরদিন বের হয় ইউনাইটেড হল না, একদিন খবর পেলাম বৌবাজারে ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে সব লিডারদের মিটিং হবে। সেই মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হবে বামদলগুলি ইউনাইটেডলি লড়বে না কি আলাদা আলাদা লড়বে। এটা শুনে আমি প্রথমেই সত্যজিৎ রায়কে ফোন করলাম যে দেখুন আমরা এতসব করলাম অথচ বামদলগুলি আবার ভাগ হয়ে লড়বে। এটার বিরুদ্ধে আমাদেরও কিছু করা উচিত। আপনার মত ও সম্মতি আছে কি? আমি তো প্রত্যক্ষভাবেই আবেদন রাখতে চাই, প্রয়োজনে আপনার কথা বলতে পারি কি? উনি বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলতে পারেন। এ তো যা তা হচ্ছে, একটা প্রচেষ্টা হওয়া উচিত। আমি তার মত নেবার পর মৃণাল সেনকে ফোন করলাম। সব জানালাম ওকে। তারপর বললাম, তুই যাবি আমার সঙ্গে? তুই কোথায় থাকবি? বলল, টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে। ওর এডিটিং ছিল, আমি ট্যাক্সি নিয়ে গেলাম। কিন্তু মৃণাল বলল, আমি তো যেতে পারছি না। বললাম, সে কি রে! তুই যেতে পারছিস না! আমি আর তুই একসঙ্গে যাব ঠিক করলাম। বলল, না, আমায় এখানে থাকতে হবে। তুই একা যা, পরে সব শুনব, তখন আমি বললাম আমাকে পনেরো-কুড়িটা টাকা দে, আমার তো আর ট্যাক্সি ভাড়া নেই। মহা মুশকিলে পড়ব, আমিই শেষ পর্যন্ত বৌবাজারে গেলাম। সেখানে টপ লিডারস আর অল পার্টিস রয়েছেন। অজয় মুখার্জি, জ্যোতি বসু, হেমন্ত বসু আরও অনেকে। ভিতরে মিটিং হচ্ছে। ঘরের বাইরে একজনকে বললাম, আমার একটু বক্তব্য আছে, মিটিংয়ে বলব। ভদ্রলোক ঘুরে এস বললেন, আচ্ছা বসুন, পরে ডাকা হবে। বাইরে বসলাম। সেখানে বড় বড় কাগজের রিপোর্টাররা সব বসে, কিছুক্ষণ পরে ডাক এল, ভিতরে গেলাম। সব লিডারদের উদ্দেশ্য করে বললাম, আমি এসেছি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে, একজন শিল্পী হিসেবে, একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে এসেছি। আমরা যারা আপনাদের সমর্থন করি, যাদের জন্য মৌন মিছিল করি তাদের কাছে আমাদের কথা বলার জন্য এসেছি। সাধারণ মানুষ, ট্রামে বাসে কেবল আপনাদের আলোচনা আপনাদের ধিক্কার দিচ্ছে তারা, রোজ কাগজে বের হচ্ছে, আলোচনা হচ্ছে ভেঙে যাচ্ছে। আমি দাবি জানাতে এসেছি। জ্যোতি বাবু বলে উঠলেন, আপনার বক্তব্য কি? আমাদের অনেক কাজ আছে। আপনি তাড়াতাড়ি বলুন। আমি বললাম, এটাই সবচেয়ে বড় কাজ। আপনারা অনেক আলোচনা করেছো, আরও করবেন, কিন্তু আপনারা যদি মিলিত না হন, তা হলে কংগ্রেস আবার আসবে। আবার সেই দুর্দশা হবে, আমরা আপনাদের জন্য সব করব। আপনারা মিলিত হন এটাই এখন বড় কাজ। এর থেকে বড় কাজ আর কিছু হতে পারে না। এই রকম আরও কিছু কথা বলে আমি বেরিয়ে চলে আসি। পরে আমি শমীকের (বন্দ্যোপাধ্যায়) কাছ থেকে শুনেছিলাম, জ্যোতিবাবু শমীকের মাকে বলেছিলেন, তাপস সেন যা বলেছে, হি ওয়াজ ওয়েল উইথ হিন হিজ রাইটস অ্যাবসলিউটলি। কোনও অন্যায় কথা বলেনি, ভুল বলেনি, আমাদের শুনতে হবে। জনসাধারণের হয়ে উনি খুব রাইট কথা বলেছেন। শমীক তখন জ্যোতিবাবু যে বাড়িতে থাকতেন তার নীচতলায় থাকত। একদিন শমীকের বাড়িতে গেছি, শমীকের মা, মাসিমা বলতাম ওনাকে, আমাকে তিনি খুব আশীর্বাদ করলেন; বললেন, তোমার খুব সাহস আছে, খুব ভাল কাজ করেছ বাবা, সেদিন চলে আসবার সময় খবরের কাগজের সাংবাদিকরা আমাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি কি কোনও স্টেটমেন্ট করবেন? আমি বললাম, না। আপনার কিছু কাজ ছিল? তখন না বললাম। একমাত্র বসুমতীতে লিখেছিল, আমি কাউকে কিছু বলিনি। এই কিছু না বলাটাই আমার ভুল হয়েছিল। ওইরকম সব টপ লিডারদের সামনে কথা বলে একটু একসাইটেড ছিলাম। তার খেসারত দিতে হয়েছিল আমাকে।

দল আমাকে সেনসার করল। তাদের মতে আমি নাকি সি.পি.আইয়ের দালাল হয়ে গেছি। তাই এল.টি.জি-র প্রেসিডেন্ট থাকতে পারব না। আমি বললাম, কারও হয়ে দালালি করতে যাইনি। আমি মনে করি, এটা আমার সামাজিক দায়, সেই বোধ থেকে গেছি, নিজের বিবেকের জন্য গেছি। আমি মনে করি, বামপন্থীদের একত্রিত হওয়া উচিত তাই গেছি। এর সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। শেষ পর্যন্ত আমার যুক্তিটা সকলে মেনে নিয়েছিল। (ক্রমশ)

অনুলিখন : আশিস গোস্বামী

# এখানে আশ্বিন

## সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

পাটপচা খাল কচুরিপানার বিল
বাসের ধুলোয় রাঙা আকন্দ বেড়া
যাযাবর এসে মাঠে বেঁধে গেছে ভেড়া
পাঁচু ঠাকুরের থানে বাঁধা আছে ঢিল

বাতাসে অঘ্র দুলছে রূপালি কাশ —
এখানেই এসে দাঁড়িয়েছে আশ্বিন
নীলাকাশে রয়ে গেছে শাশ্বত ঋণ
ভিনদেশি এক শরতের অভিলাষ।

অথচ এখানে খেতে রক্তের গন্ধ
তামার শরীর করোটি টাঙিতে ফাঁক
মাটি চেয়েছিল জীবন অবসানে পাক
শস্যপাণিরা আজ কি সবাই অন্ধ?

তবু তো বাতাসে দুলছে রূপালি কাশ
মৃত্যুর বীথি জুড়ে দাঁড়িয়েছে আশ্বিন
নীলাকাশে আছে ভ্রমণপিপাসু ঋণ
শাশ্বত এক শরতের অভিলাষ।

# বন্যা

## সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

লিখিত প্রমাণ ছাড়া যারা আর কিছুকেই সম্মান করেন না
তারা প্লেটো বা ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিশ্বাস করবেন না!
প্লেটো নিজে কিছু লিখে রেখে যাননি, তাঁর শিষ্যরা
শুনে নিয়ে লিখেছিল পরে
মুখে মুখে রামকৃষ্ণ যা বলেছিলেন শ্রীম তাকে বসালেন অক্ষরে
হোক না সামান্য হেরফের, তাতে অসামান্যর কতটুকু ক্ষতি?
আমি গাছকে, পাখিকে, আকাশ, নারীকে যে রকম দেখেছি
তার কোনও নিয়মিত রীতি
ছিল না, এখন তা যদি বোঝাতে চাই লিখে, যদি বলি গর্বে
আমি একবার মোহরদির মাথায় রবীন্দ্রনাথকে হাত রাখতে দেখেছিলাম
— কে বিশ্বাস করবে!
বিশ্বাসটাই আসল, ভুল হোক, হোক আরোপিত, তবু প্রমাণে লিখিত
কোনও হাহাকার, কোনও আনন্দ অক্ষরে হয় না স্থাপিত।
আমি মানুষকে বিশ্বাস করি, তার কোনও কথা অবিশ্বাস করি না,
ধরুন অক্ষরহীন জয়হরি মন্ডল কিংবা আকবর মোল্লা আর তার বিবি আমিনা
এসে বলল তাদের ঘরবাড়ি ভেসে গেছে, আমি কি তাদের সেটা
লিখে দিতে বলব! চোখের সামনেই যে বন্যাটা
মৃত্যু অভ্যাস করছে, সে নিজেই তো তার জলজ্যান্ত প্রমাণ।
প্লেটো, রামকৃষ্ণ আজও এসে বুকে বসে জাগাল এই কবিতার শিরোনাম।

# আমাদের হাওয়া বদল

## বাসুদেব দেব

নিস্পন্দ একটা মেসিন ঘিরে একটি দুটি কাঠবেড়ালি
নিঃশব্দে বেড়ে উঠছে ফার্ন আইভি ছায়ালতা
কিছু দূরে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা সাদা ঘোড়া
বড় একটা পাথরের বুক ভেঙে বয়ে চলেছে হিমেল এক জলধারা
হাওয়ায় উড়ো পাতা পাখির ডাক শীতের আরাম আর স্মৃতি
চুল এলিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে আমাদের ছুটি
এ রকমই ছিল গাঢ়মন্ত্রের মতো সেই শহরতলি
এ রকমই ছিল ভ্রমণসূচির বাইরে আমাদের ছুটির বিকেল
বস্তু আর ভাবনা, সময় ও উদাসীনতা, নামিয়ে রাখা টুপি
আলোর কাঁপন আর নিবিড় গাছগাছালির মধ্যে মিশে থাকা
সেই নারী সেই জলধারা সেই অস্ফুট গানের রেশ....

তারপর কী যে হল, খুব দ্রুত বাতাসে ভর করল বারুদের শয়তান
শকুনের মতো উড়ে এল খবরের কাগজ, হত্যা আর ধর্ষণ, এল ক্যামেরা
এল উল্কট একটা সেলোফোন, ছুরির মতো ঝিলিক মেরে উঠল
প্লাস্টিকের ক্রেডিট কার্ড, ট্যুরিস্টের অস্থিরতা
কোন দূর নিয়ন্ত্রণে হঠাৎই কেঁপে উঠল নিস্পন্দ মেসিন, গর্জন করে উঠল
গুন্ডার মতো, ভয় পেয়ে আচমকা
দুর্বোধ্য একটা শব্দ করে আকাশের দিকে মুখ তুলে তীরের মতো
ছুটে গেল ঘোড়াটা
ঝড়ের বেগে সেই অলস নারী মুহূর্তে হল তার সওয়ার
তাকে আর কোনওদিন পাব না আমরা...

গল্প নয়, এমনি করে বদলে গেল আমাদের জীবন
আমাদের ভালবাসা
আমাদের ছুটির দিন

# কুরুক্ষেত্র

## একরাম আলি

ধানখেত টানা, স্পষ্ট, পড়ে আছে কুয়াশা জড়িয়ে
অতিরিক্ত লম্বা এক কঙ্কির মাথায়
টেকো চাঁদ, নারীবাদী, স্পষ্ট ততোধিক

কাল যারা সারা দিন খেতে-খেতে ধান খুঁটে খাবে
সেইসব মুরগিরা এখন ঝিমোয়
অবিশ্বাসে গাঢ় ঘুমে নেতিয়ে পড়ে না

যারা কাজ করে, যারা পাহাড় পেরিয়ে
মেয়েমদ্দ ধান কাটতে এখানে এসেছে
সমুদয় ধান কেটে ঝাড়াইয়ের শেষে
পিরামিড গাঁথা হলে ফিরে যাবে যারা
এখন আপসহীন তারা সব মৃত

মরা খিদে, মরা স্বপ্ন, মরা পাহাড়ের ঠিক নীচে
উদ্ধত ভঙ্গিতে তারা লম্বা হয়ে আছে

তবু কেউ কাশল যেন — বেঁচে আছে নাকি!
গত শতাব্দীর শ্লেষ্মা তাকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে

এক উঠোন সারি-সারি শব
উঠোন যেখানে শেষ, আজকের কুরুক্ষেত্র সেইখানে শুরু
টানা — স্পষ্ট — পড়ে আছে কুয়াশা জড়িয়ে

# অবক্ষয়

## আরতি মুখোপাধ্যায়

অবক্ষয়ের ঢাল
আপন নিয়মে চলে
অস্তমিত সময়ের দিকে

সময় বাধে না তাকে
জানে তার নিশ্চিত বন্ধন
সংকটের সাথে।

রাত্রি গভীরতর
অভিমানী পৃথিবী
জানে না তার অনাগত দিন —

ডিস্কোথেকে উন্মাদ যুবক-যুবতী
পেয়ালায় ভিজিয়ে নিচ্ছে ঠোঁট
ডুবিয়ে দিচ্ছে সোনালি দিন।

অন্ধকার নিবিড়তর ঃ
একা বাঁধ — জেগে আছে
সর্বগ্রাসী বন্যার প্রতীক্ষায়।

# মহাজীবন

## তৃষ্ণা বসাক

এই সাদা পাতাটা
একটা রাস্তার মতো
আমি যেকোনও দিকে যেতে পারি
মাঝে মাঝে গুলিয়ে যায়
পা চলছে না রাস্তা
টায়ার, গরুর গাড়ির চাকা
হলুদ বনে নাকছাবি
হাতের মুঠোয় ঘুমিয়ে থাকা রুমাল
চোরকাঁটা—

সব ফেলতে ফেলতে
একদিন
রংডিং নদীর বুকে
বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল
ছুঁইয়ে ফেললাম;
অমনি খুলে গেল
পাতালের দরজা!

মাঝে মাঝে গুলিয়ে যায়
পা চলছে না রাস্তা
এমনকী মেঘের ডাকবাক্সে
একটা সোনালি চিঠি ফেলে আসার সময়ও
বুঝতে পারি না —
এই ডানা
শিরস্ত্রাণ
পাহাড়ে চড়ার দড়ি
হ্যাভারস্যাক
এগুলো ঠিক কার!

# বিদায়

## জয়নাল আবেদীন

যে-রাত্রির গায়ে শিশুর ঘুমের নিঃশ্বাস লাগে
সে রাত্রি নিশ্চয় সুন্দরতম
যে-ভোরে সবুজচূড়া থেকে আকাশে ঝাঁপ দেয় পাখি
সে ভোর নিশ্চয় পবিত্রতর
যে-মেয়ে বুকের রক্তের ক্লান্ত নির্গলিতা চুরি করে
সে কি স্বয়ম্বরা?
যদি না হয়
তবে আমাদের বিদায় যতই বেদনার হোক
তা নিশ্চয়
হেঁকে যাওয়া বেলফুল, জুঁইফুল, সুগন্ধ বাতাস।

# গীতাঞ্জলি আকাশ

## সুদীপ চক্রবর্তী

জানালা খুলে দেখি গোধূলি প্রতিমার ভাঙাচোরা মুখ
হাওয়ার দাপটে খোলা দরজায় দেখি রোগা নদীটির বুক।

কী আশ্চর্য আজকের আকাশ যেন অন্য রকম লালে লাল
অন্ধ পাথরের কপাল ভেঙে কারা খোঁজে অনন্ত সকাল

যে যাচ্ছে যাক আমি বেশ দিব্যি আছি রোদে ছায়ায় স্থির
দুপুরে একথালা রোদ খাই, রাতে খাই কয়েক মুঠো তিমির

কী আরামে বেঁচে আছি! রক্তে কথা বলে আরব্য সন্ন্যাসী
আগুন দেখেও ঠাণ্ডা মেজাজে বাজাই শ্যামসুধা বাঁশি

রক্তজাত পৃষ্ঠা উল্টে আমাকে দেখুন, আমি মধ্যপন্থী
বিকেলে ফুরফুরে দক্ষিণী হাওয়ায় খুঁজে বেড়াই শান্তি

ইসানীং পাল্টে গেছে জীবনযাত্রা, পাল্টে গেছে দৈনিক পদাবলি
নিজের রক্তে স্নান সেরে সময়ের রক্তে খেলা করছি হোলি।

আগুন ঢুকেছে চুপিসারে ঘরে, কী সাঙ্ঘাতিক আগুনের মহড়া
চোখের সামনে পুড়ছে বই, আসবাব, পুড়ে যাচ্ছে হৃদয় আজ সাহারা।

আগুনের সঙ্গে গলা জড়িয়ে আমার প্রেম? আগুনের সঙ্গে সহবাস?
রাজি আছি, বিনিময়ে দিতে হবে স্বপ্নের গীতাঞ্জলি আকাশ।

**ধারাবাহিক সন্দর্ভ**

# বঙ্গসংহার এবং

## সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

*[পূর্ব প্রকাশিতের পর]*

এখানেই অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রশ্নে ইতিহাসের কাছে কিরণশঙ্কর রায়ের জবাবদিহির দায়ভাগ থেকে গিয়েছে। বঙ্গ রাজনীতির আসরে তিনি নেতৃত্বের যে স্থানে ছিলেন, তাতে তিনি মন্ত্রিত্ব চাইলে আগেই পেতে পারতেন। কিন্তু যেহেতু দেশবিভাগের ব্যাপারে তাঁর এক প্রচণ্ড মানসিক বিরোধিতা ছিল, সেহেতু তিনি গান্ধীজির নির্দেশ মেনে পাকিস্তানে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কেবল তাই নয়, পাকিস্তানের কংগ্রেস নেতা হিসাবে কিরণবাবু বিভিন্ন প্রশ্নে দিল্লির কংগ্রেস হাইকমান্ডের সঙ্গে রীতিমতো সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন কয়েকবার। এমনকী পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার মাত্র পনেরো দিন আগে কিরণবাবু ঢাকায় বসেই দিল্লির কংগ্রেস হাইকমান্ডের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন পাকিস্তানে কংগ্রেস সংগঠনের অস্তিত্ব বিলোপের প্রশ্নে। এর বিরোধিতা করতে তিনি দিল্লি গেলেন এ-আই-সি সি'র বৈঠকে। এই প্রশ্নে পাকিস্তানে থেকে যাওয়া কংগ্রেসের সকল নেতা ও কর্মীরা কিরণশঙ্কর রায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক দু'সপ্তাহের মাথায় তিনি সকলকে হতচকিত করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর এই চলে আসার সিদ্ধান্ত হতাশায় নিমজ্জিত করল পূর্ববঙ্গের কংগ্রেস নেতাদের; অসহায় বোধ করল অগণিত কংগ্রেস কর্মীরা। আর কিরণশঙ্কর রায় ফেলে গেলেন ঢাকা জেলার তেওতা গ্রামের প্রাসাদোপম 'রাজবাড়ি' এবং মানিকগঞ্জ মহকুমার বিস্তীর্ণ জমিদারি। পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পর কলকাতার বাড়িতে বসে তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন, I don't think I have done the right thing. পর মুহূর্তে এই বাক্যটির উপর দাগ টেনে দিয়ে নীচে লিখলেন I was sworn in today. ভবিতব্য বোধ হয় কিরণশঙ্কর রায়ের আগের বাক্যটিকে গ্রহণ করেছিলেন।

### ঢাকায় ভাষা আন্দোলনের সূচনা

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীসভার রাজনৈতিক অস্তিত্ব যখন অন্তর্কলহের আবর্তে টালমাটাল, সেই সময় অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে কংগ্রেস সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিষদে একটি বেসরকারি প্রস্তাব পেশ করে বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবি তোলেন। (কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক আইনসভায় কংগ্রেস পরিষদীয় দলের চিফ হুইপ ছিলেন)। ওই ফেব্রুয়ারি মাস থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত ঢাকা শহরে এবং বিক্ষিপ্তভাবে প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাভাষার মর্যাদার দাবিতে সভা সমাবেশ ও আন্দোলন সংগঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওই আন্দোলনের ঝটিকাকেন্দ্রে পরিণত হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩/১৪ মার্চ (১৯৪৮) পর্যন্ত ঢাকা শহরে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রমিছিলের উপর পুলিশের লাঠি চার্জ ও টিয়ার গ্যাস প্রয়োগের ঘটনা ঘটে। বাংলার জনপ্রিয় বর্ষীয়ান নেতা ফজলুল হক এবং তরুণ নেতা শেখ মুজিবর রহমান ছাত্রদের এই আন্দোলনের সামিল হন। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের স্রষ্টা এবং প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান মহম্মদ আলি জিন্না'র সপ্তাহব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান সফরের সূচি স্থির হল। ছাত্র আন্দোলনের তরফ থেকে ঘোষণা করা হল, বাংলাভাষার মর্যাদার দাবিতে ছাত্ররা জিন্নাসাহেবের সফরের সময় বিক্ষোভ দেখাবেন। উপায়ান্তর না দেখে প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ছাত্রদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন। আটক ছাত্রদের প্রাদেশিক সরকার মুক্তি দিলে ছাত্ররা জিন্নাসাহেবের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি বাতিল করতে রাজি হল। এ ছাড়া বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকার নাগরিকদের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্মারকলিপি জিন্নাসাহেবের হাতে দেওয়ার সরকারি বন্দোবস্ত করার আশ্বাস দিলেন নাজিমুদ্দিনসাহেব। অবশেষে ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ মহম্মদ আলি জিন্না ঢাকা শহরে পৌঁছলেন।

জিন্না সাহেবের ঢাকা সফর রিপোর্ট করার জন্য কলকাতার 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র রিপোর্টার গোবিন্দ সেন এবং 'যুগান্তর' পত্রিকার রিপোর্টার অনিল ভট্টাচার্য ঢাকা গেলেন। অনিলবাবু তাঁর স্মৃতিরোমন্থন করতে গিয়ে বলেছেন, ২১ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে জিন্নাসাহেবের জনসভায় লোকে লোকারণ্য।

জিন্নাসাহেব এত বেশি সিগারেট খেতেন যে জনসভায় বক্তৃতা দিতে দিতেও তিনি এর ব্যতিক্রম ঘটাতেন না। প্রায় এক ঘন্টা জিন্না ওই সভায় বক্তৃতা করলেন। পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা ও রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি একটি নতুন সিগারেট ধরালেন। সিগারেটে এক দীর্ঘ টান দিয়ে জিন্না সাহেব বললেন " .... Urdu only Urdu shall be National and State language of Pakistan and none else ... সঙ্গে সঙ্গে রেসকোর্স ময়দানের এক প্রান্ত থেকে মার্জিত ইংরাজিতে প্রতিবাদ-কণ্ঠ ধ্বনিত হল। সেই কণ্ঠ ছিল ফজলুল হক সাহেবের। আরম্ভ হল ময়দানের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদধ্বনি এবং দর্শকদের মধ্যে ধস্তাধস্তি। ময়দানের যে প্রান্তে ফজলুল হক সাহেব ছিলেন, সেখানেই পুলিশ লাঠিচার্জ করল। হকসাহেব আহত হলেন। সভা শেষ করে জিন্নাসাহেব চলে গেলেন।

এদিকে রমনার সভাস্থল থেকে গোবিন্দ সেন ও অনিল ভট্টাচার্য নবাবপুর রোডের হোটেলে ফিরতেই একজন পদস্থ পুলিশ অফিসারের সম্মুখীন হলেন। ওই অফিসার জানতে চাইলেন, কলকাতা থেকে আসা সাংবাদিকদের মধ্যে গোবিন্দবাবু কে আছেন? প্রিমিয়ার খাজাসাহেব তাঁকে এক্ষুনি নিয়ে যেতে বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের গাড়ি তাঁদের দু'জনকে নিয়ে এল নবাববাড়িতে। (এখানে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র গোবিন্দ সেন সম্পর্কে একটু বলা দরকার। তৎকালীন এই উপমহাদেশের সংবাদপত্র জগতে গোবিন্দবাবু খুবই বিখ্যাত ছিলেন খুব দ্রুত এবং নির্ভুল শর্টহ্যান্ড দক্ষতার জন্য। তাঁকে সেই সময় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের সকল বড় নেতারা চিনতেন।) গোবিন্দবাবু নাজিমুদ্দিন সাহেবের বাসভবনে গিয়ে দেখলেন নাজিমুদ্দিনের পাশে ফরাসের উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে রয়েছেন 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক আলতাফ হোসেন। গোবিন্দ সেনকে নাজিমুদ্দিন সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে ইংরাজিতে ও ঢাকাই বাংলায় যা বললেন তা হল — কায়েদ-ই-আজম জিন্নার জনসভার ভাষণের পূর্ণ বয়ান গোবিন্দবাবু শর্টহ্যান্ডে নিতে পেরেছেন কি না। গোবিন্দবাবু সম্মতিসূচক জবাব দিতেই নাজিমুদ্দিন উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। আলতাফ হোসেন এতক্ষণ চুপ করেছিলেন। তিনি উঠে এসে গোবিন্দবাবুর পিঠ চাপড়ে তারিফ করলেন। কারণ কোনও পাকিস্তানি সাংবাদিক ওই কাজটি করতে পারেননি। মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেবের সেক্রেটারি মি. বাকার (বাকার সাহেব বেঙ্গল ক্যাডারের আই সি এস ছিলেন) দু'জন পাকা টাইপিস্ট এনে গোবিন্দবাবুকে দিলেন। ওই ফরাসের উপর বসেই গোবিন্দবাবু টাইপিস্টদের ডিকটেশন দিলেন। পরের দিন লাহোর ও করাচির খবরের কাগজগুলিতে জিন্না সাহেবের বক্তৃতার যে পূর্ণ বয়ান প্রকাশিত হয়েছিল, তা গোবিন্দবাবুর দক্ষতার জন্যই সম্ভব হয়েছিল। গোবিন্দবাবু ডিকটেশন শেষ করে নাজিমুদ্দিনসাহেবের দিকে তাকিয়েছিলেন কিছু একটা বলবার জন্য। নাজিমুদ্দিনসাহেব সঙ্গে সঙ্গে তা বুঝতে পেরে তাঁর সেক্রেটারি মি. বাকারকে বললেন, give Gobinda Babu an uninterrupted telephone line to Calcutta. (পরের দিন কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকাতে জিন্নাসাহেবের ঢাকার জনসভার বক্তৃতার পূর্ণ বয়ান ছাপা হয়েছিল)।

২২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে মহম্মদ আলি জিন্না বাংলাভাষা নিয়ে বেশি 'বাড়াবাড়ি' না করতে ভাষা আন্দোলনকারীদের হুঁশিয়ার করে দেন এবং বলেন যে পাকিস্তানের ভিতকে দুর্বল করার জন্য সীমানার ওপার থেকে 'দালাল' ছাড়া হয়েছে ভাষা আন্দোলনকারীদের মদত দেওয়ার জন্য। সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের স্রষ্টা মহম্মদ আলি জিন্না তাঁর জীবনের প্রথম ও শেষ পূর্ব পাকিস্তান সফরে বাঙালি মুসলমানদের ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ করেই রেখে গেলেন। তবে বঙ্গবিভাগের মাত্র ছ'মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানেরা যে ভাষা আন্দোলনের সূচনা করলেন তা পরবর্তী পঁচিশ বছরে কেবল পাকিস্তানের রাজনীতি, সমাজবোধ ও ধর্মবোধকেই নয় এই উপমহাদেশের রাজনীতিকে প্রতিক্ষণে প্রভাবিত করেছে। মাতৃদুগ্ধের মতো মাতৃভাষা যে ধর্মবোধের চেয়ে অনেক বেশি পরাক্রমশালী তা প্রমাণ করেছেন পাকিস্তানের বাঙালি মুসলিম সমাজ। ভাষা আন্দোলনের বিশ্বইতিহাসে এ এক অনন্যসাধারণ নজির।

পাকিস্তানের স্রষ্টা ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন মহম্মদ আলি জিন্না যদি ২১ মার্চের (১৯৪৮) ঢাকার জনসভায় তাঁর দেশের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি মানুষের মুখের ভাষাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতেন তা হলে এই উপমহাদেশের রাজনীতিতে ও ধর্মবোধে এক নতুন প্রবাহ বইতে পারত, যে প্রবাহে তাঁরই দেশের বাংলাভাষী মুসলিম নেতৃত্বের আধিপত্য হয়ে থাকত অবিস্মরণীয়।

**পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ**

পূর্ববঙ্গ (পূর্ব পাকিস্তান) যখন ভাষা আন্দোলন নিয়ে উত্তপ্ত ঠিক সেই সময় ফেব্রুয়ারি (১৯৪৮) মাসের শেষভাগে কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। পার্টি কংগ্রেসের এই অধিবেশনের সিদ্ধান্তগুলি ভারতীয় উপমহাদেশের পরবর্তী এক দশকের রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এই পার্টি কংগ্রেসেই পশ্চিম পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক প্রধান হিসাবে এলাহাবাদের কমিউনিস্ট নেতা সাজ্জাদ জাহিরকে মনোনীত করা



হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের পার্টি সংগঠনের জন্য মনোনীত হলেন মনসুর হবিবুল্লা (বর্ধমানের কমিউনিস্ট নেতা)। সাজ্জাদ জাহিরের পরিবার দুই পুরুষ ধরে নেহরু পরিবারের ঘনিষ্ঠ এবং তিনি একদা কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। তাঁর বড়ভাই আলি জাহির উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস মন্ত্রীসভায় দীর্ঘদিন মন্ত্রী ছিলেন। কলকাতার এই পার্টি কংগ্রেসেই পি সি যোশীকে 'নরমপন্থী' ও 'শোধনবাদী' বলে ভৎর্সনা করে তাঁকে পার্টি সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কট্টরপন্থী বি টি রনদিভে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অনুমোদিত হল উপমহাদেশের জন্য নয়া পার্টি লাইন "সশস্ত্র সংঘর্ষ ও সংগ্রামকে হাতিয়ার করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াই"-এর নীতি।

যুগোশ্লাভিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং বর্মা দেশের কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের (কমিন্টার্ন) সদস্যরা 'সশস্ত্র বিপ্লবের' ডাক দিয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন। পশ্চিমবঙ্গের 'মেহনতি মানুষকে শ্রেণী সংগ্রামের' তত্ত্বে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়ে পার্টি কংগ্রেসে গান গাওয়া হল 'দেখছো কি হে দেখছো কি, বাংলা বানাবো তেলেঙ্গানা বাংলা বানাবো চীনের বাড়া...' পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশনের শেষে পার্টির নেতা ও কর্মীরা শহরের কয়েকটি প্রধান রাস্তায় মশাল শোভাযাত্রা বের করেন। (প্রসিদ্ধ কমিউনিস্ট লেখিকা স্বর্গতা সাবিত্রী রায় তাঁর 'স্বরলিপি' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে এই পার্টি কংগ্রেসের কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যার জন্য তাঁর লেখা বইটি কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৫৩ সালে বাজেয়াপ্ত করে এবং বইটি বাজার থেকে তুলে নিতে লেখিকা এবং তাঁর স্বামী অধ্যাপক শান্তিময় রায়কে বাধ্য করে।)

যাই হোক, এই পার্টি কংগ্রেসের পর থেকে প্রদেশের হাওড়া, হুগলি ও চব্বিশপরগণা জেলার শিল্পাঞ্চলে কলে কারখানায় শ্রমিক অশান্তি বাড়তে থাকে। কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে প্রায় প্রতিদিনই ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র-পুলিশের সংঘর্ষ চলতে থাকে। টিয়ার গ্যাস, লাঠি চার্জ, গুলিবর্ষণ এবং কার্ফুজারির ঘটনা ঘটতে থাকে প্রতিদিনই।

৫ মার্চ (১৯৪৮) কিরণ শঙ্কর রায় প্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর ৭ মার্চ কলকাতার কিছু ব্যবসায়ী শিল্পপতি এবং ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মালিকেরা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে কিরণশঙ্কর রায়কে এক সংবর্ধনা দেন। সংবর্ধনার উত্তরে কিরণবাবু দেশবিভাগের পর নবগঠিত প্রদেশের আইন-শৃংখলাজনিত অশান্ত পরিস্থিতির উল্লেখ করেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির নাম না করে বলেন" কোন কোন মহল বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে।" প্রদেশে শান্তি বজায় না রাখতে পারলে কলকারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ওই বছর দোল উৎসবের তারিখ ছিল ২৫ শে মার্চ। সর্বত্র সাধারণ ছুটি। ওইদিন রাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদেশের সংশোধিত ফৌজদারি আইন মোতাবেক এক অর্ডিন্যান্স জারি করে কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার সকল শাখা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। ২৫ শে মার্চ একমাত্র 'স্টেটসম্যান' ছাড়া কলকাতার অন্য সব খবরের কাগজের অফিস বন্ধ ছিল। কিন্তু ২৬ শে মার্চের 'স্টেটসম্যান' পত্রিকাতে এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটি প্রকাশিত হয়নি। ২৭ মার্চ কলকাতার সব খবরের কাগজে 'কমিউনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা' করার সংবাদটি সবিস্তারে প্রকাশিত হয়।

২৭ মার্চ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'তে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে, ২৫ মার্চ গভীর রাত্রে পুলিশ কলকাতা শহরে এবং প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দফতর শাখা সংগঠন ও ইউনিয়নগুলির অফিস তালাবন্ধ করে দেয়। পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা'র অফিসটিতেও পুলিশ তালা লাগিয়ে প্রহরা দিয়ে রাখে। এ ছাড়া পুলিশ সন্দেহভাজন বহু লোকের বাড়িতে ও অফিসে তল্লাশি চালায়। ২৫ ও ২৬ মার্চ যে সব কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুজাফফর আমেদ, জ্যোতি বসু (এম এল এ), বিশ্বনাথ মুখার্জি, গীতা মুখার্জি, ভবানী সেন, মনিকুন্তলা সেন, গোপাল হালদার, অম্বিকা চক্রবর্তী, সামসুল হুদা ও আবদুর রজ্জাক খান। এ ছাড়া হুগলি ও চব্বিশ পরগনা জেলায় গ্রেফতার হন ২৮ জন নেতা ও কর্মী। হুগলির নেতাদের মধ্যে ছিলেন পাঁচুগোপাল ভাদুড়ি ও মনোরঞ্জন হাজরা। কলকাতা শহরে এবং পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারি করে সরকার সভা, সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করেছেন। ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক ধীরেন মজুমদার গ্রেফতার হওয়ায় ২৭ মার্চ থেকে কলকাতা শহরে পরপর কয়েকদিন ট্রাম চলাচল বন্ধ থাকে।

২৮ মার্চ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী প্রদেশের বিভিন্নস্থান থেকে ওই তারিখ পর্যন্ত ২৪৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কলকাতায় ধৃত কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীদের সংখ্যা ছিল ৫৩। ওই পত্রিকাটি বলেছে যে বহু কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মী আত্মগোপন করেছেন এবং প্রদেশের বাইরে চলে গিয়েছেন।

২৮ মার্চ প্রদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায় কেন কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি ঘোষণা করা হল তা ব্যাখ্যা করে একটি বিবৃতি দেন। কিরণবাবুর বিবৃতিটি হল এই ঃ " এই প্রদেশে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ গত কয়েকমাস যাবৎ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভয়ানক বিঘ্ন সৃষ্টি করে আসছে। সম্প্রতি

কলকাতায় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে এরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, সকল দিক দিয়ে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে। এ জন্য জনসাধারণকে অস্ত্রাদি সরবরাহ করে একটি সশস্ত্র 'গণবাহিনী' গড়ে তোলা হবে। সরকারের সন্দেহ যে, বে-আইনি আগ্নেয়াস্ত্রাদি সংগ্রহ করে 'রেড গার্ডদের' ওই অস্ত্র ব্যবহারে তালিম দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থায় সরকারের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্রুত কাজ আরম্ভ হবে এবং পরিণতিতে জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার নিরাপত্তা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে। এই সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর কমিউনিস্ট পার্টি দেশের কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিদ্বেষ প্রচারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।"

এই বিবৃতিতে কিরণবাবু শ্রীরামপুরে বাসন্তী কটন মিলের হাঙ্গামার উল্লেখ করেন। অসন্তোষ চলছিল। শ্রমিকেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে মিলের সম্পত্তির ক্ষতি ও সে সব ধ্বংস করতে আরম্ভ করলে পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষ এবং পরিণতিতে পুলিশকে গুলিবর্ষণ করতে হয়। ফলে কয়েকজন শ্রমিকের প্রাণহানি ঘটে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে কিরণবাবু ওই ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়ে বলেন, "কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক অসন্তোষকে নিজেদের পার্টির কাজে ব্যবহার করছে। পার্টি চাষীদের উস্কানি দিচ্ছে যে, তাঁরা যেন কলকাতা শহরে অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্য সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করে যায়। সম্প্রতি পার্টি কলকাতায় সেক্রেটারিয়েটে ও কয়েকটি বড় সরকারি অফিসের সামনে লোকজন জড়ো করে সমাবেশ করছে এবং লাউডস্পিকার ব্যবহার করে স্লোগান ও বক্তৃতা দিচ্ছে। ফলে সরকারি অফিসে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে।... এভাবে সংখ্যায় নগণ্য একটি দল ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করবে, এ অবস্থা কখনই সহ্য করা যায় না এবং সহ্য করা হবে না।"

২৫ শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গে যে অর্ডিন্যান্স বলে কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি ঘোষণা করা হয়েছিল সেই অর্ডিন্যান্সটি আইন মোতাবেক (১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে এবং স্বাধীন ভারতের সাংবিধানিক নিয়ম হল এই, অর্ডিন্যান্সকে ঘোষণার তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে বিধানসভায় বিল এনে আইনে পরিণত করতে হবে) ১৯৪৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রাদেশিক আইনসভায় বিল আকারে পেশ করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায়। এই আইনটি উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এই ঘটনার ঠিক তিন বছর পর পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি সে দেশে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে এবং প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খাঁ পশ্চিমবঙ্গের ওই আইনের কাঠামোতেই পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি ঘোষণা করেছিলেন।



পশ্চিমবঙ্গের ওই আইনের নাম হল 'পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা (সংশোধনী) বিল, ১৯৪৮।' (The West Bengal Security [Amendment I Bill] 1948)

এই আইনের কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে সন্নিবেশ করা হল ঃ

*Access to certain places and areas.*

5A.(1) If as respects any place or class of places the Provincial Government considers it necessary or expedient that special precautions should be taken to prevent the entry of unauthorised persons, the Provincial Government may by order declare that place, or, as the case may be, every place of that class to be a protected place; and thereupon, for so long as the order is in force, such place or every place of such class, as the case may be, shall be a protected place for the purposes of this Act.

(2) No person shall, without the permission of the Provincial Government enter, or be on or in, or pass over, or loiter in the vicinity of, any protected place.

(3) Where in pursuance of sub-section (2) any person is granted permission to enter, or to be on or in, or to pass over, a protected place, that person shall, while acting under such permission, comply with such orders for regulating his conduct as may be given by the Provincial Government.

(4) Any police officer, or any other person authorised in this behalf by the Provincial Government may search any person entering, or seeking to enter, or being on or in, or leaving, a protected place, and any vehicle, vessel, animal or article brought in by such person and may, for the purpose of the search, detain such person, vehicle,vessel and article.

Provided that no woman shall be searched in pursuance of this sub-section expect by a woman.

(5) If any person is in a protected place in contravention of this section, then without prejudice to any other proceedings which may be taken against him, he may be removed therefrom by any police officer or by any other person authorised in this behalf by the Provincial Government.

(5) If any person contravenes any order made under this section, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both.'



4. In sub-section (1) of section 15 of the said Act, after the words "communal peace" the words " "or to endanger the safety or stability of the Province" shall be added.

7. For section 17 of the said Act, the following section shall be constituted, namely :

" 17. Save as hereinafter in this section otherwise provided, an order made under sub-section (1) of section 16 shall be in force for such period not exceeding nine months, as may be specified in the order or for the period subsequent to the date of issue of such order during which this Act continues in operation, whichever is less, unless earlier cancelled by the authority making the order :

Provided that —

(a) the Provinicial Government may, if and so often as it thinks fit,

(i) in the case of an order under clause (a) of the said sub-section, place before a Judge of the High Court in Calcutta the grounds on which the order is made, the representations, if any, made under section 18 by the person affected thereby, and such further materials as the Provincial Government may think fit, subject to the following condition, that is to say, the person affected by the order shall not be entitled to be defended or represented by any lawyer or other person before the Judge, and, in accordance with the decision of the Judge thereon, the Provinicial Government shall issue an order for the release of the person or for an extension of the periods of his detention by such period or period as may be determined by the Judge, and

(ii) in any other case, issue, after condisering all the circumstances of the case, a fresh order to the same effect and subject to the same limitations as to duration as in the first instance;

*(Clauses 8-12)*

(b) notwithstanding anything hereinbefore contained, it shall be lawful for the Provinicial Government to release at any time, if it so thinks fit, any person in respect of whom an order under subclause (i) of clause (a) has been made."

8. In section 18 of the said Act, for the words "fifteen days" the words "thirty days" shall be substituted.

9. After section 18 of the said Act, the follwing section shall be inserted, namely :—

"18A. Whoever knowing or having reason to believe that an order directing any person to be detained has been made under clause (a) of sub-section (1) of section 16, harbours or conceals such person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years and shall also be liable to a fine which may extend to one thousand rupees.

Explanation—In this section, the word 'harbour' includes the supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes,ammunition or means of conveyance, or the assisting a person by any means, whether of the same kind as herein before enumerated or not, to evade apprehension."

২৯ শে মার্চ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই ব্যবস্থাকে আগাগোড়া সমর্থন করে সম্পাদকীয়তে লেখে।৩১ মার্চ 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা দু'কলমব্যাপী এক দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি সমর্থন করল না। এই পত্রিকাটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায়ের বিবৃতি এবং কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ সম্পর্কে সরকারি অভিযোগগুলির সত্যতা স্বীকার করেও বলল, এমন কড়া ব্যবস্থা না নিলেই কি চলত না?

আনন্দবাজারে "সময়োচিত ব্যবস্থা" এই শিরোনামে সম্পাদকীয় কলামে যে বক্তব্য প্রকাশিত হয় তাতে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্তকে সর্বতোভাবে সমর্থন করে বলা হল জনসাধারণ বরং প্রশ্ন করবে "ইহা আরও পূর্বে করা হয় নাই কেন?"

বলা হল, ১৯৪৯ সাল থেকে দেশের জাতীয় শক্তি, সংহতি ও শান্তিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করার সমস্ত রকমের কমিউনিস্ট উদ্যোগ জনসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করেছেন। কিন্তু দেরিতে হলেও সরকার কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়ায় জনসাধারণের ইচ্ছাকেই মর্যাদা দিয়েছেন। গবর্নমেন্ট অনীত অভিযোগগুলির পুনরাবৃত্তি করে সম্পাদক বললেন যে, দেশের এই স্বাধীনোত্তর সংকটকালে কমিউনিস্টরা কংগ্রেস ও কংগ্রেস গবর্নমেন্ট-এর বিরুদ্ধে জনসাধারণকে খেপিয়ে তুলছে দেখে বোঝা যায় যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সকীর্ণ লোভেই তারা আচ্ছন্ন। দেশের জন্য কোনও গঠনমূলক কাজই কমিউনিস্টরা করেনি। "যোগ্যতা ও কৃতিত্বের এই শূন্য ইতিহাস লইয়াই কম্যুনিস্ট পার্টি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হইবার জন্য লুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।"

"মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পর, দেশব্যাপী হিংসার প্ররোচনা দিয়া অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টির প্রয়াস এই পার্টি করিয়াছে।" সুতরাং "..... গবর্নমেন্টের পক্ষে প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা বহুপূর্বেই গ্রহণ করা উচিৎ ছিল।"

স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয়টির সারাংশ ছিল এই —

"The two new Dominions of India and Pakistan born amid the agonies of communal slaughter, are still embittered over many questions. One of them is numbed by the shocking political assassination of recent times; acute differences about Kashmir persists; the international situation worsens; secret societies, some armed and hope to exploit these conditions to their own advantage. A tragedy of freedom is that newly freed states so often seem to require almost at their inception denial of freedom to some, so that the general freedom may be preserved. A duty, however, still rests of freedom loving folk to scrutinize each instances of the use of such powers with care, lest necessary executive action belate or degenerate into totalitarianism or repression becomes a habit.

The position of the Communist Party of India deserves such scrutiny. Tense relations between Russia and the Western Powers together with the frightening record of many national Communist parties as mere instruments of Russian diplomacy have understandably caused governments and people to suspect that their Communist national constitute a dangerous political fifth column. Experienced students of international affairs moreover suggest that any check to Russian expansion in Europe must be followed by increased pressure in Asia. At the last party Congress in Calcutta. India's Communists adopted bolder policies, a change signalized by Mr. B.T.Randive's assumption of the general secretaryship, in place of Mr. P.C. Joshi. Resolutions were passed roughly criticizing the Nehru government and calling for a "Democratic Front". Discussions made clear that a government of the type obtaining in Eastern Europe was intended while an agreed amendment added the word" for the realization of the dictatorship of the proletariat." .... A further charge ...one which if proven must rightly be viewed by lovers of freedom with extreme concern --- rests perhaps on some misconceptions. At the last party Congress says Mr Roy, " one of the most significant decisions reached was to supply the masses with arms and to start a people's army." The Communist central committees statement of policy based on the resolutions at that Congress included -- which was rash-- such a resolution under item 15 of "the program of the Democratic Front." But study of the statement suggests that this was to be part of the policy of an established future " democratic Government" rather than a matter of gathering casual armament by the Communists now. The Government has merely to suspect that party members have been acquiring illicit arms and training the Red Guards in their use; had proof been available Mr Roy would presumably have said so, and the central government perhaps have acted. .....

.... We do not contend that the Government's recent action was without warrant, even if criticizing some of the evidence presented. Nevertheless the dilemma remains. If the Communist threat was grave, was this not properly an affair for the centre? If not, might not anything so illiberal as an outright ban-- as yet proclaimed by none of the Western Powers, though their danger is nearer and sharper - - have been avoided, for example by the use of powers already available? We will realize that Communists, if in power, might with utter ruthlessness extirpate liberals, present liberties, in a newly liberated land, should do other than deplore the enforced loss of Communist's (or other parties) democratic liberties now. If the India which was freed last August is truly to fulfil her achievement of freedom, throd of domestic repression must sparingly be used."

পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু অখুশি হয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের পারসোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টদের মধ্যে অন্যতম সরোজ চক্রবর্তী তাঁর "মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে" গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে কিছু তথ্যের উল্লেখ করেছেন। একটি কথোপকথন তিনি তাঁর বইটিতে উল্লেখ করেননি, কিন্তু স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে সরোজবাবু এই লেখককে বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর ঘর ও তাঁর পি-এ'দের ঘরের মাঝখানে ছিল একটা হালকা কাঠের দরজা। বিধানবাবু আমাদের ডাকবার জন্য সাধারণত বেল বাজাতেন না। তিনি হাঁক দিয়ে ডাকতেন 'ওহে।' কিন্তু দরজাটা বন্ধ থাকলে ডা. রায়ের প্রথম ডাকটা আমরা সব সময়ে ভাল করে শুনতে পেতাম না। ফলে উনি বকাবকি করতেন। এজন্য একটা কাঠের টুকরো দিয়ে আমরা দরজাটাকে একটু ফাঁক করে রাখতাম। কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-



আইনি ঘোষণা করার তিনচারদিন পর একদিন দুপুরে নেহরুর ফোন এল ডা. রায়ের কাছে। ডা. রায় ফোন ধরেই আমাদের হাঁক দিয়ে বললেন, কিরণকে তাড়াতাড়ি ডাকো। আমি ছুটে গিয়ে কিরণবাবুকে বললাম, স্যার ডা. রায় ডাকছেন, প্রধানমন্ত্রীর ফোন এসেছে। কিরণবাবুর মধ্যে কোনও চঞ্চলতা নেই। তিনি ধীরস্থিরভাবে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে ঢুকলেন। ডা. রায় সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা কিরণবাবুর হাতে তুলে দিলেন। ওদিক থেকে জওহরলাল নেহরু কী বলছেন জানি না। কিন্তু এদিক থেকে কিরণশঙ্কর রায় গম্ভীর গলায় ইংরাজিতে যে কথাগুলো বললেন, তার বাংলা তর্জমা এই দাঁড়ায় 'কমিউনিস্টদের কাছে তোমার (নেহরুর) সুনাম আছে, তাই তোমার সুনাম হারানোর ভয়ও আছে। ওদের (কমিউনিস্টদের) কাছে আমার সুনাম নেই, আমার সুনাম হারানোর ভয়ও নেই।' এই কথাগুলো বলে কিরণবাবু রিসিভারটা ডা. রায়ের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন —

সরোজবাবুর এই বক্তব্যের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ ডা. রায়কে লেখা জওহরলালের একটি চিঠি। জওহরলাল নেহরুর কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন একজন আমেরিকান বন্ধু ছিলেন, তাঁর নাম ডা. স্ট্যানলি জোন্স (Dr. Stanley Jones)। ডা. জোন্স নেহরুকে ওই সময় একটি চিঠি লেখেন। ওই চিঠির কপি নেহরু ডা. রায়কে এবং অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রীদের পাঠিয়ে দেন। এই প্রসঙ্গে সরোজ চক্রবর্তী তাঁর 'মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে' গ্রন্থটিতে যা উল্লেখ করেছেন, তা হল এই ঃ

"কম্যুনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপার নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ডাঃ রায়কে কী লিখেছিলেন, সেটাও এই সুযোগে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন ঐ পার্টি সাবোটাজ ও সন্ত্রাসবাদের যে কর্মসূচী নিয়েছিল তার কথা। এ-বিষয়টি নিয়ে অবশ্য আলোচনা হয়েছিল দিল্লীতে, ১৯৪৯ সালের এপ্রিলে, মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে। পার্টিটিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে কিনা, এ বিষয়ে তাঁর মতামত দেশের সব মুখ্যমন্ত্রীদেরই তিনি লিখে জানিয়েছিলেন।

"বিষয়টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বিবেচনা করে দেখেছে এবং তাঁদের সামনে মুখ্যমন্ত্রীদের মতামত পেশ করেছেন আমাদের উপ-প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিসভা এই মত প্রকাশ করেছেন যে, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার মতো কোনো পদক্ষেপ ঠিক এই মুহূর্তে পরিহার করাই উচিত। সন্দেহ নেই যে, কম্যুনিস্ট পার্টি খুব ক্ষতিকর কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছে। আমি আইনসভায় যা বলেছি, তা এখানেও আবার বলি। এইসব কাজকর্ম খোলাখুলি বিদ্রোহের দিকে যাচ্ছে, সাবোটাজ আর সন্ত্রাসবাদ ক্রমশই বাড়ছে। সেইজন্যই কী কেন্দ্রীয় সরকার, কী প্রাদেশিক সরকার -- উভয় সরকারই ঐ পার্টির সদস্যদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছে। পরিস্থিতি মোতাবেক এই ব্যবস্থা চলতেও থাকবে।

"সাধারণভাবে বলা যায়, নিষিদ্ধকরণ দিয়ে সেই সংগঠনকে কাবু করা যায় না, যে সংগঠন অন্তরাল থেকে কাজ করে। নিষিদ্ধকরণের ফলে সাবোটাজকারী আর সন্ত্রাসবাদীদের আদর্শবাদী দেশপ্রেমিকের মতো দেখাতে পারে।"

ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন একজন আমেরিকান মিশনারি চীনদেশ ভাল করে ঘুরে দেখে এসে নেহেরুজিকে একটি উপভোগ্য চিঠি লেখেন ১৫ই মে তারিখে। সেটি হল এই ঃ

"বহু বুদ্ধিজীবীর মনে প্রশ্ন জাগছিল, যে-সব কারণে কুওমিন্টাংদের বর্তমান অবস্থা হয়েছে, তার মতো অনেকগুলি কারণে কংগ্রেসেরও কি সেই অবস্থা হবে? আর সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্টরা এসে পড়ে ভারতে বিপ্লব পুরোপুরি শেষ করার চেষ্টা করবে? ক্ষমতার লিপ্সা যখন আছে, তখন বিপ্লব-আন্দোলন কি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলবে? জনগণকে জমি ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে এই আন্দোলন কি গড়িমসি করবে, সত্য নিয়ে টানাপোড়েন খুব বেশি সময় কাটিয়ে দিয়ে? প্রত্যেক মুহূর্তেরই এখন দাম আছে। নিচুতলার কর্মচারীদের মধ্যে যে ঘুষ আর দুর্নীতি চলছে, কংগ্রেস কি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সব-কিছু সহ্য করে যাবে? নাকি চীনের কম্যুনিষ্টদের মতো নির্মমভাবে দুর্নীতির মুলোচ্ছেদ করবে? এ ছাড়া আরও কথা আছে। শিল্পক্ষেত্রে মুনাফা ভাগ করে দেওয়ার নীতির ওপর কংগ্রেস কি জোর দেবে? এই সব প্রশ্নের উত্তর কংগ্রেস যদি দৃঢ়তার সঙ্গে দিতে পারে ঠিক পথে গিয়ে, তাহলেই দেশ বাঁচতে পারবে কম্যুনিস্টদের হাত থেকে।"

প্রধানমন্ত্রী দেশের সব মুখ্যমন্ত্রীদের কাছেই এই চিঠির কপি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

৭ই জুন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী লিখলেন ঃ

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

জুন মাসে লেখা আপনার একখানা চিঠি এইমাত্র পেলাম, সঙ্গে ১৫ই মে তারিখে লেখা ড. স্ট্যানলি জোন্সের চিঠিখানার একখানা কপি। দুখানি চিঠি পড়েই খুব কৌতূহল হয়, বিশেষ করে ড. জোন্সের চিঠিখানা। খুব ধারালোভাবেই তিনি তাঁর কথাগুলি আমাদের সবার সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

সন্দেহ নেই, কংগ্রেসের মধ্যে বেশ কিছু দুর্নীতি আর দলাদলি ঢুকে পড়েছে। কিন্তু সব থেকে খারাপ জিনিস হচ্ছে, কংগ্রেস-নেতাদের বেশির ভাগই যেন ফুরিয়ে গেছেন। আপনি যেমন বলেছেন, তেমনি নতুন চেষ্টা না চালালে, আর নতুন নতুন লোক না আনলে, কংগ্রেস অনড় হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য। আমি আপনার

সঙ্গে পুরোপুরি একমত যে, দেশে ওইরকম একটা উদ্যমের জোয়ার আনতে আর একটুও দেরি করা উচিত নয়।

দৃষ্টিভঙ্গি ও রীতিনীতির দিক থেকে কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠান হিসাবে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে হলে ওইরকম নতুন উদ্যম যে একান্ত দরকার, সেটা আমরা অনেকেই বুঝতে পারছি, কিন্তু এটা সবাই ধারণা করতে পারছি না যে, আমাদের কাজের ধারা হবে কী রকম। সেজন্য আমার মতে, আপনার এবং ড. স্ট্যানলি জোন্‌সের চিঠি দুখানার মূল বিষয়গুলিকে একটা ফরমুলার আকারে পরিণত করা হোক। বর্তমান কংগ্রেসের হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, অস্পৃশ্যতা বর্জন ও খদ্দর তৈরি করার যে নীতি, তা আমাদের এগিয়ে চলার পথে খুবই মূল্যবান হয়েছে, কিন্তু আমাদের রীতিনীতিতে আরও জোরদার ও নির্দিষ্ট কিছু চাই।

আপনার স্নেহভাজন
বিধান

সরোজ চক্রবর্তীর বইটি থেকে জানা যায়ঃ

"এই সময় আবার আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল। দুই বাংলার পাওনা আর দেনার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে যে মতান্তর দেখা দিয়েছিল, তা মেটাবার জন্য শালিসী ট্রাইবুনাল তাঁদের রায় ঘোষণা করলেন। দেনাপাওনাজনিত তথ্যের কচকচির মধ্যে না গিয়ে আমরা দেখাবো, দুই বাংলার সংখ্যালঘু, বিশেষ করে পূর্ব থেকে যারা দলে দলে পশ্চিমে চলে আসছিল, তাদের স্রোত রোধ করার জন্য ডাঃ রায়ের চেষ্টায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে কনফারেন্স বসেছিল কলকাতায় ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে, তার কী হলো। ভারতীয় দলের মাথায় ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রী ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী আর পাকিস্তানী দলের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন ওঁদের অর্থমন্ত্রী গুলাম মহম্মদ। দুই বাংলার দুই মুখ্যমন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের মনের আশঙ্কা দূর করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী নিয়ে চুক্তি হলো ৯ই এপ্রিল তারিখে। প্রাদেশিক ও স্থানীয় সংখ্যালঘুদের বোর্ড বসাবার কথা ছিল চুক্তিতে। কথা ছিল, যে-সব কর্মচারী সংখ্যালঘুদের বিষয়ে যথাযথ কাজকর্মের ব্যাপারে গাফিলতি করবে, যে-সব লোক দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে চিড় ধরাবার চেষ্টা করবে বা সংখ্যালঘুদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে চুক্তিমতো ডাঃ রায় সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যবস্থাই গ্রহণ করলেন, কিন্তু পরবর্তী সব ঘটনায় দেখা গেল, এতে কোনো ফল হলো না, দলে দলে উদ্বাস্তুরা যেমন আসছিল, তেমনি আসতেই লাগলো, বরং দিন দিন বাড়তে লাগলো তাদের সংখ্যা। আসলে নিচুস্তরের পুলিসের কিছু লোক আর পাকিস্তানী কিছু অফিসার পূর্ব পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘুদের উৎখাত করার ব্যাপারে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন।

"আবার ওদিকে হয়েছে কী, কংগ্রেসদলের চীফ হুইপ অমরকৃষ্ণ ঘোষ, যিনি প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে দলের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে ডাঃ রায়কে আনবার ব্যাপারে কলকাঠি নেড়েছিলেন, তিনি এই সময় ডাঃ রায়কে হটিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষকে আনবার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। কারণ আর কিছুই নয়, তাঁর ইচ্ছামতো সব কিছু হচ্ছিল না। তাঁর অযৌক্তিক কতগুলি অনুরোধ ডাঃ রায় ত রাখেনই নি, উল্টে নেতা হিসাবে ধমক দিয়েছিলেন। আর যায় কোথায়? তিনমাসের মধ্যেই দ্বিতীয়বারের জন্য মন্ত্রিসভাকে উল্টে দেবার জন্য তিনি উঠে পড়ে লাগলেন। ২২শে এপ্রিল তিনি কংগ্রেস অ্যাসেম্ব্লী পার্টির কয়েক জনের সই পর্যন্ত জোগাড় করলেন, তার মধ্যে ছিলেন দুজন মন্ত্রী এবং তিনজন পার্লামেন্টারি সেক্রেটারী, যাঁরা চাইলেন বর্তমান মন্ত্রিসভা বদ্‌লে খাঁটি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হোক। তাঁদের মতে, এ-মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসের বাইরের লোকও রয়েছে। এই মন্ত্রিসভা যদি চলতে থাকে, তাহলে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস- প্রার্থীদের অসুবিধা হতে পারে। এর উত্তরে ২৬ শে এপ্রিল ডাঃ রায় যে বিবৃতি দিলেন, তাতে তিনি বললেন যে, চিঠিগুলি তাঁর কাছে পৌঁছবার আগেই, সই যাঁরা দিয়েছেন, তাঁদের কেউ কেউ তাঁদের দস্তখৎ প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন বলে তাঁকে জানিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এর সঙ্গে কয়েকজন মন্ত্রী ও পার্লামেন্টারি সেক্রেটারীরা যখন জড়িত, তখন এটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, সাংবিধানিক দিক থেকে এটি গুরুতর বিষয়, এ সম্পর্কে বিশেষ বিচার-বিবেচনা করা উচিত।

"এ সময় বাংলার সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির এক প্রতিনিধিদল গিয়ে নেহেরুর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তখন বোম্বেতে। নেহেরু সব শুনে বললেন — ঠিক আছে। এ নিয়ে ডাঃ রায় এবং আপনারা, আপনাদের দুপক্ষের সঙ্গেই আলোচনা করবো।

"ইতিমধ্যে দুপক্ষই শক্তি-সঞ্চয়ে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ মহতাব ছিলেন বিধানসভায় নির্দল সদস্য, তিনি কংগ্রেসে চলে এলেন। প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা-ও তাই করলেন। ৫ই মে তারিখে বেলা ৪টায় ডাঃ রায়ের বাড়ির দোতলার হলঘরে বিশেষ অধিবেশন বসলো কংগ্রেস অ্যাসেম্বলী পার্টির। সাধারণত এ সব সভা নিচের তলাতেই হতো, কিন্তু সংবাদপত্রকে ঠেকানো আর গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য সেবার হয়েছিল এই ব্যবস্থা। আমার ওপর ভার



পড়েছিল নাম-করা এক মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি নিয়ে আসবার।

"যাই হোক, প্রাথমিক কথাবার্তার পর সভার আসল কাজ আরম্ভ হলো। বাড়ির বাইরে বিশাল এক জনতা উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে কী হয় না-হয়, জানবার জন্য। সভায় উপস্থিত ছিলেন সবশুদ্ধ ৫৩ জন সদস্য, তার মধ্যে চারজন মন্ত্রী ছিলেন যাঁরা এম.এল.এ বা বিধানসভার সদস্য নন। তিনজন মন্ত্রী আবার হাজির ছিলেন না, তার মধ্যে একজন হচ্ছেন সেচ-মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার। কংগ্রেস অ্যাসেম্ব্লী পার্টির সেক্রেটারী দেবেন সেন, যিনি চীফ হুইপ অমর ঘোষের সঙ্গে মিশে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছিলেন, তিনি যখন বুঝলেন যে জেতার কোন আশা নেই, তখন অন্য সুর ধরলেন। একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করে জানালেন, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব ছিল, তা তাঁরা প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। এ বিবৃতিতে সই করেছিলেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অমর ঘোষ, জে.সি.গুপ্ত প্রভৃতিকে নিয়ে ২২ জন। অন্য ৩১ (তার মধ্যে বর্ধমানের মহারাজাও ছিলেন) ডাঃ রায়ের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে দ্বিধা করেন নি।"

পশ্চিমবঙ্গ যখন এরকম একটা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে দোদুল্যমান এবং শক্তিধর বিধানচন্দ্র রায় টাল সামলাতে হিমসিম খাচ্ছেন, ঠিক তখন অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমান সমাজ মাতৃভাষার প্রশ্নে ক্রোধে এবং ক্ষোভে ফুঁসছে। আবার একই সঙ্গে ভারত-পাকিস্তানের স্বাভাবিক সম্পর্ক বিঘ্নিত হয়ে চলেছে হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নে দেশীয় রাজ্যগুলির (অবিভক্ত ভারতবর্ষের স্বাধীন করদ রাজ্যগুলি যারা প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন আইনের বাইরে ছিল) রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে। এই প্রসঙ্গে সরোজ চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"সেটা হবে ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস, — ডাঃ রায়ের সঙ্গে আমাকেও দিল্লী যেতে হয়েছিল। সাধারণত তিনি প্রধানমন্ত্রীর বাড়ী গিয়ে উঠতেন না। প্রথম দিকে উঠতেন মৌলানা আজাদের ওখানে, পরে উঠতেন ডাঃ জে.পি. গাঙ্গুলীর বাসায়। কিন্তু সেবার দেখলাম, তিনি ওসব না করে সোজা গিয়ে উঠলেন নেহেরুজীর বাড়ীতে। পুরো তিনটি দিন তিনি ওখানে রইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমারও সৌভাগ্য হলো প্রধানমন্ত্রী-ভবনের আতিথেয়তা লাভ করবার। রাত্রের খাবার সময়কার কথাবার্তা দুই নেতার মধ্যে চলতো মধ্যরাত্রি পর্যন্ত, প্যাটেলজীও এসে তাতে যোগ দিতে লাগলেন। আমার মনে হচ্ছিল, পশ্চিমবঙ্গেরই কোন জরুরী সমস্যা নিয়ে তাঁরা বোধহয় আলোচনা করছেন; আর সেজন্য দরকারী কাগজপত্রও আমরা সঙ্গে এনেছি।

"এক রাত্রে আমি তখনো টাইপ রাইটারে কাজ করছি বসে বসে, হঠাৎ তাকিয়ে দেখি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন ডাঃ রায় ও নেহেরুজী। নিজেদের কথাবার্তায় তাঁরা এত মগ্ন যে, আর কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মধ্যরাত্রি তখন পেরিয়ে গেছে।

"এইরকম অবস্থায় তিন দিন তিন রাত্রি কাটিয়ে আমরা ফিরে এলাম। কিন্তু যা ঘটতে যাচ্ছে, তা আমি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি। জানলাম পরে, কলকাতায় এসে। ১৯৪৮-এর ১৪ই সেপ্টেম্বর ভোর চারটের সময় হায়দরাবাদ রাজ্যের ২৫০০ মাইল জুড়ে প্রসারিত যে সীমান্ত-রেখা তা ভেদ করে ভারতীয় সেনাবাহিনী এগিয়ে গিয়ে ১২ ঘণ্টার মধ্যে কেল্লীভূত হলো সেকেন্দ্রাবাদে, মেজর জেনারেল জে.এন. চৌধুরী আর মেজর জেনারেল এ. রুদ্রের নেতৃত্বে। মাত্র চারদিনে কাজ শেষ। ১৮ই সেপ্টেম্বর নিজাম নিজের সৈন্যদের থামিয়ে দিলেন। কুখ্যাত লায়েক আলি-মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলেন, রাজাকার আন্দোলন নিষিদ্ধ করলেন, আর আবেদন জানালেন শান্তির। হায়দরাবাদ রাজ্য চলে এলো ভারতের মধ্যে। এই ঘটনার বেশ কয়েক মাস পরে আমি জানতে পেরেছিলাম, নেহেরুজীর জরুরী তলব পেয়ে কেন ডাঃ রায় এবার দিল্লী গিয়েছিলেন এবং ছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রীর অতিথি হয়ে। হায়দরাবাদ সংক্রান্ত পুলিশী ব্যবস্থা নিয়েই নেহেরু ও প্যাটেল আলাপ আলোচনা করছিলেন ও পরামর্শ নিচ্ছিলেন ডাঃ রায়ের।

"হায়দরাবাদের ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক ঐক্যে যাতে ফাটল না" ধরে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে প্রধানমন্ত্রী আগেভাগে নির্দেশ দিয়েছিলেন সব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীদের। ডাঃ রায় সেইমত সুরাওয়ার্দি সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি তখন ছিলেন কলকাতায়। এই দেখা সাক্ষাতের ফল কী পেলেন তিনি, সেটা ১৩ ই সেপ্টেম্বর চিঠির আকারে লিখে পাঠালেন নেহেরুকে। লিখলেন —

প্রিয় জওহর,

শহীদ সুরাওয়ার্দির সঙ্গে দেখা করলাম আজ সন্ধ্যাবেলা। সে বললো হায়দরাবাদের ব্যাপারে মুসলমানরা, তা সে ভারতেই হোক আর পাকিস্তানেই হোক, কোনো মারদাঙ্গা করবে না। তা সত্ত্বেও আমরা সজাগ রইলাম। যাতে কোথাও কোনো দাঙ্গাহাঙ্গামা না হয়, সেজন্য যা ব্যবস্থা নেবার সব নিয়েছি এইজন্য যে মুসলমানেরা কোনো ঘটনা না ঘটালেও কমুনিস্ট পার্টি তাদের হয়ে কিছু করে বসতে পারে। কোনো একটা বড়ো গোলমাল হলে তাদের খুব সুবিধা। সেই সুযোগে অমনি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

তোমার বিশ্বস্ত
বিধান

হায়দরাবাদে পুলিশী ব্যবস্থা নেবার পর ২১ সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে লিখলেন ঃ

প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী,

খুব জরুরী একটা ব্যাপারে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। দেখা যাচ্ছে, হায়দরাবাদে যখন আমরা কাজ আরম্ভ করি, তখন কিছু মুসলিমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এর কারণ বোধহয়, তাদের কারুর কারুর হায়দরাবাদের ব্যাপারে দরদ থেকে থাকবে, কিংবা ও-সংক্রান্ত কোনো কাজকর্মের যোগসূত্র তাদের থাকা সম্ভব, অথবা এ-ও হতে পারে, সন্দেহের বশেই কাউকে ধরা হয়েছিল। কিন্তু সে যাই হোক, এখন যখন হায়দরাবাদের মিলিটারী বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেছে, তখন আর তাদের জেলে কিম্বা অন্যভাবে আটকে রাখার কোনো দরকার নেই। আশা করি আপনি তাদের মুক্তির নির্দেশ দেবেন, যদি না তাদের আটকের পিছনে অন্য কোনো গুরুতর কারণ থেকে থাকে।

হায়দরাবাদের নাটকীয় ঘটনাবলীর পর আমাদের এই নীতি হওয়া খুবই দরকার যে শুধু হায়দরাবাদ নয়, সারা ভারতেরই মুসলমান জনগণের সম্পর্কে যথাসম্ভব উদার হতে হবে আমাদের, আরও সহৃদয় বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত তাদের দিকে। সংকটের সময় ভারতের মুসলমানেরা সমগ্রভাবে ভারতীয় ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকে যে আমাদের নীতিকেই জয়যুক্ত হতে সাহায্য করেছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা দিয়ে মুসলমান জনগণের মন জয় করার এই উপযুক্ত সময়। নয় কী? ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে করুন। তারা কম আঘাত পায় নি। তাদের মধ্যে সংশয় ও হতাশার একটা ভাব যে না রয়েছে এমনও নয়। হায়দরাবাদের ঘটনার ফলে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা থেকে ভারত জুড়ে একটা সাম্প্রদায়িক সাম্য গড়ে তোলার সুযোগ উপস্থিত। আমরা যদি ঠিকমতো কাজ করি, তাহলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ একেবারে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া সম্ভব। ঘটনাপ্রবাহের গতি ঘুরিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়, যাতে এর পুরোপুরি অবসান হয়, সে ব্যাপারে সক্রিয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

হায়দরাবাদের কথাই যদি ধরেন, আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, সারা পৃথিবীর চোখ এখন আমাদের দিকে। আর সেজন্যই আমাদের খুব ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে। খুব চিন্তাভাবনা না করে কোনো বিবৃতি বা মন্তব্য হঠাৎই করা উচিত হবে না। প্রত্যেকটি কথারই তখন মূল্য হবে অপরিসীম এবং আমাদের বিরোধীরা তাই নিয়ে হৈ চৈ শুরু করে দিতে পারে। দেশের বাইরের সংবাদপত্রগুলিও আমাদের পক্ষে তেমন নেই। তারা আমাদের কাজের যথেষ্ট সমালোচনা করেছে, যদিও তাদের সমালোচনা বাস্তব অবস্থার ওপর ভিত্তি করে হয় নি। আর সেজন্য সেগুলো যথার্থও নয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বলবো, দেশের বাইরেকার এইসব মতামত আমরা উপেক্ষাও করতে পারি না। বিশেষ করে, এতে যখন আমাদের যারা বন্ধু তাদেরও অনেকে খানিকটা যোগ দিয়েছেন। সেজন্য আমার মনে হয়, অন্যরা যাতে তাঁদের কথাবার্তায় কিছুটা সংযত হন, সে বিষয়ে তাঁদের বুঝিয়ে বলা দরকার হয়ে পড়েছে।

আপনার বিশ্বস্ত
জে. নেহরু"

১৯৪৮ সালের শেষে দেশীয় রাজ্য হায়দরাবাদে ভারত সরকারের সেনাঅভিযান এবং নিজামের প্রধানমন্ত্রী মির লায়েক আলিকে (Mir Laik Ali) গ্রেফতারের পর ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক খুবই তিক্ত হয়ে পড়ে। এই তিক্ততার ফলে স্বভাবতই উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতংক বেড়ে যায়। এই অবস্থার মধ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অনুমতি নিয়ে ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ঢাকায় যান। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খাঁ তখন ঢাকায় এসেছিলেন। এ সম্পর্কে ড. ঘোষ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন ".....ঢাকায় যাই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খানের সঙ্গে দেখা করতে। লিয়াকৎ সাহেবের কাছে পাই প্রীতি ও হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার। খুব খোলাখুলি আলাপ হয়। এই আলাপের সারমর্ম জওহরলালজী ও লিয়াকৎ সাহেবকে পাঠাই। ওই আলাপের সময় আমি তাঁকে বলি 'আপনার বক্তৃতার সব কথাই আমার ভাল লাগে তবে একটা বিষয়ে আমার খটকা লাগে।' তিনি জানতে চান 'সেটি কি?' আমি বলি 'প্রতি সভায় আপনার প্রতিরক্ষার কথা বলা। আপনি যখন প্রতিরক্ষার কথা বলেন তখন হিন্দুরা ঘাবড়ে যায়। তেমনি আমরা যখন প্রতিরক্ষার কথা বলি তখন মুসলমানরা ঘাবড়ে যায়। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার অর্থ ভারতের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা, ঠিক তেমনি ভারতের প্রতিরক্ষার অর্থ পাকিস্তানের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা। আমরা তো কেউ আমেরিকা, রাশিয়া বা বৃটেনের সঙ্গে লড়াই করতে পারিনা। লিয়াকৎ আলি বললেন, 'তা ঠিকই।' আমি আবার বলি, এমন কি অস্ত্র ইত্যাদি তারা না দিলে আমরা লড়াই করতে পারিনা। এবারও তিনি 'হ্যাঁ' বললেন। আমি আবার বলি, এ কি প্রীতিকর অবস্থা? লিয়াকৎ বললেন, 'নিশ্চয়ই না। আপনারা ইংলণ্ড আমেরিকার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে চান। আমি আপনাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছি। তবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্প্রীতি দরকার দুই দেশেরই স্বার্থে।"

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এরকম একটা রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক অবস্থার মধ্যে হুসেন শহিদ সুরাবর্দি তাঁর রাজনৈতিক



ভাগ্য অন্বেষণের জন্য ১৯৪৮ সালের শেষভাগে কলকাতা থেকে পাকিস্তানে চলে যান। তিনি দিল্লি থেকে করাচি বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করা মাত্র পাকিস্তান সরকার তাঁর উপর ১৪৪ ধারা জারি করে পাকিস্তানে তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের আদেশ দেন। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি প্রকাশ্যে সুরাবর্দির পাকিস্তানে আগমনের বিরোধিতা করে বিবৃতি দিয়ে বলেন: Here is the mad dog let loose by India.!

আবার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রসঙ্গে আসা যাক। দেশ বিভাগের সময় এবং ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা রণেন সেন তাঁর লেখা "ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে বলেছেন, ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে কলকাতার ডেকার্স লেনে পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সম্মেলন বসে। রণেন সেন এই সম্মেলনকে 'অবিভক্ত বাংলার শেষ পার্টি সম্মেলন' আখ্যা দিয়েছেন। এই সম্মেলনেই রণেন সেন কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সম্মেলনে পার্টি লাইনের পরিবর্তন এবং কলকাতায় আসন্ন পার্টি কংগ্রেসের (১৯৪৮ এর ফেব্রুয়ারি) কর্মসূচির প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। পার্টির সশস্ত্র বাহিনী 'রেড গার্ড' গঠন, মহম্মদ আলি পার্কে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস এবং ১৯৪৮ সালের ২৫ শে মার্চ কমিউনিস্ট পার্টিকে বে আইনি ঘোষণা করা সম্পর্কে রণেন সেন তাঁর গ্রন্থে বলেছেন ঃ

"আগেই লেখা হয়েছে যে ১৯৪৬ সাল থেকে পার্টি আবার সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। সংগ্রাম প্রথমত শুরু হয় শ্রমিক অঞ্চলে, শিল্পাঞ্চলে একের পর এক ধর্মঘট হতে থাকে। কোথাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোথাও বা পার্টি পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে। এইসব ধর্মঘট পরিচালনার জন্য এবং ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনের সংগঠনের জন্য ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠনে পার্টি উদ্যোগ নেয়। ফলে কলকাতা শহরে এবং আশেপাশের শিল্পাঞ্চলে এক সুসংগঠিত ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে উঠি। ১৯৪৭ সালের গোড়াতেই শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত পার্টি সদস্য ও সমর্থকরা এই বাহিনীতে যোগ দেন। এই ভলান্টিয়ার বাহিনীকে আধা-সামরিক পোশাকে সজ্জিত করা হয়। পার্টি থেকে এই বাহিনীর নাম দেওয়া হয় রেড গার্ড। ঐ আধা-সামরিক উর্দি পরে রেড গার্ডরা কলকাতার পথে পথে যখন কুচকাওয়াজ করত তখন শত্রুমিত্র সকলেই তাদের দিকে শংকা বা প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত। শিল্পাঞ্চলে প্রতিটি ধর্মঘটে কারখানার কাছে এদের কুচকাওয়াজ করানো হতো। রেড গার্ড প্রতিটি মিছিলের পুরোভাগে থাকত। প্রতিটি সভার শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করত। অনন্ত সিং, গনেশ ঘোষ, ডাঃ নারায়ণ রায় প্রমুখ এদের শিক্ষা ও সংগঠন পরিচালনা করতেন। প্রাদেশিক পার্টি কমিটি রেড গার্ড সম্পর্কে খুবই আগ্রহী ছিল। এই সংগঠনে জলি কল ও সীতারাম সিং থেকে শুরু করে ডাঃ আবিরলাল, ডাঃ নৃপেন সেন, ডাঃ আর. কে.কৃষ্ণ প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করতেন। সবার মনে নেই, বিড়ি, ট্রাম প্রভৃতি শিল্পের লোক তো ছিলই।

## দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস — কলকাতায়

ইতিমধ্যে ভারতের অন্যত্রও ভারত সরকারের নীতি কায়েমী স্বার্থমুখী, জনবিরোধী ও গণআন্দোলন বিরোধী হতে থাকে। বহুস্থানে জনগণের উপর অত্যাচারও চলতে থাকে। হায়দ্রাবাদে অদ্ধ্রমহাসভার আন্দোলন নিজামের বিরুদ্ধে চলছিল। তার প্রতিও ভারত সরকার দ্বিমুখী মনোভাব পোষণ করত। পার্টির মধ্যেও সরকারী নীতির বিরোধিতার মনোভাব দানা বেঁধে ওঠে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির শ্লোগান 'জাতীয় ঐক্য ও অগ্রগতি' বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না। এই অবস্থায় ডিসেম্বরে (১৯৪৭) কেন্দ্রীয় কমিটির সভা বোম্বাইতে বসে। সেখানে বাংলার কমরেডরাই প্রথম পার্টি নীতির পরিবর্তন দাবি করেন। আলোচনায় মোটামুটি রণদিভে ও অন্যান্য কমরেডদের বেশির ভাগই সরকার বিরোধী সংগ্রামের কথা বলেন। কেবল যোশী, সুন্দরায়া ও কয়েকজন পুরনো পথের সমর্থক ছিলেন। এই হলো দ্বিতীয় কংগ্রেসের পটভূমি। রণদিভে একটি দলিল লিখে কলকাতায় আমাদের কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করে ফিরে যান।

বিশ্ব-যুব প্রতিনিধিরা কলকাতায় সম্মেলন করেন পার্টি কংগ্রেসের কিছু আগে। কংগ্রেসি ছেলেদের হাতে ভারতীয় প্রতিনিধিদের চাবিকাঠি ছিল। তাঁরা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কমিউনিস্ট বিদ্বেষ ও সোভিয়েত বিরোধিতা জাহির করেন। ভারতের বাইরের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন ভিয়েতনাম, সোভিয়েত ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ থেকে, যেখানে সংগঠিতভাবে প্রচণ্ড ফ্যাসিবিরোধী গেরিলা যুদ্ধ হয়েছিল। তাঁদের চেষ্টায় কংগ্রেসি ছেলেরা সুবিধা করতে পারেন না। তাই কংগ্রেসিরা গোলমাল করার সুযোগ খুঁজছিলেন।

ঐ বিদেশী যুব প্রতিনিধিদের চারু ঘোষের বাড়িতে একটা অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত হয়। সেখানে সশস্ত্র কিছু কংগ্রেসি গুণ্ডা নিমন্ত্রিতদের আক্রমণ করে। আই.পি.টি.এ-র কমরেড সুশীল মুখার্জি ও চারুবাবুর বাড়ির একজন ভবমাধব ঘোষ তাদের গুলিতে মারা যান।

## বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি সতর্ক হলো

মহম্মদ আলী পার্কে বিরাট চাঁদোয়ার নিচে সময় মত পার্টি কংগ্রেস বসল। বিরোধীদের তরফ থেকে আক্রমণের ভয় ছিল

তাই কড়া পাহারা (গার্ড) দেওয়া হয়। এই পাহারার কাজে রেড গার্ড বাহিনীর একটা অংশকে নিযুক্ত করা হয়। অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ,ডাঃ নারায়ণ রায় প্যাভেলের রেড গার্ডদের অধিনায়ক ছিলেন। পার্টি কংগ্রেসে যাতে বাইরে থেকে কোন আক্রমণ হলে প্রতিহত করা যায় তার জন্য প্রচ্ছন্নভাবে কিছু কমরেডও সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন ও অন্য ব্যবস্থাও ছিল। সে এক এলাহি ব্যাপার। তবে সবই সম্ভব ছিল কারণ পার্টির মধ্যে বজ্রকঠিন ঐক্য, কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি অবিচল আস্থা, পার্টি সংগঠনের শক্তি ও দৃঢ়তা, সভ্যদের সাহসিকতা ও তদুপরি পার্টির প্রতি আনুগত্য ও নীতির প্রতি অটুট বিশ্বাস ও ভালবাসা পার্টি সভ্যদের সর্বদাই উদ্দীপিত রাখত। এবং পার্টি নেতৃত্বের প্রতি সভ্য ও সমর্থকদের বিশ্বাস ও ভালবাসা এক বিরাট ঐক্যবদ্ধ পরিবারের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। পার্টি কংগ্রেসে সর্ব শ্রেণী থেকেসর্ব বয়সের নরনারীর এক বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি আসেন। পূর্ব বাংলা থেকেও যথেষ্ট প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

কংগ্রেসে ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধি হিসাবে এসেছিলেন (অন্যান্য দেশ থেকে) যুগোভিচ ও জিলাস (যুগোশ্লাভিয়ার পার্টি থেকে), লরেন্স শার্ক (অস্ট্রেলিয়ার পার্টি থেকে) ও বর্মার পার্টির সম্পাদক থানটুন (বর্মার পার্টি নতুন করে ইতিপূর্বেই গঠিত হয় আউঙ্গ সানকে বাদ দিয়ে) — থানটুনের সঙ্গে প্রায় আট বৎসর পরে দেখা হলো। তাঁর বক্তৃতা খুবই গরম — সশস্ত্র সংগ্রামের মারফত মুক্তি আসবে, আমরা বর্মায় সেই পথে চলেছি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় কংগ্রেসেই শেষ যুক্ত পার্টি কংগ্রেস। সেই কংগ্রেসেই প্রস্তাব করে পার্টিকেও ভাগ করে দেওয়া হলো। পাকিস্তানে পার্টির সম্পাদক হলেন সজ্জাদ জহীর (বন্নে ভাই) এবং পার্টিতে বুখারী, আতা মহম্মদ খান, মির্জা ইব্রাহিম সিপ্রিয়ান, মণি সিং, খোকা রায়, নেপাল নাগ, বারীন দত্ত (আব্দুস সালাম), জ্ঞান চক্রবর্তী, অনিল মুখার্জি, প্রমথদা, কেষ্টদা, আলতাব আলী প্রভৃতি পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব বাংলার সব কমরেডই চলে গেলেন পাকিস্তান পার্টিতে।

কংগ্রেস শেষে আমরা ভাঙা বাংলার পার্টি নিয়ে বসলাম। সংগ্রাম কিভাবে শুরু করা যায় এবং কোথায়। রেড গার্ডকে আরও মজবুত করা, পার্টি সংগঠনকে নতুন পর্যায়ে দাঁড় করানো, শ্রমিক সংগঠনগুলিকে আরও শক্ত করা ইত্যাদি সামনের কাজ। গুজব রটেছিল পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হবে, তাই কিছু গোপন ঘাঁটি প্রস্তুত করার কাজও চলছিল। প্রধানত সরোজকে এর ভার দেওয়া হয়। এমন সময় ২৫ শে মার্চ দুটো স্থান থেকে গোপন খবর এল পার্টিকে ২।১ দিনের মধ্যে বে-আইনী ঘোষণা করা হবে। অতএব সাধু সাবধান। ২৬ শে মার্চ ভোর বেলা সরকারী বেড়াজাল পড়ল। কিন্তু আমরা বেড়াজাল এড়াতে সমর্থ হই। ভবানী সোম, লাহিড়ী, ভূপেশ, গণেশদা, ইসমাইল, মনোরঞ্জন রায়, ধরণীদা, গোপেন চক্রবর্তী, সত্যেন মজুমদার, আমি, সরোজ, নিরঞ্জনদা প্রভৃতি পুলিশের বেড়াজাল এড়াতে পারি। ধরা পড়েন মুজফ্‌ফর, মোমিন, জ্যোতি বসু, বিশ্বনাথ, অম্বিকাদা এবং অন্যান্য অনেকে।

সকালে রেডিওতে ঘোষণা শুনলাম যে দেশদ্রোহী কমিউনিস্ট পার্টি, তার কমিউনওলো, তার 'স্বাধীনতা' পত্রিকা, রেড গার্ড, রেড এড কিওর হোম অন্তর্ঘাতমূলক কাজে লিপ্ত ছিল, তাই উক্ত সংগঠনগুলোকে বে-আইনী ঘোষণা করা হলো। এবং আমাদের নাম করে বলা হলো যে এদের নামে ওয়ারেন্ট আছে।

তখন ডাঃ বিধান রায়ের মন্ত্রিসভা, কিরণশঙ্কর রায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনি সন্ধ্যায় রেডিও মারফত বক্তৃতায় ঐসব কথাই বলেন এবং দেশবাসীর সহযোগিতা কামনা করলেন। অতএব 'স্বাধীনতা' পত্রিকা ও প্রেস সরকার দখল করল, আর দখল করল সব পার্টি অফিস, পার্টির টাকা পয়সা ও সব সম্পত্তি।

গুরু হল আমাদের নতুন বিপ্লবী জীবন, আর পার্টির গোপন ক্রিয়াকলাপ। পার্টির মধ্যে কোন আতঙ্ক দেখা দিল না, বরং নতুন চেতনা, সাহসিকতা, কর্তব্যবোধ, নীতির প্রতি নিষ্ঠা ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপর অটুট আস্থা দেখা দিল। পার্টির নতুন পর্যায় শুরু হল।

গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হন কলকাতা জেলার কিছু নেতা, যেমন কুমুদ বিশ্বাস, গোপাল আঢ্যর্, বীরেন রায়, নরেন সেন, রমেন ব্যানার্জি, প্রভাত দাশগুপ্ত প্রভৃতি। সেই রকম হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, উত্তর দিনাজপুর থেকে অনেক কমরেড গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হন। হাওড়ার প্রায় সমস্ত জেলা কমিটির সভ্য — সমর, জীবন মাইতি, হরিসাধন,সন্তোষ গাঙ্গুলী, গোবিন্দ কাঁড়ার প্রমুখ কমরেড, হুগলী থেকে তুষার, কমল, কালী ঘোষ ইত্যাদি, ২৪ পরগনা থেকে রাসবিহারী ঘোষ, নিত্যানন্দ চৌধুরী, প্রভাস রায়, গোপাল বোস, নীরেন ঘোষ প্রভৃতি নেতারা, মেদিনীপুর থেকে ভূপাল পান্ডা, সরোজ রায়, সুকুমার সেনগুপ্ত ও আরও কয়েকজন পুলিশের বেড়াজাল এড়িয়ে গোপনে পার্টির কাজে লাগলেন। পশ্চিম বাংলার পার্টি প্রথম বেআইনী ঘোষিত হবার সম্মান পেল। পার্টি নতুন পথে নামল।"

এই প্রসঙ্গে পাকিস্তানে প্রেরিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দুই নেতা সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। এদের একজন হলেন পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার মনসুর হবিবুল্লা ও অন্যজন হলেন উত্তরপ্রদেশের সাজ্জাদ জাহির।

(ক্রমশ)

**বড় গল্প**

# যেখানে সীমান্ত নেই

## প্রফুল্ল রায়

একান্ন বছর পর ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা কামরা থেকে আলতাফ যখন ভয়ে ভয়ে আজিমাবাদ স্টেশনে নামল, শীতের সূর্য আকাশের ঢাল বেয়ে পশ্চিমদিকে অনেকখানি নেমে গেছে। রোদে এখন বাসি হলুদের ম্যাড়মেড়ে রং। উল্টোপাল্টা উত্তুরে হাওয়া চারদিকে বেপরোয়া ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে।

পুরো নাম আলতাফ হোসেন। বয়স ষাট। মাঝারি উচ্চতা তার, রোগাটে চেহারা। চোখের তলায় কালির পোঁচ, হনুদুটো গজালের মতো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে, তাই চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। চামড়া কুঁচকে খসখসে হয়ে গেছে। সারা শরীর জুড়ে ক্ষয়ের ছাপ। চুল এবং মুখ-ভর্তি দাড়ির বেশির ভাগটাই সাদা।

আলতাফের পরনে প্রচুর কুঁচি-দেওয়া ঢোলা পাজামা আর শেরওয়ানি। তার ওপর রোঁয়াওলা উলের পুরো-হাতা পুলওভার। উত্তর ভারতের দুর্জয় ঠাণ্ডা ঠেকাবার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। তাই পুলওভারের ওপর মোটা পশমি চাদরও জড়িয়ে নিয়েছে। পায়ে ভারী চপ্পল।

আলতাফের ডান হাতে একটা চামড়ার ঢাউস স্যুটকেশ, আরেক হাতে হোল্ড-অল। হোল্ড-অলটার ভেতর রয়েছে তার বালিশ, চাদর, একজোড়া কম্বল এবং বেড-কভার ছাড়াও টুকিটাকি অজস্র জিনিস।

দেশভাগের দু'বছর বাদে যখন তার বয়স নয়, আলতাফরা আজিমাবাদ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। উঠেছিল করাচি শহরে। পুরনো করাচির ঘিঞ্জি এলাকায় তারা থাকে। জায়গাটা ভারত থেকে চলে-যাওয়া উর্দুভাষী মুসলিম উদ্বাস্তুদের একটা কলোনি। ওখানে তাদের বলা হয় মোহাজির।

একান্ন বছর পর সে যে ইন্ডিয়ায় এল তার কারণ দুটো। এক, আজমীড় শরিফে যাওয়া। দুই, আজিমাবাদে এসে বড় বোন ফতিমার সঙ্গে দেখা করা। দেশভাগের পর তারা পাকিস্তানে চলে গেলেও ফতিমারা এখানেই থেকে গেছে। অনেকেই ওদের বুঝিয়েছিল, ইন্ডিয়ায় তাদের নিরাপত্তা নেই, ভবিষ্যৎও অন্ধকার। এই অবস্থায় প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে এখানে পড়ে থাকার মানে হয় না। কিন্তু ফতিমার শ্বশুর শেখ বদরুদ্দিন ভীষণ একবগ্‌গা ধরনের মানুষ। তার এক কথা, নিজের দেশ নিজের জন্মভূমি ছেড়ে পরিবার নিয়ে কোথাও যাবে না। এতে যা হবার হবে।

দেশভাগের আগে এবং কিছু পরেও আজিমাবাদে হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে বেশ কয়েকবার বড় আকারের দাঙ্গা বেধেছিল। যার পরিণতি আগুন, রক্তপাত আর হত্যা। দুই সম্প্রদায়ের মানুষ কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। পরস্পরের প্রতি তখন শুধুই ঘৃণা, বিদ্বেষ আর সন্দেহ। মুসলমানদের মধ্যে যখন চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে, তারা দলে দলে চলে যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে, তখনও মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারায়নি বদরুদ্দিন। তার ধারণা, সবাই অমানুষ হয়ে যায়নি।

আলতাফের মতো একজন সামান্য মানুষের পক্ষে মুখের কথা খসালেই পাকিস্তান থেকে ঘট করে ইন্ডিয়ায় চলে আসা সম্ভব নয়। দিনের পর দিন ছোটাছুটি করে, প্রচুর হয়রানি সয়ে যখন সে আশা পায় ছেড়ে দিয়েছে সেই সময় পনেরো দিনের ভিসা পেয়ে গিয়েছিল। করাচি থেকে প্লেনে তাকে দিল্লি হয়ে ট্রেনে আজমীড় শরিফ যেতে হবে। সেখান থেকে আজিমাবাদে এসে ফতিমার সঙ্গে দেখা করে ফের দিল্লি গিয়ে প্লেনে করাচি। অর্থাৎ যে রুটে এসেছিল সেই রুটেই তাকে ফিরতে হবে।

দিন সাতেক আগে ইন্ডিয়ায় এসেছে আলতাফ। আসার সময় তাদের মহল্লার লোকজনেরা বার বার হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল, ইন্ডিয়া মুসলমানদের, বিশেষ করে পাকিস্তানিদের পক্ষে নিরাপদ নয়। ইন্ডিয়ায় আসার পর ট্রেনে বাসে ট্যাক্সিতে এই সাতদিন প্রচুর ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আলতাফের একবারও মনে হয়নি, তার বিপদের কোনও কারণ আছে। এই বিশাল দেশ, লাখ লাখ মানুষ। কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় নি। তবু যে কাঁদিন এখানে আছে তাকে সতর্ক হয়েই চলাফেরা করতে হবে। করাচির পড়শিদের হুঁশিয়ারিটা সে ভুলে যায়নি।

ট্রেন থেকে নেমে দাঁড়িয়ে পড়েছিল আলতাফ। দু'চোখে অসীম আগ্রহ নিয়ে চারদিকে তাকাল। সে একাই নয়, ট্রেনটা থেকে আরও অনেক প্যাসেঞ্জার নেমেছে। তা ছাড়া বেশ কিছু

লোক নানা দিকে যাবার জন্য প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, মালপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে। পুরো স্টেশন চত্বরটা এখন সরগরম।

করাচিতে চলে যাবার পর গোড়ার দিকে আজিমাবাদের জন্য ভীষণ মন খারাপ হয়ে থাকত আলতাফের। কয়েক বছর বাদে এখানকার কথা সেভাবে আর ভাবেনি সে। ইন্ডিয়া থেকে তাদের সঙ্গে হাজার হাজার মুসলিম ফ্যামিলি সীমান্তের ওপারে চলে গেছে। নতুন দেশ, নতুন নতুন বন্ধু, স্কুল, পড়াশোনা — সব মিলিয়ে উত্তরপ্রদেশের এক প্রান্তে পড়ে থাকা নগণ্য আজিমাবাদ টাউন বছদূরের আধ-চেনা কোনও সিতারার মতো অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শীতের এই বেলাশেষে পুরনো স্মৃতি একটু একটু করে যেন ফিরে আসছে।

আলতাফের মনে পড়ছে, স্টেশনের একতলা লাল বিল্ডিং আর সুরকি-বিছানো প্ল্যাটফর্মটা একান্ন বছর আগের মতোই রয়েছে। নতুন যা যোগ হয়েছে তা এইরকম। প্ল্যাটফর্মটা ছিল ন্যাড়া, এখন স্টেটার মাথায় ঝকঝকে টানা একটা শেড। চড়া রোদ এবং বৃষ্টির ছাট থেকে প্যাসেঞ্জারদের মাথা বাঁচানোর জন্য এই ব্যবস্থা। স্টেশনের টিকেট-কাউন্টারের গা ঘেঁষে একটা বড় চায়ের স্টল চোখে পড়ছে। সেখানে চা তো পাওয়া যায়ই, তা ছাড়া কাচের শো-কেসে রয়েছে কত রকমের মিঠাই-লাড্ডু, গুলাবজামুন, প্যাঁড়া, বড় দানার বুন্দিয়া। শো-কেসের মাথায় বড় বড় কাচের বয়েমে নানা ধরনের বিস্কুট, চানাচুর, গাঠিয়া। বয়েমগুলোর পাশে পাউরুটির স্তূপ। এই টি স্টলটা আগে ছিল না।

দেশভাগের সময় এখানে সিঙ্গল লাইন দিয়ে আপ এবং ডাউন ট্রেনগুলো যাতায়াত করত। এখন দেখা যাচ্ছে, আরও একজোড়া লাইন পাতা হয়েছে। ওগারের লাইনের পর শেডওলা নতুন একটা প্ল্যাটফর্মও করা হয়েছে।

একান্ন বছর আগে আজিমাবাদ ছিল খুব নগণ্য এক স্টেশন। সারাদিনে মাত্র দু'জোড়া আপ আর দু'জোড়া ডাউন ট্রেন জায়গাটাকে ছুঁয়ে যেত। ট্রেন আসার সময় এখানে যা একটু চাঞ্চল্য দেখা দিত। বাকি দিনটা গোটা স্টেশন চত্বর নিঝুম পড়ে থাকত। মনে হত, সব কিছু গভীর ঘুমের আরকে ডুবে আছে।

স্টেশনে দাঁড়িয়েই টের পাওয়া গেল, দেশভাগের পর এখানে প্রচুর মানুষ বেড়েছে, বেড়েছে তাদের ব্যস্ততা এবং নানা কিছে অবিরত ছোটাছুটি। করাচির কথা মনে পড়ল আলতাফের। দেশভাগের পর তারা যখন সেখানে যায়, কত আর মানুষ! আর এখন? একান্ন বছরে ওই শহরটার জন-বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। চারদিকে সারাক্ষণ থিকথিকে ভিড়। দুনিয়ার সব জায়গাতেই মানুষ ক্রমাগত পোকার মতো বেড়ে চলেছে। আজিমাবাদই বা বাদ থাকবে কেন?



স্মৃতির ভেতর থেকে নিজেকে একসময় টেনে তোলে আলতাফ। কয়েক পলক প্ল্যাটফর্মের প্যাসেঞ্জারদের লক্ষ করে। কিন্তু একটা চেনা মুখও নজরে পড়ছে না। হঠাৎ খেয়াল হল, করাচিতে যাবার সময় আজিমাবাদে যাদের দেখে গিয়েছিল তাদের চেহারা কি আর সেরকমই আছে যে দেখামাত্র চিনে ফেলবে? তা ছাড়া, সেই পরিচিত মানুষগুলোর কত জন বেঁচে আছে তা-ই বা কে জানে। থাকলেও তারা দল বেঁধে এই মুহূর্তে স্টেশনে চলে এসেছে, তা ভাবার কারণ নেই। তার নিজের কথাই যদি ধরা যায়, সেই বচপনের চেহারার সঙ্গে এখনকার চেহারার আদৌ কি কোনও মিল আছে? পরিচয় না দিলে আজিমাবাদের কেউ তাকেও চিনতে পারবে না।

আলতাফ আর দাঁড়িয়ে থাকেনা। লোকজনের জটলার ভেতর দিয়ে পায়ে পায়ে গেটের দিকে এগিয়ে যায়।

দিন সাতেক আগে যখন সে ইন্ডিয়ায় আসে, দিল্লির এক ডাকঘর থেকে পোস্ট কার্ড কিনে আজিমাবাদে তার বড় বোন ফতিমাকে চিঠি লিখেছিল, খুব শিগগিরই এখানে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। কিন্তু আজই সে আসতে পারবে, সে সম্বন্ধে নিজেই নিশ্চিত ছিল না। আজকের কথা জানিয়ে দিলে ফতিমা নিশ্চয়ই তার ছেলেদের কাউকে স্টেশনে পাঠিয়ে দিত। কিন্তু পাঠালেও তাদের কি চিনতে পারত আলতাফ? যখন তারা পাকিস্তানে যায়, ফতিমার বড় ছেলের বয়স সবে এক। এক বছরের সেই বাচ্চাটিকে এখন কেমন দেখতে হয়েছে, কে বলবে। যাই হোক, কেউ স্টেশনে তাকে নিতে না এলেও, উঁচা মহল্লায় ফতিমাদের বাড়ি খুঁজে বার করতে তার অসুবিধা হবে না। এখানে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য এক জাদুতে পুরনো আজিমাবাদের রাস্তাঘাট, নানা মহল্লা চোখের সামনে ফুটে উঠছে।

গেটের মুখে কালো কোট পরা টিকেট কালেক্টর দাঁড়িয়ে ছিল। তার হাতে টিকেট জমা দিয়ে কয়েক পা এগুলেই পাথরে-বাঁধানো সিঁড়ি। পায়ের ঘষায় ঘষায় খানিকটা করে ক্ষয়ে গেলেও সেগুলো দেশভাগের সময়কার মতোই রয়েছে। নামতে নামতে আলতাফের মনে পড়ল, সবসুদ্ধ পঁচিশটা ধাপ ছিল। গুণে গুণে দেখল, সংখ্যাটা একই আছে। স্মৃতি এক অদ্ভুত ব্যাপার, অদৃশ্য গোপন সিন্দুকে কত কিছু যে ধরে রাখে!

নীচে নামতেই তাজ্জব বনে গেল আলতাফ। চারপাশ একেবারে গম গম করছে। দেশভাগের সময় এখানে ছিল সুরকির রুক্ষ একটা রাস্তা, স্টেটার একধারে তেরপল কি ফুটোফাটা টিনের চালার তলায় তিন চারটে চা কি পানবিড়ির দোকান। আরেক ধারে ক'টা টাঙ্গা সওয়ারির আশায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত। কিন্তু কোথায় সওয়ারি? টাঙ্গাওলারা এবং তাদের ঘোড়াগুলো প্রায়



সারাদিন ঝিমাত। এই নির্জন এলাকার অন্তহীন, গভীর ঘুম এবং আলস্য তাদের ওপর ভর করে থাকত যেন।

কিন্তু এখন জায়গাটার চেহারা আগাগোড়া বদলে গেছে। পুরনো সুরকির রাস্তাটা দশগুণ চওড়া হয়েছে, তার ওপর কালো মসৃণ পিচ। দু'ধারে যতদূর চোখ যায়, লাইন দিয়ে দোকান। প্রতিটি দোকানদার রাস্তার চার পাঁচ ফুট করে জায়গা দখল করে তাদের মালপত্র সাজিয়ে রেখেছে। দোকানগুলোতে ভনভনে মাছির কাঁচের মতো খদ্দেরের ভিড়। পাকিস্তানের যে কোনও মফস্বল শহরে স্টেশনের গায়ে অবিকল এই দৃশ্য চোখে পড়ে। এ ব্যাপারে ইন্ডিয়া-পাকিস্তানে কোনও তফাত নেই।

আলতাফ লক্ষ করল, ডান পাশে ঝাঁকড়া-মাথা চার পাঁচটা পিপল গাছের তলায় সারি দিয়ে টাঙ্গা দাঁড়িয়ে আছে। দেশ-ভাগের সময় তিন চারটের বেশি দেখা যেত না। এখন টাঙ্গার সংখ্যা কম করে তার দশ গুণ।

টাঙ্গার সারি যেখানে, তার উল্টো দিকে ক'টা রেন-ট্রির তলায় অনেকগুলো অটো রিকশা চোখে পড়ল। এই যানগুলো কবে এসেছে, কে জানে। ইন্ডিয়া ছেড়ে আলতাফরা যখন চলে যায়, আজিমাবাদে অটো ছিল না।

ওল্ড করাচিতে ঝাঁকে ঝাঁকে অটো রিকশা চলে। কিন্তু অটোয় চড়া খুব একটা পছন্দ করে না আলতাফ। সে পিপুল গাছগুলোর তলায় টাঙ্গা স্ট্যান্ডে চলে এল। একটা টাঙ্গা ঠিক করে সুটকেস আর হোল্ড-অল নিয়ে উঠে বসতেই মাঝবয়সী টাঙ্গাওলা তার গাড়ি চালিয়ে দেয়।

মানুষের ভিড়, গৈয়া গাড়ি, অটো, টাঙ্গা, ভ্যান, ঠেলা গাড়ি ইত্যাদি মিলিয়ে রাস্তা জুড়ে জটপাকানো, দমবন্ধ-করা অবস্থা। আলতাফের টাঙ্গার চালক হাওয়ায় সাঁই সাঁই চাবুক হাঁকাতে হাঁকাতে গলার শির ছিঁড়ে সমানে চেঁচাতে থাকে, 'হট যাও, হট যাও —' শুধু সে-ই না, অন্য টাঙ্গাওলা, অটোওলা, ভ্যানওলারাও একইভাবে চিৎকার করতে করতে চলার মতো পথ করে নিচ্ছে।

স্টেশনের এলাকাটা পেরুতে মিনিট পনেরো কুড়ি লেগে যায়। তারপর রাস্তা অনেকটাই ফাঁকা।

শহরের নামেই এখানকার স্টেশনের নাম। আজিমাবাদ টাউন স্টেশন থেকে বেশ খানিকটা দূরে। আলতাফের পরিষ্কার মনে পড়ে, সুরকির একটা রাস্তা শহরের সঙ্গে স্টেশনটাকে জুড়ে রেখেছিল। সেটা ধরেই এখন সে চলেছে। কিন্তু রাস্তাটা আর আগের মতো নেই, পিচ ঢেলে পাকা করে ফেলা হয়েছে। একান্ন বছর আগে এটার দু'ধারে ছিল ধু ধু কাঁকুরে মাঠ, সেখানে ঝোপঝাড় এবং আগাছার জঙ্গল। এখন জঙ্গল উধাও। দু'পাশেই অগুনতি বড় বড় বাড়ি, ফাঁকে ফাঁকে মন্দির।

সূর্য পশ্চিমদিকে উঁচু উঁচু বাড়িওলোর আড়ালে নেমে গেছে। ফিকে, মলিন যে লালচে আলোটুকু এখনও আকাশের গায়ে লেগে আছে, কয়েক মিনিটের মধ্যে তাও থাকবে না। ঝপ করে নেমে আসবে শীতের সন্ধে। তার আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। বেলা ফুরোতে না ফুরোতেই চারদিক মিহি হিম ঝরে চলেছে। উত্তুরে হাওয়ায় এখন ছুরির ধার, শরীরের খোলা জায়গাগুলোতে যেন কেটে কেটে বসে যাচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশের এই মফস্বল শহরে শীতের দিনটা কীভাবে ফুরিয়ে যাচ্ছে সেদিকে লক্ষ নেই আলতাফের। হঠাৎ সে টাঙ্গা-ওলাকে ডাকে, 'এ ভাইয়া —'

ধুসর কম্বলজড়ানো টাঙ্গাওলা ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'জি—'

আলতাফ জিজ্ঞেস করে, 'টাউনটা অনেক বদলে গেছে, না?'

'জি, হাঁ —'

হাত বাড়িয়ে রাস্তার দু'দিক দেখতে দেখতে আলতাফ জিজ্ঞেস করে, 'এক সময় ওখানে ফাঁকা জমিন ছিল।'

টাঙ্গাওলা লোকটা যথেষ্ট বিনয়ী। সওয়ারিকে ইজ্জৎ দিতে জানে। সামনের দিকে মুখ ফিরিয়ে জবাব দেয়, 'জি, হাঁ। এখন এই টৌনে দো অংলি (দু আঙুল) ফাঁকা জায়গা পাবেন না। প্রিফ মকান আউর মকান।' একটু থেমে বলে, 'আমার আঁখের সামনে টৌনটা কত বড় হয়ে গেল!' লোকটা খুব সম্ভব লেখাপড়া করেনি, টাউনকে বলে টৌন।

আলতাফ বলল, 'মানুষ বাড়লে টাউন তো বাড়বেই।'

'জি—'

যে-তেজি ঘোড়াটা টাঙ্গা টেনে নিয়ে চলেছে সেটার গলায় এক থোকা পেতলের ঘুন্টি বাঁধা। চলার তালে তালে সেগুলো থেকে মিঠে, সুরেলা আওয়াজ আসছে।

কাচের পাটাতনের ওপর পুরু চটের শক্ত, ঠাণ্ডা সিটে বসে আলতাফের মনে হল, আদ্যিকালের এই যানটা তাকে একান্ন বছর আগের পূর্বজন্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাজ্জবের ব্যাপার, যে ফতিমাকে দেখার জন্য সুদূর করাচি থেকে এতদূরে চলে এসেছে, তাকে সরিয়ে দিয়ে রামু, লছমন, বৈজু আর ধনুয়ার মুখ চোখের সামনে ফুটে উঠছে। আরও অনেকের কথাও মনে পড়ছে যাদের নাম সে ভুলে গেছে। এরা সবাই ছিল তার বন্ধু, খেলার সাথী, আজিমাবাদ প্রাইমারি স্কুলে তারা একই ক্লাসে পড়ত।

ধনুয়ার কথা ভাবতেই হঠাৎ মুখটা শক্ত হয়ে ওঠে আলতাফের। যতদূর মনে আছে, ওর বাবা লাজপত সিং এবং তার সঙ্গীরা দেশভাগের আগে আগে আজিমাবাদে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছিল। ছেলের বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও আলতাফেরা রেহাই পায়

নি, তাদের মকানেও ওরা আগুন লাগিয়েছিল। লাজপত সিং বেঁচে আছে কি না, কে জানে। থাকলে পাকিস্তান থেকে আজিমাবাদে তার আদমকা চলে আসাটা কীভাবে নেবে, কে জানে। ভেতরে ভেতরে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করে আলতাফ।

এতকাল পর জন্মভূমিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে নানা দিক থেকে উল্টোপাল্টা নানা ভাবনা তার মস্তিষ্কে হানা দিতে থাকে। একটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই আরেকটা এসে হাজির হয়। লাজপত সিংয়ের চিন্তাটা বেশিক্ষণ তাকে উদ্বেগের মধ্যে রাখে না। হঠাৎই দুই টাঙ্গাওলা ফকিরা আর হানিফের কথা মনে পড়ে যায়। ফকিরা ছিল বেজায় ভালমানুষ। সওয়ারি না পেলে মাঝে মাঝে আলতাফ এবং তার বন্ধুদের টাঙ্গায় তুলে আজিমাবাদের রাস্তায় রাস্তায় এক চক্কর ঘুরিয়ে আনত। কিন্তু ফকিরা ছিল দারুণ রগচটা আর খিটখিটে। তার মাথায় সারাক্ষণ খুন চড়ে থাকত যেন। নিজের টাঙ্গার ধারেকাছে আলতাফদের ঘেঁষতে দিত না। সামনে গেলে তোড়ে গালাগাল দিত। কিন্তু আলতাফ এবং তার বন্ধুরা ছিল নাছোড়বান্দা। ফকিরা সামনের দিকে তাকিয়ে হয়ত গাড়ি চালাচ্ছে, ওরা নিঃশব্দে টাঙ্গার পেছন দিকের পাটাতন ধরে ঝুলতে ঝুলতে যেত। কিন্তু ফকিরার ছিল দশ জোড়া চোখ। মুখ না ফিরিয়েও সব কিছু টের পেয়ে যেত সে। টাঙ্গা চালাতে চালাতে পেছন দিকে সে সমানে চাবুক হাঁকাত।

আলতাফ ডাকে, 'ভাইয়া—'

টাঙ্গাওলা তক্ষুনি সাড়া দেয়, 'জ্বি—'

'ফকিরা আর হানিফকে চেন? বেঁচে থাকলে তাদের উমর এখন অনেক।'

'তারা কারা?'

'বহুৎ সাল আগে এই টাউনে টাঙ্গা চালাত।'

টাঙ্গাওলা কিছুক্ষণ ভাবে। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায়। বলে, 'হাঁ হাঁ, ইয়াদ হ্যায়। পুরানা টৌলিতে হানিফ চাচা আর ফকিরা চাচা থাকে। লেকেন দশ বার সাল আগে দু'জনেই মারা গেছে।'

ছেলেবেলার পরিচিত দুটি মানুষের মৃত্যুসংবাদে মনটা খারাপ হয়ে যায় আলতাফের। তারা যখন পাকিস্তানে চলে গেল, হানিফ আর ফকিরা, দু'জনেরই বয়স ছিল চল্লিশের নীচে। দশ বারো বছর আগে তাদের মৃত্যু হলে কম করে ওরা চুয়াত্তর পঁচাত্তর বছর বেঁচে ছিল। আয়ুটা খুব কম নয়। বেশির ভাগ মানুষই এতদিন বাঁচে না। তবু সেই আমলের দুই টাঙ্গাওলার জন্য বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে ওঠে।

আজিমাবাদ শহরটার মাঝখান দিয়ে ছোট একটা নদী বয়ে গেছে। নাম মোতিয়া। সেখানে এসে অবাক হয়ে যায় আলতাফ। তার ছেলেবেলায় নদীর ওপর একটা মজবুত কাঠের পুল ছিল। সেটা শহরের দুই অংশকে জুড়ে রেখেছিল। মানুষজন, টাঙ্গা, সাইকেলরিকশা, গোয়া কি ভৈসা গাড়ি, সামান্য দু-চারটে মোটর ওটা দিয়েই এপার ওপার করত। কিন্তু সেই পুরনো পুলটার এক টুকরো কাঠও এখন খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই জায়গায় উঠেছে কংক্রিটের তিনগুণ চওড়া পুল। সেটার দু'ধারে ফুটপাত এবং সারি সারি ল্যাম্পপোস্ট।

পুল পেরুতে পেরুতে আলতাফ বলে, 'আচ্ছা ভাই, পুরনো পুল ভেঙে এখানে ব্রিজ কবে বানানো হয়েছে?'

টাঙ্গাওলা বলে, 'করীব তিশ পয়তিশ সাল।'

আলতাফ আর কোনও প্রশ্ন করে না। অসীম আগ্রহে পুলটা দেখতে থাকে। আজিমাবাদ শহরে তার ছেলেবেলার অনেক কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

টাঙ্গাওলা ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'এক বাত পুছুঙ্গা?'

সামান্য চমকে উঠে আলতাফ বলে, 'হাঁ হাঁ, পুছো না —'

'আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, বহুৎ সাল বাদ আপনি এই টৌনে এলেন?'

'হাঁ।'

'আপনি কি এখানে থাকতেন?'

'হাঁ।'

'এখন কোথায় থাকেন?'

টাঙ্গাওলার কৌতূহলটা খুবই নিরীহ ধরনের। যে-প্রশ্নটা সে করেছে তার ভেতর সন্দেহজনক কিছু নেই। তবু চকিত হয়ে ওঠে আলতাফ। করাচি থেকে আসার সময় পড়শিরা বার বার তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। সে যে পাকিস্তানি, এটা পারতপক্ষে কাউকে যেন না জানায়।

আলতাফ মুহূর্তে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। ন' বছর বয়স পর্যন্ত সে ইন্ডিয়ায় ছিল। তার মধ্যে একবার আগ্রা এবং দিল্লি যাওয়া ছাড়া আজিমাবাদের বাইরে কখনও পা ফেলেনি। করাচিতে যাবার পর এ দেশের সঙ্গে যে সম্পর্কটুকু ছিল, চিরকালের মতো তা ছিন্ন হয়ে যায়। এখানকার কিছুই সে প্রায় জানে না। কয়েকটা বড় বড় শহরের নাম অবশ্য শুনেছে। দিল্লিতে তো ছেলেবেলায় গিয়েছিলই, এবার পাকিস্তান থেকে আসার সময় সেখানে নেমেছেও। দিল্লি বাদ দিলে কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ, কটক, বাঙ্গালোর ইত্যাদি নামগুলোও তার জানা। প্রায় মরিয়া হয়েই আলতাফ বলে, 'কলকাত্তায় থাকি।' টাঙ্গাওলা যাতে কোনওরকম সন্দেহ না করে, সে জন্য প্রাণপণে নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করছে।



টাঙ্গাওলা বলে, 'কলকাত্তা তো খুব বেশি দূরে নয়। তবু এত সাল বাদে এলেন!' গলা শুনে বোঝা যায়, সে বেশ একটু অবাকই হয়েছে।

হঠাৎ আলতাফের মনে হল, লোকটা খুব গায়ে-পড়া। যেভাবে ভকিলদের মতো জেরা শুরু করেছে তাতে অসাবধানে ওর কোন প্রশ্নের কী জবাব দেবে, এবং তার ফলে কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হবে, কে জানে। লোকটাকে এখনই থামিয়ে দেওয়া দরকার। নিস্পৃহ সুরে আলতাফ বলল, 'কামকাজ নিয়ে এত ঝামেলায় থাকতে হয়, তাই —' শেষ না করেই সে থেমে যায়।

টাঙ্গাওলা এবার আন্তরিক গলায় জিজ্ঞেস করে, 'এগানে আপনার কে কে আছে— পিতাজি, মাতাজি, কোই রিস্তেদার?'

মা, বাবা বা অন্য কোনও আত্মীয়স্বজন আজিমাবাদে থাকে কি না সেটাই টাঙ্গাওলার জিজ্ঞাস্য। সঠিক জবাব দিতে হলে অনেক কথা এসে পড়বে যা আলতাফের পক্ষে আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। সে অস্পষ্টভাবে, নিচু গলায় কিছু একটা বলে যা প্রায় বোঝাই যায় না।

টাঙ্গাওলা আন্দাজ করে নেয়, তার এই প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া যাবে না। সে আর কিছু বলে না।

পুল পেরিয়ে ওপারে চলে আসে টাঙ্গাটা। নদীর এপারে রাস্তার দু'ধারে আজিমাবাদের সবচেয়ে বনেদি এলাকা। বিশাল বিশাল কমপাউন্ডের ভেতর পুরনো আমলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাভেলি, যেগুলোর সামনের দিকে ফুলের বাগান, লন, নুড়ির রাস্তা। পঞ্চাশ বছর আগে প্রতিটি বাড়িতেই ছিল তেল চুকচুকে, স্বাস্থ্যবান ঘোড়ায় টানা ফিটন। কচিৎ কোনও হাভেলিতে মোটর চোখে পড়ত।

একমাত্র জানকীনাথজি ছাড়া এই সব বাড়ি কাদের ছিল, এতকাল পর আর মনে পড়ে না। জানকীনাথজির নাম ভুলে না যাবার কারণ, দেশভাগের দু'বছর আগে তাঁর হাভেলিতে ডিস্ট্রিক্ট টাউন থেকে ইংরেজ ডি.এম. এসেছিলেন। আববাজানের কাছে আলতাফ শুনেছে, গোরা সাহেব নাকি ছিলেন মস্ত অফিসার। এত বড় অফিসার নাকি আগে আর কখনও আজিমাবাদে আসেননি।

শান্ত, নগণ্য, ম্যাড়মেড়ে টাউনটায় একেবারে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সে যে কী চাঞ্চল্য, বলে বোঝানো যাবে না।

জানকীনাথজি স্বয়ং দামি কোট প্যান্ট পরে, মাথায় পাঁচ গজি কাপড়ের পাগড়ি বেঁধে, আজিমাবাদের মান্যগণ্য লোকেদের নিয়ে সোজা স্টেশনে চলে গিয়েছিলেন। শুধু তাই না, এই শহরের ধুলো যাতে ডি.এমের জুতোয় না লাগে সেজন্য পুরো প্ল্যাটফর্ম এবং নীচের রাস্তায় নামার সিঁড়িগুলো পর্যন্ত জুটের তৈরি লাল কার্পেট দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন। এমন একটা ঐতিহাসিক ঘটনাকে আজিমাবাদের মানুষজনের স্মৃতিতে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য ইলাহাবাদ থেকে চারটে ব্যান্ড পার্টি আনিয়েছিলেন জানকীনাথজি। আববাজান আরও জানিয়েছিল, ব্যান্ড পার্টিই না, ডি.এমের খানাপিনার জন্য ইলাহাবাদের নাম-করা হোটেল থেকে বাবুর্চিও আনা হয়েছে।

মনে পড়ে, ছ'টা ঘোড়ায় টানা একটা হুড-খোলা গাড়িতে করে ডি.এম-কে নিজের হাভেলিতে নিয়ে গিয়েছিলেন জানকীনাথজি। জমকালো উর্দি-পরা এক বেয়ারা গাড়ির পেছন দিকের স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ ডি.এমের মাথার ওপর রঙিন সিল্কের ছত্রি ধরে রেখেছিল।

দৃশ্যটা এখনও মনে আছে আলতাফের। কেননা, সে আমলে কোনও ছোট শহরে ইংরেজ ডি.এমের আগমন একটা বিরাট ঘটনা। আজিমাবাদের লোকজন তাঁকে চোখে দেখার জন্য রাস্তার দু'ধারে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আলতাফের আববুও তাকে নিয়ে ছুটে গিয়েছিল।

প্রথমে ছিল দুটো ব্যান্ড পার্টি। তারপর গাইড হিসাবে জানকীনাথজির ফিটন, মাঝখানে ডি.এমের গাড়ি, তার পেছনে আজিমাবাদের বিশিষ্ট নাগরিকেরা। এই জমকালো শোভাযাত্রার একেবারে ল্যাজের দিকে বাকি দুটো ব্যান্ড পার্টি।

সেই যে ডি.এম এসেছিলেন তার তিন মাসের মধ্যে রায়বাহাদুর খেতাব পেয়েছেন জানকীনাথজি। এক দিন রাত্তিরে বাড়ি ফিরে বেশ গর্বের সুরে, উত্তেজিত ভঙ্গিতে খবরটা দিয়েছিল আববু। আজিমাবাদে এর আগে আর কেউ নাকি রায়বাহাদুর হননি। এই খেতাবটার ওজন কতটা, কতখানি ইজ্জৎ এর সঙ্গে জড়িত, ছেলেবেলায় বুঝতে পারেনি আলতাফ। তবে মনে হয়েছিল, এটা বিরাট ব্যাপার।

জানকীনাথজি কি এখনও বেঁচে আছেন? টাঙ্গাওলাকে প্রশ্নটা করতে গিয়েও থেমে গেল আলতাফ। কেননা এ নিয়ে কৌতূহল দেখালে পাল্টা অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, যা তার পক্ষে অস্বস্তিকর।

বনেদি এলাকাটা মোটামুটি আগের মতোই আছে। তবে তার জেল্লা বহুগুণ বেড়ে গেছে।

কখন সন্ধে নেমে গিয়েছিল, খেয়াল করেনি আলতাফ। দু'ধারের বাড়িগুলোতে এবং রাস্তার সারি সারি ল্যাম্পপোস্টে আলো জ্বলে উঠেছে। হিম আরও ঘন হতে শুরু করেছে।

এক সময় আজিমাবাদের উত্তর দিকের শেষ মাথায় উঁচা মহল্লায় পৌঁছে গেল আলতাফরা। অনেকটা জায়গা জুড়ে এই এলাকা। এটার একদিকে মুসলমানদের বসতি, আরেক দিকে থাকত হিন্দুরা।

মহল্লাটা পঞ্চাশ বছর আগের মতোই রয়ে গেছে। তাই চিনতে অসুবিধা হল না। সুটকেস আর হোল্ডঅল নিয়ে টাঙ্গা থেকে নেমে পড়ল আলতাফ। টাঙ্গাওলাকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে চারদিক ভাল করে লক্ষ করতে লাগল।

পুরো এলাকাটা জুড়েই ছিরিছাঁদহীন বাড়ির জটলা। হিন্দুদের টোলটার তুলনায় মুসলমানদের টোলটা অনেক বেশি ম্যাড়মেড়ে।

এই শীতের সন্ধ্যাতেও রাস্তায় বেশ লোকজন রয়েছে। আলতাফের মনে আছে, ফতিমার শ্বশুরবাড়িটা খুব কাছাকাছিই। বড় রাস্তা থেকে মিনিট পাঁচেক হাঁটলে সেখানে পৌঁছনো যায়। এই মহল্লাতেই, আরও অনেকটা ভেতর দিকে ছিল তাঁদেরও বাড়ি।

অনেকগুলো সরু সরু গলি মুসলিমদের টোলাটায় ঢুকে গেছে। কোনটা দিয়ে ঢুকলে ফতিমাদের বাড়িতে যাওয়া যাবে, এতকাল বাদে চট করে খেয়াল করতে পারল না আলতাফ। তার জিজাজি অর্থাৎ ফতিমার স্বামীর নাম ছিল জিয়াউল খান। তার নাম বললে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ ওদের বাড়িটা দেখিয়ে দেবে। রাস্তার একটা লোককে ডাকতে যাচ্ছিল সে, তার আগেই বাঁ ধারের গলিটা থেকে দু'জন বেরিয়ে এল। একজন তারই বয়সী। ভারী চেহারা, মাঝারি ধরনের লম্বা, মোটা গোঁফ, পরনে ধুতি আর ফুলসার্টের ওপর গরম চাদর, মাথায় কম্ফোর্টার জড়ানো। বোঝা যায় লোকটা হিন্দু। তার সঙ্গীর বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। পাতলা রোগা চেহারা, লম্বাটে মুখ, বড় বড় চোখ, চোখা নাক, সযত্নে ছাঁটা দাড়ি। পরনে পাজামা আর লম্বা ঝুলের কুর্তার ওপর মোটা উলের সোয়েটার, মাথায় গোল টুপি। আন্দাজ করা যায়, সে মুসলমান।

লোক দুটো সোজা আলতাফের সামনে চলে আসে। বয়স্ক ভারী লোকটি অর্থাৎ যে হিন্দু একদৃষ্টে তার দিকে কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'আপ কিয়া আলতাফ হোসেন হ্যায়?'

আলতাফ অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে বলে, 'জি, হাঁ। লেকেন আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।'

লোকটা আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে, 'উল্লু, পাঠঠে, আমি ধন্নো রে — ধনুয়া —'

ছেলেবেলায় রোগা দুবলা চেহারা ছিল ধনুয়ার। সে যে একান্ন বছরে শরীরে এত বিপুল পরিমাণে মাংস আর চর্বি জমিয়ে ফেলেছে, কে ভাবতে পেরেছিল। সেদিনের সেই বালকটির সঙ্গে আজকের মধ্য বয়স পেরিয়ে যাওয়া ধনুয়ার বিন্দুমাত্র মিল নেই। তবে একটা ব্যাপার সেদিনের মতোই আছে। আনন্দ বা দুঃখের প্রকাশটা তার তীব্র। চিৎকার করে ছাড়া কথা বলতে পারে না। সমস্ত কিছু ধনুয়ার চড়া তারে বাঁধা।

অল্প বয়সের বন্ধুর সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে যাবে, ভাবতে পারেনি আলতাফ। ধনুয়ার আন্তরিকতাটুকু তার খুব ভাল লাগে। সে যেন এক লহমায় তাকে তার বচপনে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। আলতাফ দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'কত সাল বাদে তোর সঙ্গে দেখা হল ধন্নো!'

'হাঁ। বহুৎ সাল।' ধনুয়া, অর্থাৎ ধনপত বলে, 'কত উমর হয়ে গেল! এই জিন্দেগিতে ফের যে তোকে দেখতে পাব, কে জানত!'

একটু চুপ।

তারপর ধনপত পাশের যুবকটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'একে জরুর চিনতে পারিসনি। ও হল লতিফ, ফতিমা বহিনের ছোট বেটা, তোর ছোট ভাঞ্জা —'

দেশভাগের পর আলতাফরা যখন পাকিস্তানে চলে যায়, লতিফের জন্ম হয়নি। জীবনের লম্বা বাজি যখন শেষ হতে চলেছে, হঠাৎ ইন্ডিয়ায় না এলে বোনের এই ছেলেটার সঙ্গে তার পরিচয়ই হত না।

লতিফ ঝুঁকে মামার পা ছুঁতে যাচ্ছিল, তাকে তুলে বুকের ভেতর টেনে নেয় আলতাফ। বলে, 'বেটা, তোমার উমর শও সাল হোক।'

কিছুক্ষণ পর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে লতিফ আলতাফের সুটকেসটা তুলে নেয়, আর ধনপত নেয় তার হোল্ড-অলটা। আলতাফ আপত্তি করতে যাচ্ছিল, ধনপত ধমকে ওঠে, 'উল্লু, তুই হলি ইন্ডিয়ার মেহমান। থোড়া কুছ খাতিরদারি তো করতে দে। চল —'

সামনের গলিটায় তারা ঢুকে পড়ে। আগে আগে চলেছে লতিফ। পেছনে পাশাপাশি হাঁটছে আলতাফ আর ধনপত।

ধনপত বলে, 'ফতিমা বহিনকে যে চিঠিটি লিখেছিলি সেটা পাওয়ার পর রোজ লতিফ আর আমি স্টেশনে দু'তিন বার করে যাচ্ছি। লেকেন ইলাহাবাদ থেকে দিনে সাত আটটা ট্রেন এখানে আসে। কোন ট্রেনে আসবি বুঝতে পারছিলাম না। এখনও দু'জনে যাচ্ছিলাম, চোখে পড়ল তুই টাঙ্গা থেকে নামছিস। কবে আসবি চিঠ্‌ঠিতে লিখে জানাবি তো —'

আলতাফ বলল, 'আজমীড় শরিফে ক'রোজ লাগবে, বুঝতে পারছিলাম না। ওখান থেকে কোন তারিখে আজিমাবাদে আসতে পারব, কী করে জানাই?'

আস্তে মাথা নাড়ে ধনপত, 'ঠিক বাত।'

আলতাফ জিজ্ঞেস করে, 'তোর মতো আমার চেহারাও



বিলকুল বদলে গেছে। এত সাল বাদ চিনলি কী করে?'

'চিনিনি তো। ক্রিফ আন্দাজ করেছিলাম।' ধনপত তোড়ে বলে যায়, আজিমাবাদের সব মানুষই তার চেনা। যে কোনও দিন যে কোনও সময় আলতাফের এসে পড়ার সম্ভাবনা। টাঙ্গা থেকে বয়স্ক একটি লোককে নামতে দেখে ধনপতের মনে হয়েছিল তার আলতাফ হোসেন হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা আশি ভাগ।

আলতাফ সামান্য হাসল।

ধনপত এবার বলে,' তোর খবর বল। পাকিস্তানে কী কামকাজ করছিস? ছেলেমেয়ে ক'টা? তোর বিবি —'

বন্ধুকে থামিয়ে দিয়ে আলতাফ বলে, 'আমার কথা পরে শুনিস। আগে তোর কথা বল —'

শুধু নিজের কথাই না, তড়বড় করে দু'মিনিটের ভেতর আজিমাবাদ টাউনের নানা তথ্য জানিয়ে দেয় ধনপত। আলতাফরা চলে যাবার পর খুব বেশি পড়াশোনা এগোয়নি তার। এইট ক্লাসে দু'বার ফেল করে স্কুল ছেড়ে দেয় সে। ক'টা বছর বেকার আড্ডা দিয়ে, এখানে সেখানে উদ্দেশ্যহীন চরে বেড়াবার পর পিতাজির দাবড়ানিতে এটা সেটা করে শেষ পর্যন্ত মোটর মেকানিকের কাজ শিখে একটা গ্যারাজ খুলেছে। রোজগার ভালই। তার এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে বি.এ. পাশ করে সরকারি নৌকরি করে। থাকে লখউতে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তার শ্বশুরবাড়ি ইলাহাবাদে। সংসারে বড় রকমের সমস্যা নেই। তবে স্ত্রী এবং পিতাজির স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা আছে। দু'জনেই কোনও না কোনও রোগে ভুগছে।

বহুকাল পর ছেলেবেলার বন্ধুকে দেখে, তার সহৃদয় ব্যবহারে আলতাফ এতটাই অভিভূত যে ধনপতের পিতাজি যে রাজপুত ক্ষত্রিয় লাজপত সিং এবং সেই লোকটা স্বাধীনতার আগে আগে দাঙ্গার সময় তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, সেটা খেয়াল থাকে না। তারা যে পাকিস্তানে চলে গেছে তার একটা বড় কারণ লাজপতের মতো আজিমাবাদের বেশ কিছু মানুষ। মুসলমানদের প্রতি তাদের প্রচণ্ড ঘৃণা আর ক্রোধ। দাঙ্গার সময় যে হিংস্র, মারাত্মক চেহারা তাদের দেখা গিয়েছিল, সেটা তার স্মৃতিতে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। সেদিন মনে হয়েছিল ওরা তাদের ছিঁড়ে খাবে। খোদা মেহেরবান, তাই কোনও রকমে বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু করাচিতে যাবার পরও বহুদিন আতঙ্ক কাটেনি।

লাজপত সিং যে এখনও বেঁচে আছে, এই খবরটা আলতাফকে চকিত করে তোলে। অদ্ভুত চাপা ভয় তার বুকে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।

ধনপত তার দিকে তাকাচ্ছে না। একটানা বলে যাচ্ছে। সে আমলের মান্যগণ্য লোকেদের মধ্যে কেউ আর বেঁচে নেই। রায়বাহাদুর জানকীনাথজি, বড় কারবারি মহাবীরপ্রসাদ শ্রীবাস্তব, সরকারি ভকিল বাবুরাম গুপ্তা, এ রকম সবারই মৃত্যু হয়েছে। আলতাফের বচপনের ঘনিষ্ঠ দোস্তরা সবাই জীবিত। রামু ঠিকাদারি করে এখন ক্রোড়পতি। লখউতে বিরাট হাভেলি বানিয়ে সেখানেই থাকে। এক সাল দু'সাল বাদে আজিমাবাদে এসে হয়ত এক আধ সপ্তাহ কাটিয়ে যায়। লছমন বি.এসসি পাশ করে একটা নাম-করা ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে দিল্লি চলে গেছে। বৈজু অবশ্য আজিমাবাদেই আছে। মোতিয়া নদীর ধারে ওদের ধান চাল গেঁহু তিল তিসি সর্ষের অনেকগুলো আড়ত। আড়তদারি বৈজুদের পারিবারিক ব্যবসা, সেটাই এখন দেখাশোনা করে সে।

ধনপত আরও জানায়, জমানা একেবারে বদলে গেছে। সেই দাঙ্গার সময়টা ছাড়া আজিমাবাদে বহুদিন কোনও হাঙ্গামা হয়নি। শহরটা ছিল খুবই শান্ত, উত্তেজনাহীন। জীবনের স্রোত এখানে ঢিমে তালে বয়ে যেত। কিন্তু ক'বছর ধরে খুনখারাপি, রাহাজানি, ব্যাঙ্কডাকাতি অনেক বেড়ে গেছে। এর জন্য অনেকটাই দায়ী স্বাধীনতার পরবর্তী কালের রাজনৈতিক নেতারা। তারা গুন্ডা বন্দুকবাজ খুনিদের আশ্রয়দাতা। ক্ষমতা দখলের জন্য এদের কাজে লাগায়। ভোটের সময় এই সব হারামজাদাদের দিয়ে জালি ভোট দেওয়ায়, পিস্তল দেখিয়ে বোমা ফাটিয়ে আসল ভোটারদের বুথে ঘেঁষতে দেয় না। যারা তাদের এম.এল.এ বা এম.পি. বানাবে তারা মার্ডার করুক, ডাকাতি করুক, লিডাররা একটা অংলি তুলবে না। পুলিশ যদি তাদের পোষা খুনী বা গুন্ডাদের ধরে, থানায় ফোন করে তক্ষুনি ছাড়িয়ে আনবে। লিডাররা এদের হাতে যা খুশি করার লাইসেন্স তুলে দিয়েছে।

ধনপতের একটানা বকবকানির মধ্যে একসময় ফতিমার শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে যায় আলতাফরা।

পুরনো ধাঁচের দোতলা বাড়ি। সদর দরজা পেরিয়ে শান-বাঁধানো চবুতরা। একধারে গোসলখানা, রসুইঘর। চবুতরটার তিন দিক ঘিরে একতলা এবং দোতলায় অনেকগুলো ঘর।

আলতাফের স্মৃতিতে বাড়িটা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। এখন সব মনে পড়ে গেল। ফতিমার শাদির আগে আগে তার শ্বশুর এটা তৈরি করিয়েছিল। বাড়িটার রং ছিল গোলাপি, দরজা জানালা সবুজ। নতুন বাড়ির চেহারায় একটা ঝকঝকে ভাব থাকে। বড়ি বহিনের শাদির পর মাঝে মাঝে যখন সে এখানে আসত, কী ভাল যে লাগত! কিন্তু সাবেক সেই বাড়িটা ঠিকঠাক আগের মতো নেই। দেওয়ালের নানা জায়গায় পলেস্তারা খসে নোনা-লাগা ইট বেরিয়ে পড়েছে, ছাদের কার্নিস ভাঙা, সেখানে বটের চারা মাথা তুলে আছে। সামনের চবুতরটায় কত যে গর্ত! অনেকদিন বাড়িটা সারানো হয়নি। ওটার আয়ু বেশিদিন নেই। বড় জোর আর দশ বার বছর।

ঘরে ঘরে আলো জ্বলছিল। চবুতর পেরিয়ে ওরা মূল বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

চারদিক আশ্চর্য রকমের নিঝুম। আগে এ বাড়িতে কত যে মানুষ ছিল! সারাক্ষণ হইচই, বাচ্চাদের হুটোপাটি। একতলা থেকে ছাদ পর্যন্ত গম গম করত।

এখন তারা তিনজন ছাড়া অন্য কেউ নেই। রসুইঘর থেকে ছ্যাঁকছোঁক আওয়াজ আসছে। রান্নাটান্না চলছে সেখানে।

ভেতরে বেশ চওড়া একটা প্যাসেজ। সেটার বাঁ দিকে পর পর তিনটে ঘর। ডান পাশে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। সেগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে এবড়ো খেবড়ো হয়ে গেছে। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে লতিফের পিছু পিছু ওপরে উঠতে উঠতে হঠাৎ বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যেতে থাকে আলতাফের। কতকাল বাদে ফতিমার সঙ্গে তার দেখা হতে চলেছে! সেই ন'বছর বয়সে পাকিস্তানে চলে যাবার আগে শেষ এ বাড়িতে এসেছিল। তারপর এই। মাঝখানে লম্বা একান্নটা বছর।

লতিফ তাকে এবং ধনপতকে একটা বিশাল ঘরে নিয়ে এল। আলতাফ জানে এটা ছিল ফতিমা এবং তার স্বামী শেখ জিয়াউলের শোবার ঘর।

দু'ধারের দেওয়ালে দুটো চড়া পাওয়ারের আলো জ্বলছিল। আলতাফের যতদূর মনে আছে, ঘরের সাজসজ্জায় বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি। আগের মতোই দেওয়াল ঘেঁষে তিন চারটে ভারী আলমারি, সেকেলে ডিজাইনের ড্রেসিং টেবল, কয়েকটা কুশন, দুটো চেয়ার ইত্যাদি। ঠিক মাঝখানে কারুকাজ-করা প্রকাণ্ড খাট, সেটার পাশে ছোট ছোট তিন চারটে নিচু সাইড টেবল। একটু দূরে একটা উঁচু স্ট্যান্ডে টিভি।

আসবাবগুলো কালচে, ম্যাড়মেড়ে। পুরু হয়ে সেগুলোর ওপর ময়লা জমেছে। বোঝা যায়, বহুকাল পালিশ টালিশ করানো হয়নি।

খাটের মাঝখানে একফুট পুরু গদির ওপর আধময়লা বিছানায়, কম্বল গায়ে শুয়ে আছে একজন বয়স্কা মহিলা। ভাঙা-চোরা শীর্ণ মুখ, ধবধবে সাদা চুল, চওড়া কপাল, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। তিনজনকে দেখে পাশ ফিরে হাতড়ে হাতড়ে বালিশের পাশ থেকে চশমা খুঁজে নিয়ে চোখে লাগাতে লাগাতে ক্ষীণ গলায় বলে, 'ধন্নো আর লতি এসেছিস!' বোঝা যায় লতিফের ডাকনাম লতি।

লতিফ বলে, 'হাঁ আম্মি।'

চশমা পরা হয়ে গিয়েছিল। মহিলা, অর্থাৎ ফতিমা জিজ্ঞেস করে, 'তোদের সঙ্গে আরেক জনকে দেখছি। কে?'

ধনপত সামান্য মজার গলায় বলে, 'বড়ি বহিন, তুমিই বল তো কে? চিনতে পারছ?'

ফতিমা হাতের ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসে। তার নজর আলতাফের মুখের ওপর কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকে। একাগ্রভাবে কী যেন খোঁজে সে তারপর শ্বাসটানা গলায় বলে, 'ও কি মুন্না? তার তো পাকিস্তান থেকে আসার কথা আছে।'

কত বছর বাদে নিজের ডাকনামটা শুনল আলতাফ! মা-বাবার মৃত্যুর পর এই নাম আর কারও মুখে শোনেনি। না শুনে শুনে ওটা ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু ফতিমা ঠিক মনে করে রেখেছে।

আলতাফ একদৃষ্টে ফতিমার দিকে তাকিয়ে ছিল। এ কাকে দেখছে সে। ইন্ডিয়া থেকে চলে যাবার সময় তাদের মালপত্রের মধ্যে একটা অ্যালবামও ছিল। সেটাতে আটকানো ছিল ফতিমার শাদির সময়কার কিছু ফোটো। তার এই বোনটিকে স্বপ্নের পরমাশ্চর্য কোনও ছবি বলে মনে হত। আর সামনের এই বৃদ্ধ, শয্যাশায়ী, রুগ্‌ণ মহিলাটি যেন ধ্বংসস্তূপ।

একই মা-বাবার খুন তাদের দু'জনের ধমনীতে বয়ে চলেছে, কিন্তু কত অচেনা এই মহিলা। তাদের একজন পাকিস্তানি, আরেকজন ইন্ডিয়ান। তাদের মাঝখানে একান্ন বছরের ব্যবধানই শুধু নয়, রয়েছে সীমান্তের দুর্ভেদ্য দিওয়ার।

জরাজীর্ণ মহিলাটিকে দেখতে দেখতে মনে হল হঠাৎ তীব্র আবেগে কলিজা উথালপাথল হয়ে যাচ্ছে। হৃৎপিণ্ডের অতল স্তর থেকে কান্নার মতো কিছু উঠে এসে গলার কাছে ডেলা পাকিয়ে যাচ্ছে। শ্বাসপ্রশ্বাস আটকে আটকে আসছে। বুঝিবা কোনও অলৌকিক প্রক্রিয়ায় সে দেশকালের দূরত্ব পেরিয়ে আরও একবার তার ছেলেবেলায় ফিরে গেল।

কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল আলতাফ, প্রথমটা পারল না। গলা বুজে গেছে। প্রায় ছুটে এসে ফতিমার পাশে বসে স্বরটাকে অনেক কষ্টে মুক্ত করতে পারল সে, 'আপা, আমি তোমার মুন্নাই'

কাঁপা কাঁপা রোগা দুই হাতে আলতাফের মাথাটা আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে ফতিমা। ঝাপসা গলায় বলে, 'এত কাল পর আমার কথা তোর মনে পড়ল! উমর শেষ হয়ে এসেছে। আর কিছুদিন পরে এলে দেখা হত না। মাটির নীচে চলে যেতাম।' উতরোল কান্নায় তার শরীর দুমড়ে মুচড়ে যেতে থাকে।

ফতিমার আবেগ আলতাফের মধ্যেও চারিয়ে গিয়েছিল। মাঝখানের একান্নটা বছরে তার ওপর দিয়ে কম ঝড় বয়ে যায়নি। দাঙ্গা, খুন, আগুন, দেশভাগ, ইন্ডিয়া থেকে চলে যাওয়া, পাকিস্তানে যাবার পর বেঁচে থাকার জন্য একটানা লড়াই — সব মিলিয়ে তাকে কঠোর, রুক্ষ, কর্কশ করে তুলেছে। সহজে সে কাঁদে না। কিন্তু এই মুহূর্তে আলতাফ টের পেল তার দু'চোখ



জলে ভরে গেছে। ধরা ধরা, ভাঙা গলায় সে বলে, 'রো মাত আপা, রো মাত —'

কিন্তু কান্না থামে না ফতিমার, বরং আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর ফতিমা খানিকটা শান্ত হলে ভাইয়ের গলা থেকে হাত নামিয়ে নেয়। কান্নার ধকলে জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল তার। আলতাফ বলে, 'তোমার খুব তখলিফ হচ্ছে আপা। শুয়ে পড় —'

ফতিমা কিছুতেই শোবে না। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'এত সাল বাদে তোকে দেখলাম। আমি শুয়ে থাকব!'

'আমি তো তোমার পাশেই বসে আছি। শুয়ে শুয়ে কথা বল।' পরম মমতায় বড় বোনের কাঁধ ধরে তাকে ধীরে ধীরে বিছানায় শুইয়ে দেয় আলতাফ। ফতিমার একটা রুগ্‌ণ হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, ' তোমার শরীরের এই হাল হল কী করে?'

এই প্রশ্নটার উত্তরে লতিফ জানায়, তিন বছর আগে ফতিমার একটা স্ট্রোক হয়েছিল। তার ওপর লিভারের দোষ, হাঁফানি। মায়ের অশক্ত শরীরে কত রকমের রোগ যে কায়েম হয়ে বসে আছে তার হিসাব নেই।

লতিফের পাশ থেকে ধনপত বলে ওঠে, 'ওই দিকে দ্যাখ' — বলে খাটের পাশে একটা টেবিল দেখিয়ে দেয়। সেটার ওপর রয়েছে নানা ধরনের ওষুধের শিশিবোতল। ক্যাপসিউল আর ট্যাবলেটের অগুনতি মোড়ক।

ধনপত বলে যায়, 'বড়ি বহিন ডাক্তার আর দাওয়ার ওপর বেঁচে আছে।'

বিষণ্ণভাবে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে আলতাফ। উত্তর দেয় না।

ধনপত এবার বলে, 'আলতাফ, আমি এখন আর থাকতে পারছি না। একবার গ্যারেজে যেতে হবে। কাল সুবে সুবে চলে আসব।' ফতিমাকে বলল, 'চলি বড়ি বহিন। ভাইকে এত সাল বাদে পেয়েছ। আর কান্নাকাটি করো না। শরীর খারাপ হবে।'

ধনপত বেরিয়ে যাবার পর আলতাফ জিজ্ঞেস করে, 'ধান্নো কি এ বাড়িতে রোজই আসে?'

লতিফ বলে, 'রোজ না। সপ্তাহে দু'দিন জরুর আসে। আমাদের খোঁজখবর নিয়ে যায়। দেখভাল করে।'

ফতিমা বলে, 'আমার যেবার কলিজার ব্যারাম হল, ধান্নো হাসপাতালে নিয়ে গেল। তিন রোজ বেহোঁশ হয়ে ছিলাম। দিন রাত ও সেখানে পড়ে থাকত। লতিফের কারবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কত যে উপকার করে, বলে বোঝাতে পারব না। ধান্নো আমাদের বড় ভরসা। ওর মতো আদমি হয় না।'

আলতাফ অবাক হয়ে যায়। যে লাজপত সিং আজিমাবাদে দাঙ্গা বাধিয়েছে, তাদের বাড়িতে আগুন ধরিয়েছে, তার ছেলে কিনা ফতিমাদের ভরসা! আলতাফ কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে ফতিমা বলল, 'বহুৎ দূর থেকে ট্রেনে করে এসেছিস, জরুর থকে গেছিস। এখন আর কথা নয়। হাতমুখ ধুয়ে, নোংরা জামাকাপড় বদলে এখানে আয়। আমার কাছে বসে চা খাবি।' লতিফকে বলল, 'মামার ঘরের বিছানা পাতা আছে তো?'

লতিফ মাথা হেলিয়ে দেয়, 'হাঁ'।

'বানোকে বলে আয়, গোসলখানায় গরম পানি দিয়ে চা আর পুরি বানিয়ে ওপরে নিয়ে আসে। মিঠাইও দিতে বলবি।'

বানোকে আলতাফ জানে না। এ নিয়ে সে কোনও প্রশ্ন করল না। এ বাড়িতে যখন এসেছে, নিশ্চয়ই বানোর পরিচয় জানতে পারবে।

লতিফ ঘর থেকে বেরিয়ে মিনিটখানেকের মধ্যে ফিরে আসে।

ফতিমা ছেলেকে বলে, 'মামাকে ওর ঘরে নিয়ে যা। ওকে নয়া সাবান, আর তোয়ালে দিবি। গোসলখানাটা দেখিয়ে দিস।'

দুই হাতে আলতাফের সুটকেস আর হোল্ডঅল তুলে নিয়ে লতিফ তাকে ডানপাশের ঘরটায় নিয়ে যায়। তারপর মালপত্র মেঝেতে নামিয়ে আলো জ্বালিয়ে দেয়।

ফতিমার মতো না হলেও এই ঘরটাও বেশ বড়। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এক ধারে ভারী খাটে ধবধবে বিছানা ছাড়াও রয়েছে আলমারি, গদি-মোড়া ক'টা কুশন, দেওয়াল-আয়না, টেবিল চেয়ার ইত্যাদি।

লতিফ বলল, 'এটা আপনার ঘর।'

আলতাফ আন্দাজ করল, সে আসবে বলে ঘরটা ফিটফাট করে রাখা হয়েছে। একটা চেয়ারে বসে জুতো মোজা খুলে এক পাশে রাখল সে। তারপর সুটকেশ খুলে ঘরে পরার পাজামা, শার্ট বার করতে করতে নতুন করে তার খেয়াল হল, বাড়িটা বড় বেশি নিঝুম। এখন পর্যন্ত লতিফ আর ফতিমা ছাড়া অন্য কাউকে সে দেখেনি। তবে বানো নামে কেউ একজন আছে, তার পরিচয়টা আলতাফের অজানা।

দেশভাগের পর বেশ কিছুদিন ফতিমাদের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। তারপর সেটা অনিয়মিত হতে হতে বন্ধ হয়ে যায়। তার মধ্যেই জানা গিয়েছিল, ফতিমার দুই ছেলে, দুই মেয়ে। অবশ্য আলতাফরা ইন্ডিয়ায় থাকতে থাকতেই প্রথম ছেলে নিয়াজের জন্ম হয়েছিল। পরে আর তিনটি সন্তান জন্মায়। ফতিমার

শ্বশুর শেখ বদরুদ্দিনের মৃত্যুর খবরও চিঠিতেই পেয়েছিল আলতাফ। তবে তার স্বামী শেখ জিয়াযুলের মৃত্যু-সংবাদ করাচিতে কীভাবে পৌঁছেছিল এখন আর মনে নেই। ভাগনে ভাগনিরা কে কেমন আছে, কী করছে, সবই তারা অজানা।

লতিফ দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে বসতে বলে আলতাফ জিজ্ঞেস করে, 'আপা আর তুমি ছাড়া আর কেউ এ বাড়িতে থাকে না?'

লতিফ বলে, 'না।' সে জানায়, তার বড় ভাই নিয়াজ শাদির পর মুঙ্গের চলে গেছে। সেখানেই থাকে। আজিমাবাদের বাড়িতে আসে না। অমানুষ, স্বার্থপর। দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বড় নূরবানু থাকে রায়বেরেলিতে, ছোট মমতাজ শাহারানপুরে। সংসার ছেলেমেয়ে নিয়ে দু'জনেই এমন ঝালাপালা যে কচিৎ কখনও এখানে আসতে পারে।

একটু চুপচাপ।

তারপর আলতাফ জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কতদূর পড়াশোনা করেছ?'

লতিফ বলে, 'ম্যাট্রিক পাশ করেছি।'

'কামকাজ কী করো — নৌকরি, না বিজনেস?'

'ছোটখাট বিজনেস। ইলাহাবাদের এক বড় শেঠের কাছ থেকে স্টেনলেস স্টিলের বর্তন কিনে এনে এখানে বেচি। ফাইভ পারসেন্ট কমিশন থাকে।'

একটু চিন্তা করে লতিফ ফের বলে, 'ধন্নো মামা শেঠের কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। সে আমার জামিনদার। বোনেদের শাদিতে সব টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল। ধন্নোমামা কিছু ক্যাপিটাল দিয়েছে। তাই বিজনেসটা দাঁড় করাতে পেরেছি। অবশ্য তার টাকা আমি শোধ করে দিয়েছি।'

ফতিমার শ্বশুরবাড়ি এবং আলতাফদের বাড়িতেও পর্দার তেমন কড়াকড়ি ছিল না। ছেলেবেলায় আলতাফের সঙ্গে প্রায়ই এখানে চলে আসত ধনপত। শেখ বদরুদ্দিন থেকে শুরু করে এ বাড়ির সবাই তাকে খুবই পছন্দ করত। বন্ধু পাকিস্তানে চলে যাবার পরও ধনপত শুধু এ বাড়িতে যাতায়াতটাই বজায় রাখেনি, বিপদে আপদে সব সময় ফতিমাদের পাশে আছে, লতিফকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অথচ তার সঙ্গে ফতিমাদের রক্তের কোনও সম্পর্ক নেই, ধর্মও তাদের আলাদা। ধনপতের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আলতাফের মন ভরে যায়।

আলতাফ জিজ্ঞেস করে, 'শাদি করনি?'

'করেছিলাম। লেকেন —'

'লেকেন কী?'

মুখ নামিয়ে লতিফ বলে, 'শাদিটা টিকল না—'

আলতাফ চকিত হয়ে ওঠে, 'কেন?'

লতিফ জানায়, পয়সাওলা ঘরের মেয়েকে শাদি করেছিল সে। তার ভীষণ বড়লোকি চাল। এটা চাই, সেটা চাই। বিবির খাঁই মেটানো লতিফের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সব চেয়ে যেটা বড় সমস্যা, শাশুড়ির সঙ্গে সে থাকতে চায় না। এ ব্যাপারে লতিফের শ্বশুরবাড়ির যথেষ্ট উসকানি ছিল। কিন্তু মাকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবতেও পারে না লতিফ। ফলে অশান্তি, খিটিমিটি, প্রচণ্ড তিক্ততা। সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত আর টিকিয়ে রাখা গেল না।

একটু চুপ করে থাকার পর আলতাফ বলে, 'তোমার কত আর বয়েস। সামনে লম্বা উমর পড়ে আছে। ভাল ঘর, আচ্ছা লেড়কি দেখে আবার সাদি করে ফেল —'

লতিফ জানায়, নতুন আর একটা মেয়ে এলেই যে সংসার সুখশান্তিতে ভরে যাবে, সেবা যত্নে মায়ের মুখে হাসি ফোটাবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। আরও বড় আকারের ঝঞ্চাট বাধবে কিনা তাই বা কে বলবে। তার চেয়ে এই ভাল আছে সে।

আলতাফ বুঝতে পারছিল, প্রথম বিয়ের অভিজ্ঞতাটা লতিফকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। তাই আর সেদিকে পা বাড়াতে চায় না। ভাগনে সুখী এবং সংসারী হলে খুশিই হত আলতাফ। কিন্তু কী আর করা যাবে? ক'দিনের জন্য এদেশে এসেছে সে। করাচিতে ফিরে যাবার পর এখানকার স্মৃতি ফিকে হয়ে যাবে। লতিফের জন্য যে চিন্তাটা তার মাথায় দেখা দিয়েছে তার অস্তিত্বও হয়ত থাকবে না।

একতলা থেকে কোনও মেয়েমানুষের গলা ভেসে আসে, 'লতিফ ভাই, গোসলখানায় গরম পানি দিয়েছি।'

চোখে না দেখলেও, আলতাফ আন্দাজ করল, আওরতটি নিশ্চয়ই বানো। কেননা খানিকক্ষণ আগে ফতিমা তাকে গরম জল দেবার জন্য লতিফকে পাঠিয়েছিল।

ডান পাশের একটা আলমারি খুলে সাবান, নতুন তোয়ালে বার করে লতিফ বলল, 'মামা চলিয়ে—'

হাতমুখ ধুয়ে, পোশাক পালটে লতিফের সঙ্গে ফের ফতিমার ঘরে চলে আসে আলতাফ। তখনকার মতোই বড় বোনের খাটের একধারে উঠে বসে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্টেনলেস স্টিলের বড় একটা কাঠের ট্রেতে আটার পুরি, হালুয়া আর গুলাবজামুন এনে একটা ধবধবে ছোট তোয়ালে আলতাফের পাশে খাটের ওপর বিছিয়ে তার ওপর ট্রেটা রাখে বানো। (পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্য)

**সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি**

# আতাউর রহমান : প্রাসঙ্গিক চালচিত্র

## বারীন্দ্রনাথ দাশ

একটা সময় ছিল যখন আমরা সত্যি সত্যিই এখনকার অল্পবয়েসিদের মতোই ছিলাম, — দোষে এবং গুণে এবং মানসিকতায়। মনটাকে একবার স্পটলাইটের মতো ঘুরিয়ে তখনকার জীবনের প্রথম দৃশ্যে আলোকসম্পাত করা যাক। খণ্ডচিত্রের একটা সময়নিরপেক্ষ সমাহারের মতো দেখা যাক তখনকার উত্তর-স্নাতক দিনগুলোর বাতাবরণকে — যেটি বাদ দিয়ে আতাউরের কথা ভাবা যায় না।

সে সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ক্লাইমেক্সে পৌঁছে গেছে। সময়টা ১৯৪৩ এর আরম্ভ থেকে ১৯৪৫-এর শেষ। তখনকার ছাত্রজীবনের টুকরো টুকরো কতকগুলো দৃশ্য মনে পড়ে। স্কটিশ চার্চের সামনের বিস্তৃত সিঁড়ি। আগস্ট আন্দোলনের সমর্থনে উদ্দীপ্ত বক্তৃতা দিচ্ছে ভোলা সেন। তার বক্তৃতার পর প্রচণ্ড হাততালি। তারপর বলতে উঠল সন্তোষ ভট্টাচার্য। খুব হইচই। অনেকে তাকে বলতে দেবে না। আবার আরও অনেকে তার পক্ষ নিয়ে নানা রকম স্লোগান দিচ্ছে। সন্তোষ ভট্টাচার্য হাসিমুখে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক মিনিটের মধ্যে শ্রোতারা শান্ত। সন্তোষ ভট্টাচার্য বলতে শুরু করল। সবাই স্তব্ধ হয়ে শুনল।

পরে ইউনিভার্সিটিতেও ওরকমই দৃশ্য। দোতলায় একদিকের সিঁড়িতে ধাপের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে ইতিহাসের ছাত্র রণজিৎ গুহ। অন্যদিকে সিঁড়ির ধাপের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে অর্থনীতির ছাত্র দিলীপ চক্রবর্তী। স্লোগান, শোরগোল, হইচই। ঘণ্টাখানেক পরে সেখানে ভিড় নেই। সেই ভিড়ের অনেকে তখনকার সিনেট হলের ওপাশের ক্যান্টিনে। স্লোগান-দ্বন্দ্ব যারা করছিল, ক্যান্টিনে বসে তারাই চা খাচ্ছে, আড্ডা দিচ্ছে। মতান্তর আছে, মনান্তর নেই। দ্বন্দ্ব প্রতিস্পর্ধা আছে, নগ্ন বৈরিতা নেই।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত ইংরেজির উত্তর স্নাতকতার পর্ব শেষ করে বেকার ল্যাবরেটরিতে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটেকি একটা ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত গবেষণা প্রকল্পে জড়িত। সেখানকার গ্রন্থাগারের একজন সহকারীর সঙ্গে এসে চা খাচ্ছে ক্যান্টিনে বসে।

দিলীপ চক্রবর্তী দোতলার অলিন্দে ধরল অর্থনীতির সান্ত্বনা দাশগুপ্তকে। সামনে ইউনিয়ানের ইলেকশান। ওর সাহায্য চাই। সান্ত্বনা বলল, — পরে কথা হবে। এখন প্রফেসার বিনয় সরকারের ক্লাস আছে। খেয়াল নেই বিনয় সরকার এসে পড়েছেন। সান্ত্বনাকে দেখে হাঁক দিলেন — এই, তোরা এখানে কী করছিস?

ইকনমিক্সের ধ্রুব দত্ত শিক্ষকদের বিস্তৃত প্রকোষ্ঠে গেছে অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে কথা বলতে। ওর কথা শুনে অধ্যাপক কবির বললেন, আপনারা নিজেদের মধ্যেই কাউকে সভাপতি করুন। আপনারাই ভাষণ দিন। আমরা যাব শ্রোতা হয়ে।

দু'জনে সামাজিক সম্ভাষণ রীতির দুই মেরুতে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভালবাসার অভিব্যক্তিতে দু'জনেই দুটি ফোয়ারা।

সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠে এসেছে ইংরেজির নরেশ গুহ, ধুতি এবং শার্টে। একজন বলল, ম্যাগাজিনে কবিতা পড়লাম, বাঁধা হরিণের গান। কুণ্ঠিত নম্র উত্তর নরেশ গুহের — এমন আর কি? কলেজ ম্যাগাজিনে যা হয়। থেমে থেমে বলা, পরিশীলিত ভঙ্গিতে বলা কয়েকটি কথা।

ক্লাসের সামনের জানলায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ চক্রবর্তী। পাশ দিয়ে যেতে যেতে রমাপদ চৌধুরী তার সঙ্গীকে বলল — জানলায় দাঁড়িয়ে কী পড়ছে জগন্নাথ? উত্তর শুনল — একটি নতুন বই 'যুদ্ধ যখন থামবে', আমাদের অমলেন্দু দাশগুপ্ত, সুবিমল মুখার্জি আর সত্য চ্যাটার্জির লেখা।

করিডরে ওয়াল-পেপার সেটে দেওয়া হয়েছে। তরুণ বোস আর সুবিমল মুখার্জি দাঁড়িয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে অর্থনীতির ছাত্র অজিত সেনগুপ্তের প্রবন্ধ। কাছেই অন্য দেওয়ালে একটি পোস্টার। বিতর্কসভা হবে আশুতোষ হলে। বক্তাদের মধ্যে আছে অর্থনীতির ছাত্র অম্লান দত্ত এবং ইংরেজির জর্জ গিলবার্ট সোয়েল। জি-জি-সোয়েল মেঘালয়ের ছেলে। মালকোচা মারা ধুতি, খদ্দরের পাঞ্জাবি, পরিষ্কার বাংলা। সকাল বিকেল নিয়মিত ডনবৈঠক করা চেহারা।

বাংলার প্রাণতোষ ঘটকের কাঁধে হাত রেখে কী যেন বলল তার সহপাঠী দীপ্তেন সান্যাল। তাদের পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে

গেল ইংরেজির অমলেন্দু দাশগুপ্ত আর ভূগোলের সিতাংশু মুখার্জি। কোথায় যেন দেখানো হচ্ছে পুরনো ছবি দেবদাস। সেটা দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনা হচ্ছে। একতলায় প্রবেশপথের বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প করছে ভূগোলের সুনীল মুনশি আর ইতিহাসের গৌতম চট্টোপাধ্যায়।

সময়ের ধারাবাহিকতা অবহেলা করে তিনটি বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের ছবির টুকরোগুলো এলোমেলোভাবে সমকালীন হয়ে গেছে। আজ তাদের অনেকেই ব্যাপক পরিচিতির চঞ্চল মধ্যাহ্ন পেরিয়ে শান্ত সন্ধ্যার নেপথ্যে সরে গেছে।

মনতাজের মতো এই ক্ষণিক মুহূর্তগুলোর জোনাকি-আলোয় মনে ভেসে ওঠে আরেকজনের স্মৃতি।

এসো, এসো — বলে উঠল দিলীপ চক্রবর্তী। ইউনিয়ান রুমে গল্প করছে দু'তিনজনের সঙ্গে।

— একটা দরকারে এসেছি তোমার কাছে।

— ও সব কথা পরে হবে। এখন আড্ডা দিচ্ছি। একে চেনো?

দিলীপ আলাপ করিয়ে দিল। আতাউর রহমান। আগেও দেখেছি। ইউনিভার্সিটিতে প্রায়ই আসে। মির্জাপুর স্ট্রিট বি-পি-এস-এফ্'এর সেক্রেটারি।

আতাউর হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা চেপে ধরল। তখন থেকেই একটা আন্তরিকতা ও সৌহার্দের সম্পর্ক প্রায় পাঁচটা দশক জুড়ে। সক্রিয় রাজনীতি থেকে সে এক সময় সরে এসেছিল। তাকে দেখলাম নতুন ভূমিকায়, 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার পরিচালক হিসাবে।

তার অনেক কাছাকাছি এসেছিলাম ১৯৫৭-এর শেষ দিকে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনে। অধ্যাপক হুমায়ুন কবির তখন কেন্দ্রের মন্ত্রী। তিনিই উদ্যোক্তা। মূল সভাপতি মহাদেবী বর্মা। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ সম্পাদক শ্রী মনোজ বসু এবং শ্রী ভবানী মুখোপাধ্যায়। চারজন যুগ্ম-সম্পাদকের মধ্যে ছিলেন শ্রী গজেন্দ্র কুমার মিত্র এবং আতাউর রহমান। একদিন ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং আরেকদিন রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ। শাখা সম্মেলনগুলিতে সভাপতিত্ব করলেন উমাশঙ্কর যোশী, কালিদীচরণ পাণিগ্রাহী এবং মুল্করাজ আনন্দ। অন্যান্য রাজ্য থেকে অনেক নামকরা সাহিত্যিক এসেছিলেন। কলকাতার প্রায় সমস্ত সাহিত্যিক তো ছিলেনই। সেই উপলক্ষে আন্তরিকতা, হৃদ্যতা এবং সহজ মেলামেশার একটা সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। সম্মেলনের এই সাফল্যের পিছনে অধ্যাপক হুমায়ুন কবির এবং আতাউরের নিঃশব্দ অবদান ছিল অনেকখানি। সে সময় দেখেছিলাম সংগঠনের কাজে আতাউর কতখানি তৎপর এবং সুদক্ষ।

ওর সঙ্গে দেখা হওয়াটা খুব নিয়মিত না হলেও মাঝে মধ্যে হতই। আড্ডা জমত সন্ধেবেলা চতুরঙ্গের ফ্ল্যাটে। যেদিন আমি যেতাম, দু'-একজন খুব পরিচিত বন্ধু ছাড়া আর কাউকে বলত না। সে কীরকম অতিথি-বৎসল ছিল, তার সব পরিচিতজনেরাই জানে।

সময়ের ব্যবধানে এই দেখা হওয়াটাও কমে গেল। আমায় তখন অন্যত্র সময় দিতে হত। আতাউরের সন্ধ্যাগুলিও তখন কিছুটা মধ্যবিত্তের আটপৌরে রুটিন, কখনও কিছুটা ব্যতিক্রম একঘেয়েমি কাটানোর জন্য। তার বন্ধুবান্ধবের বৃত্তটা ছিল অনেক বড়। কোনওদিন কারও মুখে তার সম্বন্ধে কোনও বক্র মন্তব্য শুনিনি। বন্ধুবৎসল ছিল খুব। সব মিলিয়ে ছিল খাঁটি বাঙালি। কোনওদিন কোনওরকম খাদ দেখিনি তার বাঙালিয়ানায়।

একদিন হঠাৎ পার্কসার্কাসের পথে দেখা। জিজ্ঞেস করলাম — ইদানীং তো দেখা হয় না। কী খবর তোমার?

হেসে বলল, — জানো তো, বিয়ে করেছি।

একটু বেশি বয়সে বিয়ে হওয়া লোকের মতোই দু'চারটি কথাবার্তা বলল। কিছু বন্ধুসুলভ জ্ঞানগর্ভ পরামর্শও দিল। তারপর বলল — একদিন এসো চতুরঙ্গের অফিসে।

যাব যাব করে আমার যাওয়া হয়নি। একদিন শুনলাম, সে আর নেই। সেদিন মনে হল, আমরা যারা প্রায় সমবয়সি, ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের ক্যাশ-কাউন্টারের সামনের লাইনের মতো আমরাও একটি লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।



**সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি**

# রাঢ় বাংলার আখ্যান ঃ কথক রামকুমার

## মেঘ মুখোপাধ্যায়

বিশ শতাব্দীর শেষে অথবা নতুন একবিংশ শতকের শুরুর লগ্নে অর্থাৎ এই দু'হাজার সালে বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে যে-গল্পকাররা তাঁদের মধ্যযৌবনে রয়েছেন — বলা যায় চারের ঘরে যাঁদের বয়স — এবং ইতিমধ্যে এমন কয়েকটি গল্প লিখেছেন যেগুলি বাংলাসাহিত্যের চিরকালের ভাঁড়ারে ঠাঁই করে নিয়েছে বলে ভরসা করা যায়, প্রশ্নিদ্ধ অধ্যাপকরা তাঁদের প্রথাগত রচনায় এঁদের নাম করবেন কি না সে ভিন্ন কথা কিন্তু সাধারণ বাঙালি গল্পপাঠকের বিচারে উত্তীর্ণ, বাংলা ছোটগল্পের উচ্ছ্বসিত ধারায় যাঁদের নাম উচ্চারণযোগ্য হয়ে উঠেছে তেমন গল্পকারদের মধ্যে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম অন্যতম।

একটা যুগে নানা পত্রপত্রিকায় অনেক কবি লেখকই আত্মপ্রকাশ করেন এবং তাঁদের নিজের মতো করে লেখার চেষ্টা করে যান কিন্তু কিছুদিন বাদে দেখা যায় একই কালবন্ধনে লিখতে শুরু করা লেখকদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনই সম্পাদক আর পাঠকের প্রীতিভাজন হয়ে উঠেছেন। উভয় তরফের উৎসাহদানে তাঁদের সৃষ্টিপ্রয়াস সমৃদ্ধতর হয়ে উঠতে পায়। এঁদেরই কেউ কেউ-বা নামী আর যোগ্য প্রকাশকদের আনুকূল্য লাভে সক্ষম হয়ে ওঠেন। কিন্তু বহুর মধ্যে থেকে যখন সময় আর সাহিত্যের নিজস্ব বিচার-প্রক্রিয়ায় কয়েকজন লেখকের প্রতিষ্ঠালাভ ঘটে তখন ভাবতে হয় কী এমন তাঁদের স্বকীয়তা, কিসের বৈশিষ্ট্যে তাঁরা দাগ কাটলেন, কেনই বা আমরা তাঁদের নতুন লেখাটি পড়ার অপেক্ষায় থাকি আর তারপরে আড্ডায়-আলোচনায় মাতি, মুখে মুখে ছড়িয়ে দিই সেই লেখাটি অন্যকে পড়ার প্রবর্তনা।

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থের সংখ্যা এ পর্যন্ত মাত্র তিনটি। ১৯৮৪ তে প্রথম বই 'মাদলে নতুন বোল'-এর পর দ্বিতীয় গল্পের বই ' ছোটগল্প' বেরোয় দশ বছরের মাথায় ১৯৯৪-তে আর তৃতীয় বই 'পরিক্রমা' বেরিয়েছে ১৯৯৯-এর অগস্টে। আর এ-বছর বাংলা আকাদেমির সোমেন চন্দ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। পনেরো বছরের পরিসরে তিনটি গল্পের বই বেরনো থেকে মনে হয় তিনি প্রকাশকুণ্ঠ। বছরভর প্রচুর গল্প লিখে প্রকাশ করার লোক তিনি নন। আবার এমনও হতে পারে তরুণ কবির কবিতার বই প্রকাশের মতো একজন তরুণ গল্পকারের কাছে গল্পের বইয়ের প্রকাশপদ্ধতি কঠিন— তাই ৮৪ থেকে ৯৪-এর মধ্যবর্তী এক সম্পূর্ণ দশকে তাঁর কোনও বই আমরা পাইনি। কিন্তু ৯৪-তে 'প্রতিক্ষণ'-থেকে আধুনিক ছোটগল্প গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত তাঁর 'ছোটগল্প'-এর প্রকাশ দীর্ঘ এক দশকের অভাব পুরোমাত্রায় পূরণ করে দিয়েছিল। এই বইটির অন্তর্ভুক্ত বারোটি গল্পের জোরে রামকুমার বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন বললে কিছু বাড়িয়ে বলা হয় না।

'মাদলে নতুন বোল' বেরিয়েছিল তাঁর আঠাশ বছর বয়সে। এতে ধরা আছে নতুন লেখকের গঠনপর্ব। বোঝা যায় একজন তরুণ লেখক তাঁর ভূমি আর নিজস্ব মানুষজনকে চিনে নিচ্ছেন। কোন পটভূমিতে কাদের নিয়ে কেমন করে লিখতে চান তার সন্ধান করছেন। এবং একটা লক্ষ্যে যে পৌঁছতে পারছেন তা বোঝা যায় 'বৌ, মেয়ে, অ্যালসেসিয়ান ও পাইপ', 'পিকনিক', 'হা-ভাতে', 'মাদলে নতুন বোল', 'ছোবল', 'পেয়ারা বুড়ো পাণ্ডাবুড়ি' কিংবা 'রাজসভা কাহিনী' গল্পে। আমরা বুঝতে পারি কোন মানুষগুলির প্রতি তাঁর টান, কাদের কথা বলতে তাঁর কলম উৎসুক হয়ে ওঠে আর কাদের তিনি ব্যঙ্গ করতে চান। এক কথায় বলতে গেলে রাঢ় বাংলার, বিশেষ করে বাঁকুড়া জেলার উত্তর-পূর্ব অংশের হাভাতে হতদরিদ্র, ভূমিহীন জনমজুর বা ভূমি থেকে উৎখাত কৃষিকর্মী বা ছোটখাটো বিভিন্ন গ্রামীণ হস্তশিল্পের দ্বারা কোনওমতে বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়াটাকে ঠেকানোর চেষ্টায় রত সমাজের তথাকথিত নিচুজাতের মানুষজন হল রামকুমারের সাহিত্যের আকর। বাঁকুড়ার গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা কিছু বিচিত্র ধরনের মানুষ প্রথমাবধি এই লেখককে খুব আকর্ষণ করেছে। এরা চরম দরিদ্র কিন্তু ফুর্তিবাজ, উড়ুক্কু, বাউন্ডুলে, বছরভর নির্দিষ্ট রোজগারের কোনও বন্দোবস্ত নেই, চাষবাসে মন বসে না, কঠিন জীবনধারাকে গুরুত্ব না দিয়ে সহজ করে খানিকটা তাচ্ছিল্যভরে নিতে অভ্যস্ত, গুছিয়ে সংসারধর্ম পালন করায় এদের চরম অনীহা। বাঁকুড়ার আঞ্চলিক ভাষায় এদের

বলে 'হাউসে'। লেখক এদের সংস্পর্শে এসেছেন, কাছ থেকে বহুদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করেছেন আর আমাদের উপহার দিয়েছেন কয়েকটি মনে রাখার মতো গল্প — ছোবল, হাউসে, দুখে কেওড়া ইত্যাদি। এদের কেউ বনেজঙ্গলে পাখি ধরে বেড়ায়, কেউ সাপ খেলায়, কেউ যাত্রাদলে ফুলুট বাজায়, কেউ বেলখোলার মালা গাঁথে, চায়ের দোকান দেয়, অনেকেরই আবার সঠিক কোনও জীবিকা নেই। অসাধারণ সব জীবিকা তাঁর গল্পের চরিত্রদের প্রতি পাঠকের আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয়।

লেখকেরা তো একটি বিশেষ সময়পর্বে তাঁদের দেখা বা অনুভব করা মানুষজনের কথা বলেন। তবে কিসের গুণে একই কালের একজন লেখক অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে যান, তাঁর জন্য সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র স্থান বরাদ্দ হয়? পাঠকরা সেই লেখককে কেন বারবার পড়তে চায় কিংবা বিভিন্ন যুগের পাঠকরা সমান আকর্ষণে তাঁর কাছে ছুটে যায়? আমার মনে এ-প্রশ্ন ঘুরেফিরে আসে। লেখকের সেই জাদুটা কোথায় নিহিত থাকে? তাঁর লেখার কোনখানে সেই রহস্যের প্রাণভোমরা? লেখক কেমন করে লেখার পর লেখায় সেই পরিমণ্ডল গড়ে তোলেন যাতে পাঠক আটকা পড়ে? রামকুমারের গল্প পড়তে ভাল লাগার পর স্বাভাবিকভাবেই মুগ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝে উঠতে চেয়েছি তাঁর স্বাতন্ত্র্যের চিহ্নগুলিকে। রামকুমারের মতো আমিও বাঁকুড়া জেলার ছেলে। লিখি কবিতা। বাঁকুড়া শহরে আমার বাড়ি হলেও আসলে আমরা গ্রামের লোক। শুশুনিয়া পাহাড়ের তলায় ক্রোশ দু-একের মধ্যে আমাদের গ্রাম। আর মামাবাড়ির গ্রাম পাহাড়ের উল্টো পিঠে। মাঝেমাঝে গ্রামে যাই, গ্রামের মানুষরা নিয়মিত আমাদের শহরের বাড়িতে আসেন। রামকুমার বাঁকুড়ার পুবের আর আমি পশ্চিমের। বাঁকুড়ার মানুষ বলে, এই জেলার ভূপ্রকৃতি, মানুষজনকে আলাদা করে ভালবাসি বলে রামকুমারের আখ্যানগুলি আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করবে এতে আর বিচিত্র কী! কিন্তু এটা প্রাথমিক ব্যাপার। দেশের টান পেরিয়ে বড় হয়ে যায় সাহিত্যের টান। তাঁর গল্পগুলিতে ছড়িয়ে থাকা অভিজ্ঞতা-কল্পনা-জীবনচর্যার টানে যে কেউ আটকা পড়তে পারেন। তারাশঙ্কর যেভাবে রাঢ়ের এক অংশের গ্রামীণ আঞ্চলিকতাকে সাহিত্যের সর্বজনীন আবেদনে মণ্ডিত করে তুলেছেন, রামকুমার সেখান থেকে প্রেরণা পেয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে বলে নিই 'গল্প' না বলে 'আখ্যান' বলতে পছন্দ করেন রামকুমার। তাঁর গল্প রচনার ধরনটিতে লেখার চেয়ে বলার ভঙ্গি বেশি। যেন একজন গ্রামীণ কথক ঘরোয়া আসরে কাহিনী শোনাচ্ছেন। আখ্যান বয়নের খোলামেলা ছড়ানো ধরন তাঁর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্যের ছোটগল্পের আঁটসাঁট বাঁধুনি, ওছনো ব্যাপারটা — যেটা বহু বছর ধরে আমাদের কাছে ছোটগল্পের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে — তিনি পরিহার করতে চেয়েছেন। ভারতীয় গ্রামাঞ্চলের কথকদের বর্ণনারীতি তাঁর মূলপ্রেরণা অথচ তা শুধুই গ্রামীণ নয়; তার সঙ্গে যোগ করেছেন আধুনিক শিক্ষিত মনের অর্জনগুলি। কিন্তু আখ্যান কতদূর ছড়াবে, কোথায় তাকে গুটিয়ে আনতে হবে, আধুনিক পাঠকমনের গ্রহণক্ষমতা কতদূর সইতে পারবে — এ বিষয়ে তাঁকে আর একটু সচেতন হতে বলি। কোনও কোনও গল্পে ছড়িয়ে বলার ধরনের কিঞ্চিৎ অতিরেক ঘটেছে বলে মনে হয়। শিল্পরচনার পরিমিতিবোধ বা সংযমে তাঁর পরিচয় পেয়েছি বলেই বিপরীত দিকটার প্রসঙ্গে সতর্ক থাকার কথা তুলতে হল। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার কিংবা লাতিন আমেরিকার বা আফ্রিকার নানা দেশের আধুনিক লেখকরা ইউরোপ-আমেরিকার মহান গল্পকার-ঔপন্যাসিকদের দ্বারা উনবিংশ শতাব্দী থেকে কাহিনীবর্ণনার নির্দিষ্ট করে দেওয়া রীতির বাইরে বেরিয়ে এসে তাঁদের দেশজ আখ্যানবয়নের শৈলীর সন্ধান ও পরীক্ষানিরীক্ষা করছেন এবং সার্থক হয়েছেন। ইউরোপ-আমেরিকার বেঁধে দেওয়া ছাঁচ আজ দেশে দেশে ভেঙে পড়েছে। রামকুমারকে প্রশংসা করতে হয় যে তিনিও — আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও — তাঁর নিজের মতো করে ছাঁচ ভাঙার একটা চেষ্টা করেছেন এবং অনেকাংশে সফল হয়েছেন। সম্প্রতি তিনি মঙ্গলকাব্যের কয়েকটি কাহিনীকে নতুন করে বলার / লেখার প্রয়াস করছেন।

বাঁকুড়ার মাটিতে রামকুমারের মূল প্রোথিত। উচ্চশিক্ষার্থে তিনি গ্রাম (বিষ্ণুপুরের কাছে গেলিয়া) ছেড়েছেন প্রথম যৌবনে, তারপর চাকরিসূত্রে মহানগরের বাসিন্দা। তাঁর শিক্ষার আর চাকরির পরিমণ্ডল চরম নাগরিক কিন্তু লেখক হিসাবে শিল্পী হিসাবে তাঁর মনে গ্রাম আর গ্রামীণ জীবনের পরিপোষণ। তেমনই বলতে হয় প্রখর নাগরিক মানুষজনদের সঙ্গে তাঁর ওঠাবসা, মেলামেশা কিন্তু গল্প লেখার সময় তাঁর কলমে উঠে আসে, সুদী, গঙ্গি, সুচাঁদ, বিনোদ, ষঁড়োল, রাধেশ্যাম, শ্রীনাথ, সখিনা, গোপা, বাঁকু, নোদী, সাধু, অজিতেরা। রামকুমারের বিভিন্ন গল্পে বাঁকুড়ার ভূমিরূপ আর প্রকৃতির নিখুঁত-পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা যে-কোনও পাঠককে মুগ্ধ করবে। বাঁকুড়ার মানুষের জীবনচর্যার বৈশিষ্ট্যে তাঁর আখ্যানগুলি জীবন্ত। মনসাপুজো, রাস-দোল, তুষুপরব, পৌষসংক্রান্তিতে পুকুরে তুষুখোলা ভাসানো, কীর্তন, বছরের নানা সময় গ্রামগঞ্জের মেলার বর্ণনা দিতে তিনি নিপুণ। এ-সব লৌকিক চিহ্ন ছাড়া বাঁকুড়ার গ্রামীণ মানুষকে ভাবা যায় না। এবং যা কেবল বাঁকুড়া জেলাতেই পাওয়া যায়, বাংলার অন্য অঞ্চলে যা দুর্লভ



এমন সব জীবনরীতি আর চরিত্রের আখ্যান তিনি বৃহত্তর পাঠক-শ্রোতৃ-সমাজকে শুনিয়েছেন। যেমন তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মানিক-সতীনাথ না লিখলে অনেক চরিত্রের কথা আমাদের অজানা থেকে যেত, অঞ্চলবিশেষের মানুষের বিচিত্র জীবনলীলার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম — রামকুমারের গল্প পড়তে পড়তে তেমনই অনুভব হয় যে তিনিও আমাদের নতুন অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট করছেন।

উত্তর-পূর্ব বাঁকুড়ার পথঘাট-নদী-খালবিল-জঙ্গল-সায়র-ডাঙা-মাঠ রামকুমারের আখ্যানে আয়নার মতো প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তিনি বাঁকুড়ার এই অংশটি এবং হুগলি-বাঁকুড়া ও বর্ধমান-বাঁকুড়ার সীমান্ত অঞ্চলগুলিকে নিজের হাতের পাতার মতো চেনেন।

তাঁর গল্পে পাই কতরকমের মেলার নাম আর বর্ণনা। গল্পের নরনারীরা মেলা দেখতে যায়, মেলায় যাওয়া এখানের মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত। মেলায় যাওয়া বাদ দিয়ে এখানের মানুষের জীবন হয় না, মেলায় না গেলে শতদুঃখকষ্টের মধ্যেও মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষগুলি জীবনবর্জিত হয়ে পড়ে। কয়েকটি বর্ণনা তুলে দিলে স্পষ্ট হবে —

> "ওই চড়াই-উৎরাই জমি আর খাঁ খাঁ মাঠের দিকে তাকিয়ে পিঁড়াতে বসেছিল নতুর মা। আস্তে আস্তে সূর্যটা ডুবে যায়। সন্ধে নামে। রাত বাড়ে। দূরে মাঠের আল দিয়ে লোকজন হইহই করতে করতে যায়। আজ কেতন-কিয়ারির মেলা। চারদিকে হাহাকার আবার এই হইহইও আছে। পাথরের মতো মানুষগুলোও এই গরম তো সেই ঠাণ্ডা। এক মুঠো ভাতের জন্য যেমন হাহাকার, পেটে একমুঠো ভাত পড়লে তেমনই হইচই। এগিয়ে যায় মানুষগুলো আলপথ ধরে। মাদলের শব্দ আসছে, বাঁশিতে সুর ওঠে। শহরফেরতা কোনো ছোকরা মাউথঅরগ্যান বাজাতে বাজাতে মেলাপথে যায়। হিন্দিগানের সুর বাজে।"
>
> (জৈষ্ঠ ১৩৯০, ঘুঘু কিংবা মানুষ/ ছোটগল্প)

'জাতিস্মর' নামের একটি বড় গল্পে পাই সোনামুখীর মনোহর দাসের মেলার বিশদ বিবরণ। পুরো গল্পটিই গড়ে উঠেছে মনোহর দাসের মেলার আনাচেকানাচে, পরতে পরতে। লেখকের ভাষায় একটু শোনাই —

> "আসছে কাল থেকে সোনামুখীর মনোহর দাসের মেলা। মহোৎসব তিন দিনের — অধিবাস, মাঝের মোচ্ছব আর ভাঙা মোচ্ছব। আজ থেকেই আউল-বাউলরা জুটতে শুরু করবে। এ তিনদিন সোনামুখীর বাইশটা আখড়া আর লফরডাঙাতে আউলবাউলের বান ডাকে। সোনামুখী আর পাশের গাঁগুলির ঝিউড়িরা বাপের ঘর আসে। মনোহর তলায় যত লোক তত গাইয়ে। মাঝের মোচ্ছবের রাতে আখড়ায় আখড়ায় বাউলগানের আসর বসে। সারারাত ধরে এক আখড়া থেকে আর এক আখড়ায় মানুষের স্রোত বয়ে যায়। ..."
>
> (জাতিস্মর/ ছোটগল্প)

আবার — "বিনোদের কোটরে ঢোকা চোখদুটি হঠাৎই ভেসে ওঠে। ডানদের মেলায় সেই ছোট থেকে কতবার গেছে! মায়ের সঙ্গে যেত মেলায় মোড়া, ধুনুচি, কুলো বেচতে। পরে গেছে মেলার যাত্রাগানে ফুলুট বাজাতে।..."

(মৌজা ডোমপাটি/ ছোটগল্প)

তেমনই আছে নানা স্থানীয় লোকাচার আর পুজোর বর্ণনা — যেগুলি দিয়ে এই অঞ্চলের মানুষের — বিশেষ করে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের — জীবন গড়া।

যেমন — "বাঁকিশোল ইস্কুলটা পেরতেই বাগদি পাড়ার মনসার গান কানে আসে। চারদিকের নিঝুম অন্ধকারে সেই গানের সুর দোল খায়। কিন্তু সবটাই তো সাথি আর জাত। তার দোলটা জাতসাপের ফণার মতো। আয়েসি বাতাসে যেমন দুধগোখরোর ফণা মৃদুমৃদু দোলে।"

(ঘরে ফেরার পথ/ ছোটগল্প)

"কার্তিক হচ্ছে ধূপ, ধুনো, বাতির মাস। সন্ধে হলে আকাশে বাতি, জলে বাতি। বিকেল থেকে কুচো মেয়েরা কলার খোল সাজায়। খোলের ওপর পাঁচ রকমের ফুল, পাঁচটি তুলসীপাতা, পাঁচটি দুর্বো ঘাস আর পাঁচটি কুলপাতা দিয়ে, একটি দীপ আর একটি ধূপ জ্বালিয়ে জলে ভাসিয়ে দেয়। ঘনশ্যাম বাগদির মেয়ে রানী খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসব যোগাড়পাতি করে।"

(বাঁকুচাঁদের গেরস্থালি/ ছোটগল্প)

এখানকার মাটি-মানুষের জীবনছন্দকে বাংলা সাহিত্যে জ্যান্ত করে তোলার আকাঙ্ক্ষায় রামকুমারকে স্পন্দমান হয়ে থাকতে দেখি। তাঁর চরিত্রদের জীবনলীলাকে জীবন্ত করে তোলার অভিপ্রায়ে রামকুমার ব্যবহার করেছেন স্থানীয়ভাবে প্রচলিত নানা ছড়া-ছন্দ-পাঁচালি-ব্রতকথা-কীর্তনের টুকরো টুকরো অংশ। বিশেষ আঞ্চলিক উচ্চারণের ছাঁদে সেগুলি যেন পাঠকের কানে এসে ঢোকে। এ ছাড়া চরিত্রদের কথাবার্তায় তাদের মুখে বসিয়েছেন বাঁকুড়ার গ্রামাঞ্চলের কথ্যবুলি। আঞ্চলিক ভাষা তাঁর কলমে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। মুদ্রিত অক্ষরের উচ্চারণ যেন কানে শোনা

যায়। কত না বিশেষ স্থানিক শব্দ তিনি অকাতরে তাঁর কলমের ডগায় নিয়ে এসেছেন — রাঢ় বাঁকুড়ার আখ্যান রচনায় এর ভূমিকা হয়েছে অনবদ্য। যেমন — ফদর ফদর, আগদেছে, ফুদফুদ, মুয়ে, আশুদগাছ, আগনায় (অর্থাৎ আঙিনায়), আগড়, অলাউঠা ছেলে, ঝোড়, ডেবরা ডেবরা, উপুড়ুচুপুড়, লেতুড়, দুবো, মাঠরান্না, পাখ (পাখি অর্থে) ইত্যাদি। সংলাপ তো বটেই, লেখক হিসাবে যখন তিনি বর্ণনা দিচ্ছেন, বলা ভাল কথকতা করছেন বা আখ্যান ফাঁদছেন, তখনও এই আঞ্চলিক কথ্যরীতির আশ্রয় নিয়েছেন মাঝেমাঝে এবং চমৎকারভাবে। যেমন 'পিকনিক' গল্পের শুরু করছেন এই বাক্য দিয়ে — "খবরটা এঁড়ে বাছুরের মত চারদিক পাঁই পাঁই করে ছুটছে।" (মাদলে নতুন বোল)। এরকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত তুলে আনা যায় যা তাঁর গল্পে অভিনব স্বাদ আর গন্ধ এনেছে।

যথার্থভাবেই তিনি বলেছেন — "আমার জন্ম বাঁকুড়া জেলার একটি গ্রামে, রাঢ় বাংলার সংস্কৃতি ও সমাজের মধ্যে। তুষুগান, বাউল, রামায়ণ, কীর্তন এসব নিয়ে আমার শৈশব এবং কৈশোরের জগৎ। অষ্টম কিংবা চবিবশ প্রহরের কীর্তনের ধুলোটের যে গ্রাম পরিক্রমা তাতে গোরা হয়ে কতবার 'নগরভ্রমণ' করেছি। কৈশোরের ওই পর্বে, ষাটের দশকে, ভাগচাষী ও কৃষক আন্দোলন দানা বাঁধছে। ক্ষেতে খামারে সংঘর্ষ, পুলিশের আনাগোনা। গোরার 'নগর ভ্রমণে'র পাশাপাশি প্রায় নিত্যদিনের রাজনৈতিক মিছিল। বৈষ্ণবীয় খোল আর রাজনৈতিক মাদল দুটোরই গ্রাম পরিক্রমা চলে।..." (ছোটগল্প বইটির ভূমিকা)

ষাট দশকের শেষ থেকে শুরু করে সত্তরের মধ্যভাগের উত্তাল রাজনীতি তাঁর গল্পে দাগ রেখে গেছে। আপাতভাবে ধরা পড়ে না কিন্তু গল্পের পর গল্প পড়ে গেলে টের পেতে অসুবিধা হয় না যে রামকুমার একজন আধুনিক রাজনীতিমনস্ক লেখক। গ্রামে বামপন্থী রাজনীতির প্রাবল্যের যুগে যে তিনি বড় হয়েছেন তার চিহ্ন রয়েছে তাঁর কিছু গল্পে — এর উজ্জ্বল উদাহরণ 'মৌজা ডোমপাটি'(ছোটগল্প) 'মানুষের ইতিহাস', 'দুখে কেওড়া', 'কাবাডি-কাবাডি' (পরিক্রমা) গল্পগুলি। সরল সাদাসিধে গ্রামবাসীর রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়ার, লড়াকু হয়ে ওঠার আখ্যান তিনি শুনিয়েছেন। তিনি যে কীরকম তীক্ষ্ণ বিচারশীল রাজনৈতিক মন নিয়ে সমাজ আর তার মানুষগুলিকে পর্যবেক্ষণ করতে আর তা উপভোগ্য করে তির্যকভঙ্গিতে জানাতে পটু তা এ গল্পগুলি পড়লে জানা যাবে। একটা মাত্র উদাহরণ দিই। দুখে কেওড়ার সংলাপ —

"একা আমি কেমন করে যাই এদের ছেড়ে? গাঁয়ে তিনটি ছেলের তিন মা বড় আশায় নাম রেখেছিল দুঃখহরণ। দুঃখহরণ ভট্টাচার্য ইস্কুলের মাস্টার। গাঁয়ের মাথা। সে থাকল দুঃখহরণ নামে। দুঃখহরণ পাল ছোট চাষী। আপনাদের সঙ্গে বেশ গা ঘসাঘসি। গুছিয়ে কথা বলতে পারে। সে হল দুখীরাম। আর আমি হলুম দুখে। জ্ঞান থেকে আজ অবধি আপনারা ও নামেই ডেকে এসেছেন," (দুখে কেওড়া/পরিক্রমা)

রাজনীতিসচেতন রামকুমারকে আমরা 'কাবাডি-কাবাডি' গল্পে একজায়গায় এক আত্মবিশ্লেষণী প্রৌঢ়ের জবানিতে বলতে শুনি — "রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে লড়াই করে সংগঠন গড়া আর ক্ষমতায় থেকে সংগঠন গড়া এক নয়। সে-সময়ের প্রতিটি দিন ছিল মাঠে-ময়দানে সংঘাতের মধ্য দিয়ে, শ্রমিক কৃষকের প্রাণের বিনিময়ে, ধাপে ধাপে বিপ্লবের পথে এগিয়ে চল। সারা চোখ জুড়ে সেদিন স্বপ্ন ছিল, সারা বুক জুড়ে বিশ্বাস ...."

স্বপ্নের-কল্পনার গ্রামবাংলা যে আজ নেই, তার শরীরে-চরিত্রে নানা অভাবনীয় বদল ঘটে গিয়েছে — এই নিয়ে তাঁর 'আকর্ষণ ও বিকর্ষণ' গল্পটি মনে রাখার মতো। এই বদলটা তিনি আরও কিছু গল্পে ধরেছেন।

রামকুমারের একটি গল্পের নাম 'চরৈবেতি'। শুধু এই গল্পে নয়, তাঁর আখ্যান রচনার একটি মূল বিষয় হল চলা। বাস্তব ও প্রতীকী উভয় অর্থেই চলা রয়েছে তাঁর আখ্যানে। গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে, নদী ডিঙিয়ে, জঙ্গল ভেঙে চরিত্রগুলির চলা। জীবনের এক স্তর থেকে অন্য স্তরের দিকে চলা। এক ছন্দ থেকে অন্য ছন্দে চলা। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল 'পরিক্রমা' নামের বড় গল্পটি। নদী পেরিয়ে, জঙ্গল মাড়িয়ে, দূর দেশ থেকে একটি মানুষের এক গ্রামে আসার চমৎকার বর্ণনা দিয়ে যে-গল্পের শুরু, যে-মানুষটি গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে লোকজনদের জড়ো করে নিয়ে যেতে এসেছে তীর্থের পথে। শুধু এই গল্পটি নিয়েই বিশদ আলোচনার অবকাশ ছিল কিন্তু আপাতত বিরতি।

চলার মোটিফ এবং রামকুমারের অন্য ধরনের অন্য বিষয়ের গল্পগুলি নিয়ে স্বাদান্তরে কথকতার সুযোগ রইল।

**গ্রন্থসমালোচনামূলক নিবন্ধ**

# একটি অসাধারণ সংকলন — চৈতন্যদেব, ইতিহাস ও অবদান

অনিল আচার্য

আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশের অব্যবহিত পরেই গৌতম ভদ্র সহ আমি 'অম্বিকা কালনা'র যা বর্তমানে 'কালনা' নামেই পরিচিত বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনে যাই। এই শহরটি বর্ধমান জেলার অন্তর্গত একটি শহর হলেও সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সূত্রে পঞ্চদশ শতকের আগে থেকেই নবদ্বীপ ও নদীয়ার বৈষ্ণব সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। গৌতম মজা করে নিত্যানন্দের শ্বশুরালয় দেখিয়ে বললেন, বড় বোনকে দেখতে এসে একই সঙ্গে দুটি বোনকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন নিত্যানন্দ। পুরো শহর ঘুরতে বৈষ্ণব সংস্কৃতির অন্যতম এই পীঠস্থানের প্রায় সর্বত্র আমরা ভ্রমণ করেছিলাম। এই গ্রন্থটি চৈতন্যদেব সম্পর্কিত বিষয়ের পাঠক হিসাবে আমাকে আলোকিত এবং বিস্মিত করেছে।

এই বইটি হাতে পাওয়ার আগেই আমার একটি ধারণা গড়ে উঠেছিল যে উনবিংশ শতকের 'নবজাগরণ' প্রকৃত অর্থে নবজাগরণ হতে পারে না। ইওরোপীয় নবজাগরণের আদলে আমাদের গৌরব বাড়াতে পাশ্চাত্যপ্রেমীদের একটি সমান্তরাল ইতিহাস বানানোর চেষ্টা। ঔপনিবেশিক শাসনে শাসক ইংরেজদের হাত ধরে যে পাশ্চাত্য শিক্ষার আগমন ঘটল, তার সঙ্গে ব্রিটিশের কূটকৌশল জড়িত। গ্রিক ও লাতিন ভাষায় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের নব চেতনার বিস্তার, একই সঙ্গে ক্রমপ্রসারমান বিশ্বসংস্কৃতি ও জ্ঞানের সঙ্গে পাশ্চাত্যের পরিচয়, বণিকশ্রেণীর সঙ্গে এক শক্তিশালী মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব এবং ইতালি, ফ্রান্স ও পরবর্তীকালে ইংলন্ডে মাতৃভাষায় সেই বিস্তৃত প্রভাবে নবজাগরণ। অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যক্ষেত্রে এই বিপুল স্ফূর্তি বা বিস্ফোরণের অপর নামই হল নবজাগরণ। উনবিংশ শতকে সেই রেনেশাঁস বা নবজাগরণ হল কই?

তখনই প্রশ্ন উঠল, তা হলে এই সংস্কৃতির ব্যাপ্ত চরাচরে কি সেই স্ফূরণ হয়নি কখনও? ফিরে যেতে হয় সেই সময় থেকে আরও চারশো বছর পিছনে। অনেকের মতে চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে কয়েক দশক জুড়ে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে দরবেশ, সুফি, নিম্নবর্গের মানষ একত্রিত করে যে চৈতন্যের উদয় তাকেও বলা যায় এক ধরনের নবজাগরণ। 'নবজাগরণ' বলতে সবটাই যে ইওরোপীয় ছাঁচে ফেলতে হবে এমন কিছু বাধ্যবাধকতা আছে বলে মনে হয় না।

যদি সেটাই ভাবি, তা হলে উনবিংশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতকের গোড়া পর্যন্ত যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, যে পরিবর্তনের কারণ হিসাবে পাশ্চাত্য প্রভাবের এবং ঔপনিবেশিক শাসনের অবদান আছে বলে মনে করা যায়, সেটাই বা অগ্রাহ্য করি কীভাবে! ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের এবং মুসলিম শাসনের প্রেক্ষাপটে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং দেশজ সংস্কৃতির এক নবলব্ধ চেতনা বিকাশে তাঁর সাংগঠনিক প্রয়াস এক যুগান্তকারী ঘটনা। বৈষ্ণব সংস্কৃতি ভারতের পূর্বাঞ্চল জুড়ে যে গণসংস্কৃতির সমান্তরাল বিকাশ ঘটিয়েছিল তার অপরিসীম রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব আমাদের ইতিহাসচেতনার অন্তর্গত করা কতটা জরুরি তা এই বইটি পড়লে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। 'বাংলাদেশ আপনাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল বৈষ্ণব যুগে। সেই সময় এমন একটি গৌরব সে প্রাপ্ত হইয়াছিল যাহা অলোকসামান্য, যাহা বিশেষরূপে বাংলাদেশের, যাহা এ-দেশ হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া অন্যত্র বিস্তারিত হইয়াছে।' রবীন্দ্রনাথ যদি উনবিংশ ও বিংশ শতকের সাহিত্য ও সংস্কৃতি—চেতনার প্রাণপুরুষ হিসাবে বিবেচিত হন, তা হলে, রবীন্দ্র সাহিত্যে বৈষ্ণব সাহিত্যের যে বিপুল প্রভাব তা তাঁর এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়। এই জন্যই ইংরেজি রেনেশাঁসকে যদি ১৩০০ সালের পরবর্তী সময় থেকে সপ্তদশ শতক অবধি প্রায় ৪০০ বছরের ইতিহাস হিসাবে ধরি, তা হলে বাংলার এই রেনেশাঁস পঞ্চদশ শতক থেকে উনবিংশ শতক অবধি সুবিস্তৃত করতে আপত্তির কারণ দেখি না। নর্মান শাসনের সময় থেকে ইংরেজি ভাষা-সংস্কৃতি-সাহিত্যের নিজস্ব

পরিচয় তৈরি হতে প্রায় ৪০০ বছর লেগেছিল। বাংলা ভাষা তুলনামূলকভাবে বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও এবং পাঠান থেকে ইংরেজ এই ঔপনিবেশিক কালজাত হলেও প্রকৃত অর্থে জাতীয়তাবাদ ও আত্মসংস্কৃতিতে দীপ্ত হয়ে উঠতে ১৫০০-১৯০০ এই চারশো বছর সামগ্রিকভাবে ধরতেই হয়। আজ বিংশ শতকের শেষে চৈতন্যের সময় থেকে আমাদের চৈতন্যোদয় হওয়ার জন্য এই পাঁচশো বছরে এমন একটি কোষগ্রন্থ পাওয়া গেল যার মূল্য অপরিসীম।

এই ঐতিহাসিক গ্রন্থটির প্রবন্ধ সংখ্যা নেই নেই করেও তেইশটি। এই সংকলনের ভূমিকাটিও একটি প্রবন্ধ বলা যায় এবং সযত্নে কৃত পরিশিষ্টাংশও কম যায় না। মুখপাতচিত্র ও মানচিত্র ধরে ত্রিশটি ছবি। মুখবন্ধসহ এই বইটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করতে যে অভিজ্ঞতা এবং সময় লেগেছে এবং যা ব্যয় হয়েছে তা অনুমানের বাইরে। কিন্তু শেষ অব্দি বইটি যে প্রকাশিত হয়েছে তা পাঠক, গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের এক পরম প্রাপ্তি বলে ধরতে হবে।

সংকলনটির সূচনা হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের অধ্যাপক অমিতাভ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ দিয়ে এবং এই সংকলনে তাঁর বিষয় 'চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচয়'। সেখানে বঙ্গভূমির অঞ্চলসমূহের ন'টি ভাগের কথা বলা হয়েছে যেমন পুন্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ়, সুহ্ম, গৌড়, বঙ্গ, বঙ্গাল, সমতট, হরিকেল। পরবর্তীকালে গৌড় এবং বঙ্গ এই দুটি নামে এই গাঙ্গেয় ও নদীভিত্তিক অঞ্চলটি সমধিক পরিচিত হয়। চৈতন্যজীবন ও তাঁর লীলা বিষয়ক গ্রন্থ থেকে এর উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। পালযুগের শেষ থেকে সেন যুগ পেরিয়ে পাঠান আমল পর্যন্ত ভৌগোলিক নাম, বিবর্তনের ধারা ও ঐতিহাসিক পরিচয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই সময়ের ভৌগোলিক ইতিহাস যেহেতু মূলত সাহিত্যনির্ভর এবং সাহিত্য ইতিহাসের একটি বড় উপাদান হলেও তার সঙ্গে সমকালীন অন্য ইতিহাস মিলিয়ে না নিতে পারলে অতিকথনের সমস্যা থেকে যায়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও শ্রীভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে একটি খণ্ডিত ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক মানচিত্র নির্মাণের প্রয়াস বর্তমান। সঙ্গে গ্রথিত হয়েছে কুমুদরঞ্জন দাসের প্রবন্ধ 'চৈতন্য-সমসাময়িক বাংলার রাজনৈতিক পটভূমি'। মহম্মদ ঘুরির সময় থেকে কীভাবে বাংলায় মুসলিম শাসন সুবিস্তৃত হল, কীভাবে রুকনুদ্দিন বরবক শাহ থেকে হোসেন শাহের আমল পর্যন্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও ভেদ-বিভেদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যশক্তির দুর্বলতা প্রকট হল এবং চৈতন্যের নেতৃত্বে এক নবজীবন সঞ্চার হল এবং ইসলামীয় শাসনের মধ্যে থেকেও 'চৈতন্যদেবের মতো যুগান্তকারী ব্যক্তি প্রতিভার আবির্ভাব ও বিকাশ সম্ভব' হল সে-কথা বলতে চেয়েছেন। এই বর্ণনায় মুসলিম সুলতানদের ইতিহাস যতখানি পাওয়া গেল, চৈতন্যদেবের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রটি তেমন মজবুতভাবে পাওয়া গেল না বলে আক্ষেপ থেকে যায়। হয়ত এই সময়ের কোনও সামাজিক ইতিহাস নির্মাণ করা যায়নি বলেই এমনটি ঘটে। গ্রন্থের সম্পাদকরা সে কথা অবশ্য আগেই বলে নিয়েছেন।

এই অপূর্ণতা কিছুটা পুযিয়ে গেছে অনিরুদ্ধ রায়ের 'চৈতন্যদেবের আমলে বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধটি থেকে। যে-সামাজিক ইতিহাসের কথা উল্লেখ করেছিলাম, নীহাররঞ্জন রায়ের গ্রন্থটি বাংলাভাষায় এখন একমাত্র আকর গ্রন্থ। অনিরুদ্ধ রায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের সময়সারণী ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন। ব্যবসা–বাণিজ্য শ্রেণী ও বর্ণবিভাগের রূপরেখাটি অনেকটাই সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর রচনায়।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জগদীশনারায়ণ সরকারের প্রবন্ধ ' গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সমকালীন ভক্তিবাদে' আমরা চৈতন্য পূর্ববর্তী ও চৈতন্যদেবের সমকালীন ইতিহাসে যা মূলত ধর্মীয় এবং সেই অর্থে ভারতীয় সমাজের বিবরণ — এই বিশাল ক্ষেত্রের সন্ধান পাই। তিনি অবশ্য মনে করেন, 'মধ্যযুগে ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা হলো হিন্দুধর্মে পুনরভ্যুদয় ও সংস্কার আন্দোলন।' তিনি তারপরেই সে কথা হান্টার, ফসেট প্রমুখ সাহেবদের উল্লেখ করে উত্থাপন করেন। কিছু প্রশ্ন তিনি এই প্রসঙ্গে তুলে ধরেছেন। তার নিজের কথাতেও চৈতন্যের আন্দোলন প্রসঙ্গে তার নিরসন হয়নি।

কয়েকটি প্রশ্ন সমাধানের অপেক্ষা রাখে:

*(১) নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্য কি ঐস্লামিক চিন্তাধারা ও রীতির সংস্পর্শে এসেছিলেন? তিনি কি কোনও সুফির সঙ্গে দীর্ঘকাল কাটিয়েছিলেন? (২) শ্রী চৈতন্যের জন্মস্থান ও সংস্কৃতশিক্ষার প্রধানকেন্দ্র নবদ্বীপ কি বাঙলার অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলের মতো সুফি প্রভাবে সম্পূর্ণ অনুসিক্ত ছিল?*

তিনি নিজেই সমাধান করে বলেন — এর উত্তর — না। তাঁর মতে চৈতন্য বর্ণভেদ মানতেন, কেননা তিনি উঁচুনিচুর ও জাতিপ্রথার রাশ আলগা করে দিলেও তার অবলুপ্তি ঘটাননি। কোনও ব্যক্তি কি কোনও পূর্বতন প্রথার অবলুপ্তি ঘটাতে পারেন? শ্রীচৈতন্য যে উদারতা হিন্দুধর্মে আনতে চেয়েছিলেন তার কারণ যেমন গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণের প্রতিবাদ, তেমনই ঐস্লামিক প্রভাব। ঐস্লামিক আপাত উদারতা ও শাসকের আনুকূল্য হিন্দু নিম্নবর্গীয় জনসমাজকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করছিল, এ





কথা এই গ্রন্থেই বলা হয়েছে। সমস্যা হল, এই ধরনের সংকলনে চিন্তার সমতা আসা সম্ভব নয়। তবে 'হেতেরোজিনিইটি' অনেক সময় যে অস্বচ্ছতা সৃষ্টি করে এই বড় গ্রন্থে তার নিরসন প্রায় অসম্ভব।

অন্যতম সম্পাদক অবন্তীকুমার সান্যালের সুলিখিত প্রবন্ধ 'চৈতন্য জীবনকথা'-য় পরিষ্কার বলা আছে চৈতন্য পূর্ববর্তী বাংলায় বৈষ্ণব সংস্কৃতির সূত্রকথা। সুতরাং এই ধর্মীয় সংস্কৃতি কেবল নবদ্বীপ কেন্দ্রীক এমন ভাবনার স্থলে ভুল হবার সম্ভাবনা। তিনি লিখেছেন, 'চৈতন্যের জন্মের আগে থেকে নবদ্বীপে "বৈষ্ণব" আখ্যাত একটি গোষ্ঠী সক্রিয় ছিল। নবদ্বীপ ছাড়াও অন্যত্র বৈষ্ণব গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল'। এই সত্য প্রতিভাত হচ্ছে যে সে ক্ষেত্রে জগদীশনারায়ণ 'প্রভাব' প্রসঙ্গ প্রক্ষিপ্তভাবেই টেনেছেন।

সংকলনটির উল্লেখযোগ্য রচনা বিষ্ণুপদ পান্ডার 'শ্রীচৈতন্য ও উড়িষ্যা'। এখানে কিন্তু মুসলমান শাসকদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, কুমুদরঞ্জন দাসের সমসাময়িক রাজনৈতিক পটভূমি বর্ণনার সঙ্গে তা মেলে না। এখানে ইলিয়াস শাহ বা বরবক শাহ ও পরবর্তীকালে হোসেন শাহকে হিন্দুবিদ্বেষী বলে বর্ণনা করা হয়নি। বরঞ্চ তাদের উদার শাসননীতির প্রশংসা করা হয়েছে। হোসেন শাহ সম্পর্কে সরলীকৃত গালাগাল যেমন 'ম্লেচ্ছ রাজা' বা 'স্বভাবেই রাজা মহাকাল যবন' এসব তাঁর মতে মুসলিম আধিকারিকদের হোসেনের নাম করে হিন্দুবিরোধী বা বৈষ্ণববিরোধী আচরণ। কুমুদরঞ্জন লিখেছেন, ....'যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে হোসেন শাহ সম্বন্ধে এই ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মুশকিল।' বৈষ্ণব রচনাকারদের এই ধরনের মন্তব্যের চূড়ান্ত বিরোধিতা করে তিনি লেখেন ... 'এইসব বক্তব্য থেকে মনে হয় যে হোসেন শাহ নয় বরং কোনো কোনো বৈষ্ণব লেখকই ছিলেন সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন।' এক এক জন লেখকের এক এক রকম দৃষ্টিভঙ্গি। তথ্য ও বিশ্লেষণে কোথাও কোথাও উলট পুরাণ। সম্পাদকদের সমস্যা বুঝেও মনে হয়, যেহেতু তাঁরা বিদগ্ধজন, এই সমস্যায় পাঠকের যে ধাঁধাঁ লাগতে পারে এবং কেন লেখকরা বিপরীত কথা বললেও তাঁরা সে-বিষয়ে এক সাধারণ সত্যে পৌঁছতে অপারগ সে কথা জানানো, প্রয়োজনীয় ছিল।

বিষ্ণুপদ পান্ডা প্রথমেই লিখেছেন, বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ১৫১০ সালে। ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কয়েকবার নবদ্বীপ-নীলাচল যাতায়াত করার পর শেষবার (?) এসে আর প্রত্যাবর্তন করেননি। কারণ? অবাধ জগন্নাথ দর্শন। ইদানীং চৈতন্যদেবের অধিকার বা সত্ত্ব নিয়ে নানা প্রশ্ন। শ্রীপান্ডার সহজ সমাধান –বিশ্বম্ভর নবদ্বীপের, কিন্তু চৈতন্য উড়িষ্যার। উড়িষ্যার সাহিত্যে চৈতন্যের প্রভাব বা তার ওড়িয়া ভাষায় জীবনচরিতের তেমন কিছু দৃষ্টান্ত দেননি। কাহ্নই খুন্টিয়ার একটি বর্ণনাই পাওয়া যায় প্রবন্ধে —

*শ্রীপ্রভুর নৃত্যক্রীড়া ক্ষেত্রে দেখিলাইঁ*
*জনম পুনি জনম ক্রিয়া মুঁ ছড়িলইঁ— ইত্যাদি*

এ ছাড়া জগন্নাথ দাসের 'নবাক্ষরী' ছন্দে পদ রচনার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। প্রশ্ন হল, কেন এ-প্রসঙ্গ? বাংলা ভাষায় চৈতন্যকে নিয়ে পদকর্তার সংখ্যা এবং যে বিপুল সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সঞ্চারিত, ওড়িয়া ভাষায় সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে দেখা যায় তা অপ্রতুল। তা হলে চৈতন্য কোন প্রদেশের এবং কেন এসব আলোচনাও অর্থহীন।

শ্রীচৈতন্য ও উড়িষ্যা প্রসঙ্গে ইদানীং বিতর্ক উঠেছে চৈতন্যদেবের মৃত্যু নিয়ে। তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন, না স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল, না তিনি নিহত হয়েছিলেন। শ্রীপান্ডা লিখেছেন — 'জগন্নাথদর্শনের সময় ভাবাবেগে শ্রীচৈতন্যের পতন ও আকস্মিক মৃত্যু হয়।'

*কিন্তু সেই একই অনুচ্ছেদে তিনি লিখছেন 'উনি জগন্নাথ দর্শনে এলে তাকে সপার্ষদ মন্দিরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হত। আকস্মিক ঘটনার পর রাজার কাছে সংবাদ প্রেরিত হয় এবং তাঁরই আদেশে অলক্ষ্যে শবদেহ বহন করে নিয়ে গিয়ে তীর্থে প্রাচী নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল'।*— অর্থাৎ লেখক 'ভাবাবেগে মৃত্যু' কথাটির সপক্ষে তথ্য দিতে পারছেন না। 'অলক্ষ্যে', 'আকস্মিক' শব্দগুলি সন্দেহ ও প্রশ্নের জন্ম দেয়। তা ছাড়া 'গুপ্তপথের' কথাও বলা হয়েছে। কোথাও যেন একটি যড়যন্ত্রের আভাস, রহস্যের আবরণ ঘিরে রয়েছে শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুকে।

আহমদ শরিফ তাঁর 'ইসলাম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ' প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্য যে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের এবং সেই ধর্মকে জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রে এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন, সে কথা বলেছেন।

*'যদিও চৈতন্যদেবের মতবাদ ছিল বেদধর্মবিরোধী ('হেন মহাঠাকুরানী ভাব যার মনে উপজয়। বেদধর্ম তেজি সে কৃষ্ণকে ভজয়') , তবু সেদিন মত-পথের পার্থক্য সত্ত্বেও কার্যত হিন্দুর অখণ্ড জাতিসত্তার রক্ষক বলেই তাঁর কাছে হিন্দুমাত্রই ধনী।'*

তিনি চৈতন্যদেবের মৃগীরোগ ও মতিচ্ছন্নতার কথা বলতে ভোলেননি। কেননা, শ্রীচৈতন্যকে রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে

তিনি দেখতে পেয়েছেন। একই সঙ্গে 'সুফি' মত বৈষ্ণবধর্ম এবং তার জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে কথাও বলেছেন। দুটি টেক্সট্ পাশাপাশি রেখে তিনি বৈষ্ণবদর্শনে সুফি ও ইসলামের প্রভাবের কথা বলেছেন —

| হাজি মুহম্মদের ভাষায়: (সুরতনামা) | কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায়: শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত |
|---|---|
| *বীজ হোক্তে বৃক্ষ যেন বৃক্ষ হোক্তে ফল*<br>*ফল বৃক্ষ বীজ এ তিন নাম হয়*<br>*একে হয় তিন জান তিনে এক হয়*<br>*ফল আর বৃক্ষ যেন দুই এক কয়,*<br>*তথাপি ফলের বৃক্ষ কহনে না যায়।* | *মৃগমদ আর গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ*<br>*অগ্নিজতে যৈছে নাহি কভু ভেদ।*<br>*রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ*<br>*লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।* |

তিনি বিশদ ব্যাখ্যা করে বলেছেন:

*বৈষ্ণবদের নামজপে ভজনে কীর্তনে নর্তনেই ঈশ্বরোপাসনা। জীবে দয়া (সৃষ্টিপ্রেমেই স্রষ্টা প্রেমের প্রকাশ), বলি পরিহার, বিনয় (নিজেকে তৃণাদপি ক্ষুদ্র এবং অন্যের চাইতে নির্গুণ মনে করা অর্থাৎ অহঙ্কার পরিহার করা) নামে রুচি, সখীভাব, দশা, ঐশ্বর্যপ্রদর্শন প্রভৃতি সুফিদের জিকর, যিদমত, (স্রষ্টাপ্রেম লক্ষে) সৃষ্টির প্রীতি ও (সেবা), সামা (গান), হাল (দশা) সদাসোহাগ (সখীভাব), কিরামতি (ঐশ্বর্যপ্রদর্শন) এবং পূর্বরাগ, অনুরাগ, বিরহ মিলন প্রভৃতি।*

এই বিশ্লেষণে পাণ্ডিত্যের চাইতে সাধারণ সত্যকে আবিষ্কার করার গুরুত্ব বেশি যা সাধারণ সত্যকে ঘোলাটে করে দেয়।

আমার মতে আহমদ শরিফের মতো মানুষই পারেন এমন নির্মোহ প্রবন্ধ রচনা করতে। এই সত্যসাধনে তিনি ইসলামি মৌলবাদীদের দ্বারাও আক্রান্ত হন। আক্রান্ত হবার পরের দিন সকালে তাঁর বাসভবনে তাঁর মধ্যে কোনও ভয় বা ভ্রুক্ষেপ দেখিনি। তিনি বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে গোঁড়ামির সঙ্গে সহজ ভক্তির দ্বন্দ্বও দেখেছেন। গোস্বামী বনাম সাধারণ মানুষ। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, *'চৈতন্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক বেশী পেত যদি চৈতন্যের উদার মানবিকতার প্রভাব গভীর, আরো বিস্তৃত, আরো দীর্ঘস্থায়ী হত। তা হয়নি।'*

সমস্ত বইটিতে আমি মুগ্ধ হয়েছি বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ পড়ে। আহমদ শরিফ, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, হিতেশ সান্যাল এঁরা সবাই প্রয়াত। আমার মনে হয়েছে অগ্রণী পাঠক মন দিয়ে এঁদের রচনা পড়লে লাভবান হবেন। এঁদের রচনায় কোনও দেখানো পাণ্ডিত্য নেই। পাণ্ডিত্য এঁদের স্বভাব অধিগত। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য তাঁর **শ্রী চৈতন্যদেব: গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় ও সংস্কৃত সাহিত্য** প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্যের বিপুল সংস্কৃতজ্ঞান, ন্যায়চর্চ্চা ইত্যাদি মিথ ভেঙে দিয়ে তাঁর রচিত ৮টি শ্লোকের কথা বলেছেন যা তাঁর মতে তথ্যসম্মত। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে পরিমাণ সংস্কৃতসাহিত্য রচনা করেছেন তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে ইংলন্ডে ল্যাটিনের মতো ভূমিকা পালন করেছে এই সময়ের বৈষ্ণব সাহিত্যের সংস্কৃত রচনা।

*সংস্কৃত শ্রব্যকাব্যের আরো কয়েকটি শাখায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের দানও নগণ্য নহে। বিশেষত তাঁদের রচনার দ্বারা সংস্কৃত চম্পুকাব্যের ভাণ্ডার যে নতুন রূপে ও রসে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই*

সংস্কৃতসাহিত্যে এই অবদান নিয়ে তিনি যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছেন তা কেবল বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের পক্ষেই সম্ভব। আমি ভূমিকায় রেনেশাঁস সম্পর্কে যা বলেছি তা বহ্নিমি মত। শ্রী বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য একই মত পোষণ করেন। তাঁর সমগ্র প্রবন্ধটির সিদ্ধান্ত তদনুযায়ী।

এটা বলতেই হত যে বৈষ্ণব প্রভাবে একটি অল্পবিস্তর সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল হিন্দুজনজাতি জীবনে। আর তার ফলে এক ধরনের ধর্মীয় সহনশীলতার জন্ম হয়েছিল মুসলিম শাসনে। ইংলন্ড নর্মানদের অধিগত হলেও তারা পরে জনজীবনের অঙ্গীভূত হয়। এখানেও হিন্দুমুসলিম মিশ্র সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য মিলিত হয়ে যে নব্যধারা প্রবাহিত হল বহ্নিমচন্দ্র ও বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য তাকেই 'নবজাগরণ' আখ্যা দিতে চাইলে তা গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়।

এই গ্রন্থের আর দুটি প্রবন্ধের কথা আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। একটি হিতেশরঞ্জন সান্যালের 'বাংলার কীর্তন' এবং অন্যটি অশোক ভট্টাচার্যের 'চৈতন্য-আশ্রিত বাংলার রূপকলা'। সৌভাগ্যক্রমে 'বাংলার কীর্তন' প্রবন্ধটি বাংলা সাহিত্যে একটি অসামান্য প্রবন্ধ বলে খ্যাত হয়েছে। নিজে যেহেতু বৈষ্ণব ছিলেন এবং একই অর্থে গান্ধীবাদী ছিলেন এই দুটি বিষয়ে তাঁর পড়াশুনো ও চর্চা ছিল বিপুল। হিতেশরঞ্জন কখনও গোঁড়ামিতে ভুগতেন না। চৈতন্য ও গান্ধীর দর্শন তাঁকে সাধারণ মানুষের বন্ধু করে তুলেছিল। এমন হৃদয়বান পণ্ডিতমানুষ আজ দুর্লভ। কীর্তনের সংজ্ঞা থেকে শুরু করে তার ইতিহাস তিনি সুচারুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা জানতাম কীর্তন ও সংকীর্তনের একই অর্থ। 'বহুলোক একত্রিত হয়ে বহুবিধ বাদ্যসহকারে সমস্বরে কীর্তন করলে তাকে বলা হয় সংকীর্তন।' আগে চর্যাপদ সমস্বরে গাওয়া হত। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত কীর্তন সেই সময় বহুলোকের কাছে অভিনব ঠেকেছিল। বাংলা সংস্কৃতিতে নৃত্যগীত তেমন ছিল না। প্রকাশ্য ধর্মাচরণ করে কীর্তন করা তাদের বিরক্তি ও ক্রোধের



কারণ হয়েছিল। তারা বলত হরিনাম তো মনে মনে নিতে হয়, 'ঘড়াঘড়ি বলিয়াছে কেমন পুরাণে' ( চৈ.ভা. ২/২৩)। তারা রাগ করে বলত —

কৃষ্ণের কীর্তন করে যত বাঢ় বার।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়।। ( চৈ.চ. ১/১৭)

শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত এই কীর্তনের বিভিন্ন প্রকার এবং চৈতন্যদেবের ব্যক্তিগত জীবনে তার প্রভাব ও ব্যবহার তিনি বিভিন্ন চৈতন্যজীবনী থেকে বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। পদগানের উল্লেখ করে তার ব্যবহার কীভাবে হত বিস্তৃতভাবে তিনি সে-সম্পর্কে জানিয়েছেন। কীর্তনের পুরো ব্যাকরণ ও প্রকার নিয়ে এমন সহজভাষায় প্রবন্ধ লেখা যায় এই প্রবন্ধটি না পড়লে তা বোঝা যায় না।

নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর 'শ্রীচৈতন্যদেব ও লোকমানস' প্রবন্ধে বৈষ্ণব সংস্কৃতি কীভাবে উভয় ধর্মের মধ্যে বহমান হয়েছিল সে-কথা বলেছেন। চৈতন্যদেবের 'সন্ন্যাস' গ্রহণের ঘটনাটির মধ্যে নাটকীয়তা এমনই যে—'হাসান-হোসেনের কাহিনী নিয়ে যে জারী গান, তাতেও এটি গৃহীত হয়েছে'।

অশোক ভট্টাচার্য 'চৈতন্য-আশ্রিত বাংলার রূপকলা' প্রবন্ধটিতে যে পরিমাণ তথ্য ও বিশ্লেষণ পরিবেশন করেছেন তার ফলে এই মূল্যবান প্রসঙ্গটি এই সংকলনের একটি অতি-উল্লেখযোগ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে যে বিচিত্র চিত্রকলা ও ভাস্কর্য সৃষ্টি হয়েছিল, এক কথায় তার এনসাইক্লোপেডিক উপস্থাপনা হয়েছে এই প্রবন্ধে। বিভিন্ন শতকে রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য অবলম্বনে নির্মিত কি টেরাকোটা কি ভাস্কর্য কি চিত্র — এমন অসংখ্য সাদা কালো ছবির মুদ্রণ বইটির ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

সমস্ত সংকলনটি পড়লে সাধারণভাবে কতগুলি কথা মনে হবে। সম্পাদকদ্বয় তাঁদের ভূমিকায় যে আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং দর্শনের প্রেক্ষিতে বিষয়টি দেখতে চেয়েছেন প্রবন্ধকারেরা ঠিক সেভাবে লেখেননি। আমার মনে হয়েছে লেখাগুলি সংগ্রহের পর একটি 'ভণিতা' লেখা হয়েছে, তার সঙ্গে লেখার সম্পর্কের বদলে তাঁদের নিজস্ব বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন। এই রেখাচিত্রটি সরলরৈখিক যে নয় লেখাগুলি তার প্রমাণ। কিন্তু প্রবন্ধ হিসাবে লেখাটি মূল্যবান। এই সংকলনেও ভাল প্রবন্ধের পাশাপাশি বেশ খারাপ প্রবন্ধ থেকে গেছে। সংকলনের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে থাকে। কিন্তু সব মিলিয়ে ছ'শো পৃষ্ঠার এই সংকলনটি একটি অসাধারণ প্রয়াস। প্রতিটি গ্রন্থাগার এবং বাংলা সাহিত্যের আগ্রহী পাঠকের কাছে এই বিপুল গ্রন্থটি অবশ্যই সংগ্রহযোগ্য। সুসম্পাদিত, প্রায় নির্ভুল এবং সযত্নে মুদ্রিত এই বই বাংলাভাষায় ইতিহাস ও চিন্তনের জগতে একটি অমূল্য সংযোজন হয়ে রইল।

**চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান — সম্পাদনা, অবন্তীকুমার সান্যাল ও অশোক ভট্টাচার্য**
সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা—৬/ ২৭৫.০০।

চতুরঙ্গে লেখা পাঠানোর সময় স্পষ্ট হস্তাক্ষরে, পৃষ্ঠার বাঁ দিকে আর ওপরে-নীচে কিছুটা ছেড়ে, ইংরেজি শব্দ বা বাক্য স্পষ্টভাবে লিখে, উদ্ধৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে শুরুতে ও শেষে সঠিকভাবে উদ্ধৃতিচিহ্ন বসিয়ে এবং সাম্প্রতিক কালের মান্য বানানরীতিতে পাণ্ডুলিপি তৈরি করার জন্য আমরা লেখকদের অনুরোধ জানাই। লেখার ফোটো কপি বিবেচনা করা হবে না।

গ্রন্থসমালোচনা

# শুধু ব্যক্তির নয়, বিশেষ কালপর্বের বৃত্তান্ত

## সুরজিৎ দাশগুপ্ত

মানবেন্দ্রনাথ রায় বিংশ শতাব্দীর মহান মানবিকতাবাদীদের অন্যতম, কিন্তু তিনি জীবন শুরু করেছিলেন সন্ত্রাসমূলক জাতীয়তাবাদী রূপে। অনুন্নত ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থায় সাম্যবাদের মৌলনীতিগুলির ঔচিত্য ও যাথার্থ্য নির্ধারণের ব্যাপারে তাঁর স্থান লেনিন ও মাও-এর সঙ্গে, আবার আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অবস্থান ও ইতিহাসের বিচারে তাঁর স্থান রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলালের পাশে এবং রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ-জওহরলালের মতোই তিনিও ছিলেন এক বিশ্ব-নাগরিক। তাঁর মেধা, মনীষা ও যুক্তিবাদিতা লেনিন-নেহরু প্রভৃতি সুবিখ্যাত রাজনৈতিক পুরুষদের চমৎকৃত করেছিল। বাংলার বাইরে, এমনকী ভারতেরও বাইরে বুদ্ধিজীবী মহলে মানবেন্দ্রনাথের বিপ্লবচিন্তা ও মননশীলতা নিয়ে গবেষণা হয়। তিনি শুধু আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন সমাজ-দার্শনিক ছিলেন না, একই সঙ্গে ছিলেন একজন দুঃসাহসিক অভিযাত্রী, কর্মবীর ও সংগঠক — তাঁর জীবন ছিল রুদ্ধশ্বাস নাটকীয় ঘটনাবলিতে বর্ণাঢ্য ও রোমাঞ্চকর।

এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে একটি বৃহৎ প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনার কাজে হাত দিয়েছেন আর একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও বিদগ্ধ মানুষ—শিবনারায়ণ রায়। এর আগে মানবেন্দ্রনাথের জীবন নিয়ে যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে সে সবের সঙ্গে শিবনারায়ণের আরব্ধ জীবনীর তুলনা চলে না। মানবেন্দ্রনাথের জীবনী রচনার প্রধান সমস্যা এই যে তাঁর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ সরকারি তথা সাধারণের দৃষ্টির ও জ্ঞানের বাইরে এবং বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে গুপ্তভাবে অতিবাহিত, তাঁর রচনাবলিরও সুবৃহৎ অংশ স্প্যানিশ, জার্মান, রুশ, ফরাসি, এমনকী চৈনিক ভাষায় প্রকাশিত এবং আরও এক অংশ গোপনে লিখিত ও বিতরিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নামে জীবন শুরু করে মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে যিনি জীবন শেষ করেন তাঁর জীবনী রচনার জন্য যাত্রা শুরু করা কলম্বাসের মতো পশ্চিমের জলরাশির ওপারে জনশ্রুত কোনও সোনার দেশ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে দুঃসাহসিক অভিযানেরই সমতুল্য।

শিবনারায়ণ রচিত এই জীবনীর প্রধান বৈশিষ্ট্যই গবেষণার গভীরতা ও প্রসারতা। প্রথম খণ্ডে বিবৃত হয়েছে মানবেন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম পঁয়ত্রিশ বছরের কাহিনী। এক-একটি তথ্যের সঙ্গে তার উৎস ও তৎসংক্রান্ত তথ্যাবলি, আবার সেই তথ্যগুলিরও উৎস উল্লেখ করে গেছেন পদে পদে। প্রথম অনুচ্ছেদেই গ্রন্থকার জানিয়েছেন যে কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে কীভাবে মানবেন্দ্রনাথ নিজস্ব মত পেশ করে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন। এর টীকাতে তিনি একটি জার্মান গ্রন্থসহ সাতটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন যেগুলিতে এই কংগ্রেসের বিশদ বর্ণনা এবং লেনিনের মূল বক্তব্যর পূর্ণপাঠ পাওয়া যাবে আর মানবেন্দ্রনাথের বক্তব্যর পাঠটি কোনখানে পাওয়া যাবে তারও হদিশ দিয়েছেন। এইভাবে আগাগোড়া প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম ও বৌদ্ধিক শৃঙ্খলার সঙ্গে অধ্যাপক রায় এই জীবনী প্রণয়ন করেছেন। প্রয়োজন অনুসারে তিনি কখনও আফগানিস্তানে গঠিত স্বাধীন ভারত সরকার সম্বন্ধে এম. সারওয়ার সম্পাদিত উর্দু ভাষার গ্রন্থ থেকে, কখনও স্বয়ং মানবেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত আত্মস্মৃতি থেকে, কখনও মেকসিকোর ইউকাতান প্রদেশের গভর্নর সালভাদোর আলভারাদোর স্প্যানিশে লেখা স্মৃতিকথা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, আবার কখনও ১৯১৪-১৯ পর্বে যুক্তরাষ্ট্রে ও জাপানে ভারতীয় বিপ্লবীদের কাজকর্ম ও স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে লালা লাজপত রায়ের ব্যক্তিগত কাগজপত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলিও হিসাব করে ব্যবহার করেছেন। যেখানে লিখিত উপাদানের থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাননি সেখানে যাঁর কাছ থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য পাওয়া যেতে পারে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অন্যত্র প্রাপ্ত তথ্য ও সূত্র যাচাই করে নিয়েছেন। কোনও তথ্য নির্বিচারে ব্যবহার করেননি, সংগৃহীত তথ্যগুলির physical verification এর পরে ব্যবহার করেছেন।

এই গ্রন্থের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হল মানবেন্দ্রনাথের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার পশ্চাৎপটকে বিশদভাবে উপস্থাপনা যাতে পাঠক স্পষ্ট রূপে অনুধাবন করতে পারে দেশকালপাত্রের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক ঘটনাটির বহুমাত্রিক গুরুত্ব। গ্রন্থটির এই বৈশিষ্ট্যের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হল স্পেনের শাসন থেকে মেকসিকোর স্বাধীনতালাভের পরে সে-দেশের রাষ্ট্রে ও সমাজে ক্ষমতার বিন্যাস কীভাবে হল ও পাশাপাশি মেকসিকোর





উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জুলুম কী ধরনের চেহারা নিল সে সবের বিশদ বৃত্তান্ত এবং সে সবের পরে গ্রন্থকার এসেছেন ভেনুসতিয়ানো কারানজার অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গে ও সে সঙ্গে কারানজার রাষ্ট্রপতিত্বে ১৯১৭ সালে যে-সংবিধান রচিত হল তার উল্লেখযোগ্য ধারাগুলির বর্ণনায়। মেকসিকোর আপন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সমস্যাগুলির থেকে কীভাবে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিকাশ হল তার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের ভেতরেই জন্ম নিল মানবেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব। এমন সময় বরিষ্ঠ বোলশেভিক নেতা মিখেল বোরোদিন কপর্দকশূন্য অবস্থায় উপস্থিত হলেন মেকসিকোয়। লেনিনের নির্দেশে তিনি বের হয়েছিলেন রুশ জারের মুকুটের হিরে-জহরত মার্কিন মুলুকে বিক্রয় করে রুশ বিপ্লবের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁর পরিকল্পনা পণ্ড হয়। মেকসিকোতে সমাজতন্ত্রবাদীদের স্প্যানিশ পত্রিকার ইংরেজি বিভাগ থেকে তিনি খুঁজে পেলেন মানবেন্দ্রনাথকে, গিয়ে উঠলেন মানবেন্দ্রনাথের বাসায় এবং তিনিই মার্কসবাদে দীক্ষা দিলেন মানবেন্দ্রনাথকে, তিনিই মানবেন্দ্রনাথের কথা জানালেন লেনিনকে আর তাঁরই সূত্রে মানবেন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ পেলেন কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে।

এইভাবে মানবেন্দ্রনাথ ভারতের মধ্যবিত্তশ্রেণীর জাতীয়তাবাদী জঙ্গি রাজনীতি থেকে মেকসিকোর সমাজতন্ত্রবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন এবং সেখান থেকে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক বস্তুতান্ত্রিক তত্ত্বজিজ্ঞাসায় ও সংগঠনের কাজে এতই বিখ্যাত হয়ে উঠলেন যে কমিনটার্নের অধিবেশনে অংশ নেওয়ার জন্য আহূত হলেন। মানবেন্দ্রনাথ ও এভেলিন মসকোর পথে রওনা দিয়ে বার্লিনে পৌঁছলেন ১৯১৯এর ডিসেম্বরে। এখানে তাঁরা যে-মাস-চারেক ছিলেন তার বিবরণ এ গ্রন্থের এক বিশেষ সম্পদ। এ সময় এখানে প্লেখানভ, কাউটস্কি, বের্নস্টাইন, হিলফেরডিঙ প্রভৃতি মনীষী আপন আপন অনন্য মেধার আলোয় বৈজ্ঞানিক বস্তুতন্ত্রবাদের এমন ভাবে চর্চা ও ব্যাখ্যা করছিলেন যে ওই দর্শন ও তার প্রয়োগ মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন সম্ভাবনাময় ইতিহাসের সূচনা করে। এইসব ব্যক্তিত্বের মধ্যে উজ্জ্বলতম ছিলেন রোজা লুকসেমবুর্গ। প্রচুর বিভেদ সত্ত্বেও স্বয়ং লেনিন রোজার প্রতিভার ঊর্ধ্বচারিতাকে শ্রদ্ধা করতেন, তাঁকে উল্লেখ করতেন বৈজ্ঞানিক দর্শনের গগনবিহারী ঈগল পাখি বলে এবং আজও রোজা সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের অন্যতম প্রধান তত্ত্ববিদ রূপে সমাজ-বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃত। আমরা সাধারণত সাম্যবাদের যে সব ব্যাখ্যা পড়ি সে সব বোলশেভিক রাশিয়ার বা গণ-প্রজাতান্ত্রিক চিনের মার্কামারা বয়ান, যেগুলির মধ্যে চিন্তার যান্ত্রিকতা প্রকট। ঘোর শীতকালে বার্লিনে পৌঁছনোর পরে রায়দম্পতি যে উষ্ণ মেধাবী পরিবেশের মধ্যে চার মাস অতিবাহিত করেন তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন শিবনারায়ণ। আর সেই সূত্রে রোজা লুকসেমবুর্গের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ উপস্থাপন করেছেন বহু অসাধারণ ব্যক্তিত্ব কর্তৃক বিশ্লেষিত বহুমাত্রা সংবলিত বস্তুতন্ত্রবাদের পরিচয়। বার্লিনবাসের অভিজ্ঞতা মানবেন্দ্রনাথকে নিজের অভিজ্ঞতাবলির ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার প্রেরণা ও সাহস জোগায়।

অতঃপর রায়দম্পতি পৌঁছলেন মসকোর মঞ্জিলে। ১৯২০-র মে-জুন-জুলাই এই তিনমাস মস্কো অবস্থানকালে তাঁরা দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগদানের জন্য বহু দেশ থেকে আগত বহু প্রতিনিধির সঙ্গে তত্ত্ব-ও-তথ্য বিনিময়ের সুযোগ পেলেন। এখানে শিবনারায়ণ সংক্ষেপে লেনিনের তিনটি নিবন্ধের বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক বিষয়ে তৃতীয় নিবন্ধটির উপরে মানবেন্দ্রনাথের দশটি প্রস্তাবের সংক্ষিপ্ত-সার দিয়েছেন। যদিও কংগ্রেস মানবেন্দ্রনাথের দশটি প্রস্তাবকে লেনিনের নিবন্ধটির পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করে তবু দু'জনের চিন্তার মৌল প্রভেদকে চাপা দিতে পারেনি। মানবেন্দ্রনাথ কংগ্রেসে এসেছিলেন মেকসিকো পার্টির প্রতিনিধি রূপে, কিন্তু লেনিন তাঁকে স্বীকৃতি দিলেন এশিয়ার পরিস্থিতির প্রধান ব্যাখ্যাকার হিসাবে। শিবনারায়ণ লেনিন-চরিত্রের মূল্য-নির্ণয়ে তাঁকে উদার, বাস্তববাদী ও বোলশেভিক নেতৃত্বের প্রধান হয়েও পরমতের ও পরযুক্তির প্রতি ধৈর্যশীল তথা শ্রদ্ধাশীল বলেছেন।

তাই লেনিন পুনঃপুনঃ মতান্তর সত্ত্বেও ট্রটস্কি, বুখারিন, জিনোভিয়েভ প্রমুখের গুণগ্রাহী ছিলেন। একই কারণে তিনি মেকসিকোর কমিউনিস্ট পার্টির সবচেয়ে প্রতিভাবান প্রতিনিধিকে তাসকেন্ট বা তাসখন্দের সেন্ট্রাল এশিয়াটিক বুর‍্যোর কাজে পাঠালেন। রায়দম্পতির তাসকেন্টে যাওয়ার যে বর্ণনা শিবনারায়ণ দিয়েছেন তার ভিত্তিতে হলিউডের একটা শ্বাসরোধী সিনেমা হয়ে যায়। যা হোক, তাসকেন্ট-এ এসে মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে আসা মুহাজিরদের যোগাযোগ হয়। এই মুহাজিরদেরও আন্দোলন ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে, কিন্তু তার প্রেরণা ছিল ধর্মীয় এবং ভারতের খিলাফত আন্দোলনেরই সমগোত্রীয়, আবার খিলাফত আন্দোলনও ছিল ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। জঙ্গি জাতীয়তাবাদী রূপে জীবন শুরু করে মানবেন্দ্রনাথের সেই আন্দোলনের সঙ্গে পুনরায় সংযোগ হল, কিন্তু বিগত পাঁচ বছরে তাঁর উপলব্ধির মধ্যে মৌল পরিবর্তন হয়েছে। তবুও এম.পি.টি. আচার্যের মতো জঙ্গি জাতীয়তাবাদী যখন তাসকেন্টে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে নতুন রূপ দিতে চাইলেন তখন মানবেন্দ্রনাথ নিরুপায় হয়ে মার্কসবাদে অজ্ঞ নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য

১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর তাসকেন্ট-এ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করলেন। শিবনারায়ণ রায় বহু দুষ্প্রাপ্য নথিপত্রের সূত্র থেকে বিস্তারিত ভাবে জানিয়েছেন যে কোন পরিস্থিতিতে কোন আদর্শে কোন কর্মসূচিতে কাদের আগ্রহে ও কাদের কর্মীরূপে নিয়ে ওই কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল এবং জন্মলগ্ন থেকেই ওই পার্টির ভেতরে কী ধরনের সমস্যা ও স্ববিরোধিতা ছিল।

এই সময় বার্লিন-মস্কো-তাসকেন্ট মিলে এক চমকপ্রদ ত্রিভুজ সৃষ্টি হয় যার মধ্যে একদিকে অনেক জার্মান-রুশ বুদ্ধিজীবী অন্যদিকে বহু আফগান-ভারতীয় ব্যক্তিত্ব নিজ নিজ দলীয় বা ব্যক্তিগত আদর্শ অনুসারে যে সব চক্র ও চক্রান্ত গড়ে তোলেন তার বিবরণও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সরোজিনী নাইডুর ভাই বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন ওই ত্রিভুজক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত নাটকের এক-একটি চরিত্র। এই প্রসঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের সহকর্মী রূপে লুহানি ও নলিনী দাশগুপ্তের নামোল্লেখ করেছেন গ্রন্থকার, কিন্তু নলিনী দাশগুপ্তের প্রাসঙ্গিক পরিচয় জানানি, উপরন্তু পরে নলিনী দাশগুপ্ত হয়ে গেছেন নলিনী গুপ্ত। তবে মানতেই হবে যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে-অধ্যায় বহির্ভারতে সংঘটিত তার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ শিবনারায়ণ রায় মহাশয় এখানে গভীর গবেষণাপূর্বক উদ্ধার করে দিয়েছেন এবং সেই ঘটনাবলির সঙ্গে কীভাবে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রধান প্রবাহের সম্পর্ক গড়ে ওঠে তারও কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। আবার এ সবের পাশাপাশি এসেছে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের কথা, তার পাশাপাশি চিত্তরঞ্জন দাশের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের কথা, চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের সংযোগ প্রচেষ্টার কথা, বিদেশে বসে ভারতের বাস্তবতা ব্যাখ্যা করে মানবেন্দ্রনাথের 'ইন্ডিয়া ইন ট্রানজিশন' গ্রন্থ রচনার কথা, কীভাবে সেই গ্রন্থ জার্মান ভাষায় প্রাথমিক রূপ থেকে আস্তে আস্তে ঐতিহাসিক সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে তার বৃত্তান্ত এবং ওই গ্রন্থ রচনার অবকাশে তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্যগুলিকে সংক্ষেপে সংহত সূত্রাকারে লিখে হাতে হাতে ইউরোপীয় শহরগুলিতে তো বটেই ভারতেও, বিশেষত ১৯২১-এর আমেদাবাদ কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হয়, আর তাঁরই প্রেরিত নলিনী (দাদা?) গুপ্ত কীভাবে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম ও মুজাফফর আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন সে সব কাহিনীও এসেছে। মানবেন্দ্রনাথ এক দিকে সংগঠনের জাল বিস্তার করেন কলকাতা-আজমের-আহমেদাবাদ-লাহোর প্রভৃতি স্থানে, অন্যদিকে অক্লান্ত রূপে আপন বক্তব্য ও বিশ্লেষণ লিখে যেতে থাকেন 'কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল', 'ইন্টারন্যাশনাল প্রেস করেসপনডেন্স' প্রভৃতি পত্রিকায়। তিনি বিশেষভাবে ভারতের আন্দোলন, সংগঠন ও পরিস্থিতি নিয়ে একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বার্লিনে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। সেখান থেকেই তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে দ্বিমাসিক 'দ্য ভ্যানগার্ড অব ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স' নামক পত্রিকা। তাতে ভারত সম্পর্কিত নানা বিষয়ের পরিচয় ও বিশ্লেষণ তো থাকতই, সে সঙ্গে থাকত আন্তর্জাতিক প্রশ্নাবলি নিয়ে — যেমন আইরিশ ট্র্যাজেডি, টার্কিশ ন্যাশনল রিভোলিউশন জাতীয় শিরোনামে নিবন্ধ আর বিস্তৃতভাবে থাকত নানা গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকের বিচার। অচিরেই সে-পত্রিকার রচনাবলি বাংলার 'অমৃতবাজার পত্রিকা', নজরুল সম্পাদিত 'ধূমকেতু', অমর চট্টোপাধ্যায়ের 'আত্মশক্তি', এলাহাবাদের 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট, বোম্বাসের 'আজ', কানপুরের 'বর্তমান' প্রভৃতি পত্রিকায় আলোচিত, উদ্ধৃতিত ও উদ্ধৃত হতে লাগল। এই পত্রিকাই নাম পালটে পালটে ১৯২৫ সালে হয় 'দ্য মাসেস অব ইন্ডিয়া'। এইভাবে মানবেন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে সারা ভারত জুড়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদী সংগঠনের বিশাল জাল বিস্তার করেন — উত্তর ভারতে মুহম্মদ আলি-ওলাম হুসেন - শৌকত উসমানি, পূর্বভারতে মুজাফফর আহমদ-নজরুল ইসলাম-অমর চাটুজ্যে, দক্ষিণ ভারতে বিশিষ্ট আইনজীবী সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার ও পশ্চিম ভারতে শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে প্রভৃতি সে জাল ধরে রেখেছিলেন।

এটা উল্লেখযোগ্য যে শিবনারায়ণ রায় গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন মানবেন্দ্রনাথের জীবনে তিন বড় প্রভাব তিন নারীকে। সাধারণভাবে বললে আলোচ্য গ্রন্থটি মানবেন্দ্রনাথের তিন খণ্ডে সমাপ্য জীবনের প্রথম খণ্ড ১৯২২ সালে 'ইন্ডিয়া ইন ট্র্যানজিশন' গ্রন্থ রচনার প্রসঙ্গে ও সেই মহান গ্রন্থের পরিচয় প্রদানেই সমাপ্ত, কিন্তু আরও তলিয়ে দেখলে মানতে হবে যে এই গ্রন্থ কোনও এক ব্যক্তির জীবনের একটা পর্বমাত্র নয়, এই গ্রন্থ বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় তথা আন্তর্জাতিক সমাজের এক নাটকীয় পর্ব ও প্রসঙ্গের প্রতি বিশেষ নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং একই সঙ্গে মননে, মেধায় ও পরিশ্রমে গবেষণা-কর্মের এক আদর্শ দৃষ্টান্তও বটে। তবে অভাবের দিকও রয়েছে — গ্রন্থটির পরিচ্ছেদ-সংখ্যার সঙ্গে পরিচ্ছেদ-পর্ব ও প্রসঙ্গের ইঙ্গিতসহ সুচিপত্র থাকলে ভাল হত। পাতায় পাতায় মুদ্রণ-ভ্রান্তি গ্রন্থটির প্রধান দোষ, এমনকী লেখক ভূমিকাতে যে-বাক্যে প্রকাশনা তদারকির জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন সেই বাক্যেও মুদ্রণ-ভ্রান্তি। কিন্তু বইয়ের ছাপা পরিষ্কার, কাগজ ভাল ও বাঁধাই মজবুত।

**In Freedom's Quest, Life, of M.N. Roy, Vol 1–by Sibnarayan Ray/Minerva Associates (Publications) Pvt Ltd, Calcutta 29/ 200.00**



# একটি বর্ণময় ব্যক্তিত্বের সন্ধানে

## পুলকনারায়ণ ধর

আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ কোন বাংলার মানুষ ছিলেন? দেশভাগের পর যে বাঙালিরা এপার-ওপার করে থিতু হয়েছেন তারা দুই বাংলারই বাঙালি। আঞ্চলিক অর্থেই তাদের হৃদয়যন্ত্রণা নতুন প্রজন্ম কি করে বুঝবে? তাই তাদের ফিরে যেতে হবে সেই সব মানুষের কাছে যারা এ.ডব্লিউ মাহমুদের মতন হৃদয়ের অন্তস্থলের ফল্গু-ধারায় দেশের বেদনাকে সর্বদা অনুভব করেছেন।

অধ্যাপক মাহমুদের জীবনের টুকরো টুকরো কাহিনী নিয়ে রচিত আলোচ্য স্মরণিকা গ্রন্থটিতে লিখেছেন দুই বাংলার মানুষ। কোনও বাঙালি বুদ্ধিজীবীকে নিয়ে দুই বাঙলার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এ ধরনের স্মরণিকা আগে তেমন প্রকাশ করেননি। মাহমুদের মানসভূমি ছিল দুই বাংলার সংস্কৃতি। এই দিক দিয়ে বিচার করলে গ্রন্থটির প্রতীকী তাৎপর্য অসাধারণ। অধ্যাপিকা সেলিমা বাহার জামান এই বিশেষ কাজটি সম্পাদন করেছেন। এই জন্য প্রথমেই তাঁকে এবং প্রকাশককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

অধ্যাপক মাহমুদ যে প্রচলিত অর্থে খুব একটা বিখ্যাত মানুষ ছিলেন তা নয়। লৌকিক অর্থে কীর্তিমান পুরুষ বলতে যা বোঝায় তাও তিনি ছিলেন না। এক কথায় করে থাওয়া 'প্রগতিশীল' বুদ্ধিজীবী বলতে যা বোঝায় তিনি একেবারেই তাদের দলভুক্ত ছিলেন না। যে বিরল দু'একজন বিলীয়মান বাঙালি প্রজাতিকে মাঝে মধ্যে এখনও দেখা যায় অধ্যাপক মাহমুদ ছিলেন তাঁদেরই গোত্রভুক্ত — খোলামেলা উদার হৃদয়ের জীবন্ত মনের মানুষ — ঊনবিংশ শতাব্দীর 'রেনেশাঁস ম্যান' শিক্ষা মহলেও শিক্ষিত মানুষের মেলায় মাহমুদ ছিলেন সুপরিচিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তাঁকে নিয়ে লেখা প্রকৃতই আনন্দের।

পূর্ববাংলা অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবেড়িয়ার সন্তান মাহমুদ দীর্ঘ চল্লিশ বছর শিক্ষকতা করেছেন। তৈরি করেছেন অগণিত ছাত্রছাত্রী। তাঁর সান্নিধ্যে যারা এসেছেন সেই সব গুণমুগ্ধ মানুষের সংখ্যাও সীমাহীন। চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ, ধলাল মহসীন কলেজ, কৃষ্ণনগর, প্রেসিডেন্সি কলেজের দাপটের সঙ্গে ইতিহাস পড়িয়েছেন। তাঁকে আমরা পেয়েছি কলকাতার মৌলানা আজাদ কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে, উপশিক্ষা অধিকর্তা ও রাষ্ট্রকৃত্যক এর সদস্য হিসাবেও। আদর্শ শিক্ষা ও সুদক্ষ-প্রশাসক অনেকেই দেখেন কিন্তু এমন বর্ণময় উজ্জ্বল প্রশাসক ও শিক্ষক বিরল। তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ, যাঁর মস্তিষ্ক ছিল সতত ক্রিয়াশীল। মন ছিল আধুনিকতার জারকে সিক্ত। কুসংস্কারহীন ও সদাজাগ্রত, প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। ফুটবল, টেনিস সমস্ত রকম খেলায় তিনি ছিলেন দক্ষ। আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড নম্বর পাওয়া কৃতী ছাত্র। আসলে দীর্ঘ ৮৬ বছরের গোটা জীবনটাই ছিল সত্যিকারের খেলোয়াড়ি ধাতুতে তৈরি। মুক্তমনের ও মুক্তশিখার এমন একজন মানুষ এই পোড়া দেশে বরাবরই একটু বেমানান। তাঁকে না মেনেও উপায় নেই, আবার পাদপ্রদীপের আলোয় তাঁকে তুলে ধরার সাহসও কারও হয়নি। কারণ তাঁর স্বাধীন উদার মনের সঙ্গে আজকের দিনে হিসাবি মানুষদের মাপা আদর্শ সব সময় খাপ খেত না। ভক্তি ছিল ওপর ওপর। পিতার ঋজু ব্যক্তিত্ব ও মাতার কোমল হৃদয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন তাঁদেরই একটি পরিবর্বিত ধারা। মায়ের প্রভাব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অনুভব করেছেন। তিনি বলতেন 'I am mother's child.' অধ্যাপক মাহমুদের জীবনবোধ ছিল উচ্চগ্রামে বাঁধা। এইটি অনেকে ধরতে পারেননি বলে মনে হয়। আলোচ্য স্মরণিকার ছত্রে ছত্রে তাই বিশিষ্ট লেখকরা শুধু 'প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ' প্রভৃতি বহু ব্যবহৃত কতকগুলি নিরাপদ শব্দের আশ্রয়ে সুনিশ্চিত ভাবে তাঁকে বাঁধতে চেয়েছেন। এতে তাঁর মতো মানুষের মনের হদিশ পাওয়া সম্ভব নয়। তাঁর দর্শন ও মেজাজ ছিল সাধারণ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীবর্গের থেকে পৃথক। তিনি কি ধর্ম একেবারেই মানতেন না? ঈশ্বর সম্পর্কে তিনি কি উপেক্ষাই দেখিয়েছেন? এ নিয়ে কেউ তাঁকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন বলে মনে হল না। মাহমুদ 'Collective unconsciouness' কথাটা খুব ব্যবহার করতেন। তিনি কখনওই এই যুথবদ্ধ অচেতনদের সারিতে দাঁড়াতে চাননি। সুতরাং প্রচলিত প্রমাণপত্র (certificate) দিয়ে তাঁর চরিত্রের কতটুকু বোঝা যায়? সমস্ত দিক দিয়ে অন্যদের থেকে তিনি ছিলেন এতই আলাদা যে তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। জীবনে নাটকীয়তাই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। খুব স্বাভাবিকভাবেই তা তাঁর চলনেবলনে আভিজাত্যের সঙ্গে মিশে যেত বলে তা কখনওই নাটকীয় বলে মনে হত না। এমন অজস্র ঘটনার সাক্ষী আছেন তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রী ও বন্ধুরা।

আলোচ্য গ্রন্থটি ছত্রিশটি স্মৃতিমূলক রচনা, দুটি মূল্যবান সাক্ষাৎকার, মাহমুদের ছোট্ট দুটি লেখা, এবং তিনটি চিঠি নিয়ে প্রকাশিত। লেখকদের মধ্যে আছেন শিপ্রা সরকার, বরুণ দে, রবীন্দ্র

নারায়ণ বসু, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, গৌতম নিয়োগী, ভারতী রায়, কল্পতরু সেনগুপ্ত, ওয়াবেদ হুল হক, আবদুর রজ্জাক, প্রশান্ত ঘোষ, কে.এম. মোহসীন এবং তাঁর কিছু আত্মীয় পরিজন। অর্থাৎ দু'টি অংশ পাওয়া যাচ্ছে। একটি মাহমুদ সম্পর্কে অন্যদের ভাবনা এবং অপরটি মাহমুদের নিজস্ব ভাবনাচিন্তা।

মুহম্মদ আতাউল্লাহের স্মৃতিকথনে মাহমুদের একান্ত আপনজনের পরিচয় পাওয়া যায়। আমিনা মাহমুদের কলমে তাঁর 'বাচ্চু মামা'র এক নরম মানুষী চরিত্র ফুটে উঠেছে। চিত্রা অধিকারীর রচনায় আমরা জানতে পারি তিনি যাদের আশ্রয় দিতেন তাদের ভালবেসেই আশ্রয় দিতেন অনুকম্পা থেকে নয়। 'তাচ্ছিল্য ছিল শুধু মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের প্রতি' (পৃঃ ২৯) যাদের প্রচেষ্টায় যুক্ত বাংলা হল না। কারণ মাড়োয়ারিরা সম্মিলিত বাঙালি শক্তির কাছে আপন প্রভুত্ব হারাতে চায়নি (সালাউদ্দীন আহমেদকে দেওয়া সাক্ষাৎকার)। এ কথাটা আমিও জানতাম। নিশ্চয় অন্যরাও জানতেন। কিন্তু সাহস করে এ বাংলার কোনও ইতিহাসবিদ এ অভিমত বিশ্লেষণ করলেন না। বোধহয় তারা ভেবেছেন এ কথা বলে মাহমুদ হয়ত সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত হতে পারেন।

অধ্যাপক প্রশান্ত ঘোষের রচনাটিতে মাহমুদের মানসিকতার একটি সুন্দর মূল্যায়নের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। মওলানা আজাদ কলেজের মাহমুদের ছাত্র ইতিহাসবিদ বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়। বাসুদেবের রচনাটি তাঁর আদর্শ শিক্ষকের প্রতি নিবেদিত আন্তরিক নৈবেদ্য। ইতিহাস সংসদের সভাপতি হিসাবে মাহমুদের মাতৃভাষায় ইতিহাস রচনার অনুরাগ ও বাংলাভাষায় দক্ষতা সম্পর্কে পরিচয় দিয়েছেন গৌতম নিয়োগী। ভারতী রায় জানিয়েছেন মাহমুদ নাকি গানও শোনাতেন। যদিও এ কথা আর কেউ বলেননি। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের লেখায় মাহমুদের প্রসঙ্গ অনেকটাই অবগুণ্ঠিত চলমান রাজনীতির বহুল প্রচারিত ঘটনাবলির পুনরুক্তি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-উপাচার্য প্রবুদ্ধনাথ এক সময় মাহমুদের অধীনে সরকারি চাকরি করেছেন। এ ঘটনার কোনও উল্লেখ তিনি কেন করলেন না তা বোঝা গেল না। অধ্যাপক-অধ্যক্ষের সম্পর্কের একটি চিত্র থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। একেবারেই ভিন্নধর্মী উপহার দিয়েছেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ছোট্ট একটি ছড়া : 'স্মরণ'।

এই ধরনের স্মৃতিমূলক গ্রন্থে সাধারণত একই তথ্যের পুনরুক্তি ঘটে বিভিন্ন লেখকের রচনায়। প্রায় একই ধরনের আবেগও উৎসারিত হয় একই উৎস থেকে। গোটা মানুষটির পরিচয় দেওয়া কারও পক্ষেই হয়ত সম্ভব হয়নি। কিন্তু একটি Impression পাওয়া যায় যার মূল্যও কম নয়। তবে তথ্য নিয়ে কিছু বিভ্রান্তিমূলক দাবি অস্বস্তির কারণ ঘটায়। যেমন কল্পতরু সেনগুপ্ত বলছেন: চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে অধ্যাপনাকালে মাহমুদ কল্পনা দত্ত (বিশেষ অনুমতিপ্রাপ্ত ছাত্রী, পরবর্তীকালে কল্পনা যোশী) কে Edgar snow এর 'Red star over China' বইটি পড়তে দিয়েছিলেন। গৌতম চট্টোপাধ্যায় আবার গর্বভরে দাবি করছেন ১৯৪৩ সালে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র হিসাবে তিনিই তার স্যার মাহমুদকে বইটি প্রথম পড়তে দিয়েছিলেন। ছোটখাট এ ধরনের তথ্য বিভ্রান্তি চোখে পড়ে। সেগুলি অবশ্য উপেক্ষণীয়। কারণ মানুষের চরিত্র বুঝতে সেগুলি কোনও বাধা নয়।

সালাউদ্দীন আহমেদ ও লাডলীমোহন চৌধুরীকে দেওয়া দু'টি পৃথক সাক্ষাৎকার বইটির মূল্যবান অংশ। ইতিহাস ও রাজনীতির ছাত্রদের কাছে এই সাক্ষাৎকারে মাহমুদের বক্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও অনুধাবনযোগ্য। লাডলীমোহনকে তিনি জানাচ্ছেন যে গ্রিসের সভ্যতা ইসলামের সভ্যতার থেকে কোনও অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। 'তাই পৌত্তলিক ধর্মের অনেক কিছুই আমি নিরাসক্ত ভাবে দেখতে শিখেছি।' তাঁর শিল্পীমনের বিশ্বাস অকপটে ব্যক্ত করেছেন: 'পৌত্তলিকতা বড় আর্টের একটি উৎস।' বন্দেমাতরম মন্ত্রের কাব্যগুণ এবং সঙ্গীতময়তাও মাহমুদকে আকৃষ্ট করে। অদ্ভুতভাবে জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে মাহমুদের দৃষ্টিভঙ্গির অভিন্নতা লক্ষ করা যায়। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে 'আনন্দমঠকে কিছুতেই খাটো করে দেখা চলে না। ... যদিও "আনন্দমঠ" পড়ে মুসলমানদের মনে স্বাভাবিক কারণেই ক্ষোভ জন্মাতে পারে' (পৃ: ১২০)। এই সাক্ষাৎকার দু'টিতে অনেক মূল্যবান কথা থাকলেও বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও দলগুলির নীতি ও কৌশল তথা সততা সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন তাঁকে করা হয়নি। এ সম্পর্কে তাঁর কোনও অভিমত বা বিশ্লেষণও তাই পাওয়া গেল না। তবে সাম্প্রদায়িক সংঘাতময় পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ে যে ধর্মশিক্ষা দেওয়া আবশ্যক এ কথা বোধ করি তিনি উপলব্ধি করছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে আনা দরকার বিদ্বেষ-বিরোধী তীব্রতা। ছেলেমেয়েদের পরস্পরের ধর্মের আসলরূপ শেখাতে হবে। ..... ধর্ম সম্পর্কে একটা সঠিক ধারণা গড়ে তোলা দরকার যা পরস্পরের প্রতি ভালবাসার জন্ম দেবে।' (গণশক্তি, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৯২)।

অধ্যাপক মাহমুদের লেখা চিঠিপত্র সংগ্রহ এতই অল্প যে আপাতত তা এই স্মরণিকায় প্রকাশ করার কোনও সার্থকতা নেই। চিঠিপত্র আরও কি সংগ্রহ করা যেত না?

জীবন সায়াহ্নে সালাউদ্দীন আহমদকে মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাসের কথা বলতে গিয়ে জানাচ্ছেন, 'আমার অনেক বয়স হয়েছে। তবুও আমি মনে করি যে মানুষের যে ভবিষ্যৎ সেটা অনেক উজ্জ্বল, মানুষের যাত্রা কোনও দিন শেষ হবে না। মানুষ ধ্বংস হবে না... অনন্ত পথে সে যাবে এবং সে উন্নত থেকে উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টি করবে....।'



তাঁর জলদমন্দ্র কণ্ঠস্বর ও অপূর্ব বাচনভঙ্গি আর আমরা পাব না ঠিকই। কিন্তু মানুষটা যেন তার খণ্ড খণ্ড চিত্রের কোলাজ হয়ে আমাদের মানসচক্ষে প্রতিভাত। মৃত্যুর পর অন্তঃশীল নৈঃশব্দে মাহমুদ কি আজ নিভন্ত অঙ্গার? সেলিনা জামান সম্পাদিত স্মারকগ্রন্থটি যেন তারই উত্তর খোঁজার প্রয়াস।

**আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ স্মরণে — সম্পাদনা —**

**সেলিনা বাহার জামান/বুলবুল পাবলিশিং হাউস — ঢাকা,** বাংলাদেশ/১০০.০০

# নকশালবাড়ি ও মার্কসবাদ

## বেণু গুহঠাকুরতা

মার্কসবাদ এমন এক দর্শন যে আজ পর্যন্ত স্থিরই হল না কে প্রকৃত মার্কসবাদী। শোনা যায় স্বয়ং কার্ল মার্কস নাকি বলেছিলেন যে "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ — আমি মার্কসবাদী নই।"

সে যা হোক। মার্কসবাদীদের এক ধারা ভারতবর্ষের নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রবক্তা। এদের নিয়েই অধ্যাপক প্রদীপ বসুর আলোচ্য গ্রন্থ 'নকশালবাড়ীর পূর্বক্ষণ — কিছু পোস্ট মডার্ন ভাবনা'। আলোচনা-কাল খুবই সংক্ষিপ্ত। ১৯৬৭ সালের ২রা মার্চ থেকে ৮ই মে। কেন এই সময়টাকে বেছে নেওয়া হয়েছে? কারণ ২রা মার্চ পঃ বঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল আর ৮ই মে শুরু হয় নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন। বইটিতে, মূলত আলোচিত হয়েছে সেই সময়ের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে যে মতাদর্শগত বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল তার বিশদ ইতিহাস।

যদিও আলোচ্য-কাল মাত্র দু'মাস কিন্তু আলোচনা দু'মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, কারণ তা রাখা সম্ভবও নয়। আলোচনার বিভিন্ন লেখা ও দলিলে চলে এসেছে পৃথিবীর বিপ্লবী আন্দোলনের নানা উত্থান-পতনের ইতিহাস। ফরাসি-বিপ্লব (১৭৮৯) রুশ বিপ্লব (১৯০৫, ১৯১৭) প্যারি কমিউন সবই চলে এসেছে নিজেদের চিন্তাধারার পবিত্রতা ব্যাখ্যা করার জন্য।

লেখকের মতে এই মতাদর্শগত সংগ্রামের দু'টি ধারা ছিল একটি বিতর্কমূলক ধারা আর অপরটি ছিল প্রয়োগপন্থী ধারা (Debatist and Actionist stream) প্রথম ধারাটির প্রতিনিধি ছিলেন সুশীতল রায়চৌধুরী, পরিমল দাশগুপ্ত, সরোজ দত্ত, অমিত সেন, প্রমোদ সেনগুপ্ত প্রমুখেরা আর দ্বিতীয় ধারাটির প্রতিনিধি ছিলেন চারু মজুমদার, সৌরেন বসু, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল, খোকন মজুমদার প্রমুখেরা। কিন্তু এই কর্মকাণ্ডের মিলিত ধারা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তার কারণ বলতে গিয়ে লেখক আমাদের জানিয়েছেন যে 'প্রয়োগমুখী ধারা যে নকশালবাড়ী অভ্যুত্থানের জন্ম দিয়েছিল তা অবশ্যই নেতৃত্বের সংশোধনবাদ ও পার্টি আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের একটি ভিত্তি নির্মাণ করেছিল, তবে সেই ভিত্তি তুলনামূলকভাবে মতাদর্শগত ও তাত্ত্বিক চরিত্রের ছিল না বরং বেশি অভিজ্ঞতা (empirical) চরিত্রের ছিল। ঐ ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বিভিন্ন মাওপন্থী ও নকশালপন্থীরা নকশালবাড়ীর চারপাশে সমবেত হন। সি. পি. আই(এম) এর সংশোধনবাদী চরিত্র প্রমাণিত হয়েছিল নকশালবাড়ীকে দমনের জন্য, রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে। তার ভিত্তিতেই তাঁরা সি. পি. আই (এম) এর বিরোধিতা ও তার সঙ্গে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু একই সাথে এটাও সত্য যে বিদ্রোহীদের ঐক্য প্রধান প্রধান তাত্ত্বিক প্রশ্নে মতৈক্যের ভিত্তিতে, প্রধানত অর্জিত হয়নি। ঐ ঐক্যের চরিত্র কিছুটা নেতিবাচক, ইতিবাচক নয়। তাই প্রথম থেকেই নকশালপন্থীদের মধ্যে বিভিন্ন তাত্ত্বিক প্রশ্নে গুরুতর মতভেদ দেখা গিয়েছে এবং আজও পর্য্যন্ত তা বেড়ে চলেছে। ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত বহু তাত্ত্বিক প্রশ্নের সমাধান নকশালবাড়ী করতে পারেনি। ...... অনেকটা ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বগত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে নকশালপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। তাঁদের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত ছিল নকশালবাড়ির উপরে আর সেটা ছিল সংশোধনবাদের বাস্তব প্রয়োগ-ভিত্তিক স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন ফলে তাত্ত্বিক প্রশ্নে বিরোধ বাড়তেই থাকে.... ক্রমশ অসংখ্য গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েন নকশালপন্থীরা। এটা ঠিক যে নকশালপন্থীদের বিভক্ত হয়ে পড়ার পেছনে আরও অনেক কারণ ছিল এবং এই সমগ্র ঘটনাপ্রবাহকে এই একটি মাত্র কারণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই গবেষণা থেকে এটুকু আমরা বলতে পারি যে এই ঘটনাপ্রবাহ ও বিভক্তি-করণের পেছনে প্রয়োগ-মুখী ধারার প্রাধান্যের যথেষ্ট অবদান ছিল। কারণ ঐ ধারার প্রাধান্যের ফলে বিপ্লবী রাজনীতির প্রমাণ-চিহ্ন অনেকটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তুলনামূলকভাবে তত্ত্ব বর্জিত, বিশ্লেষণ-বিহীন জঙ্গী কার্যকলাপ (militant action)।' (পৃঃ ১৪৬/১৪৭)

অধ্যাপক প্রদীপ বসু সঠিকভাবেই বলেছেন যে 'আর্তপার্টির সংগ্রামের আলোচ্য বিষয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে মাওপন্থী অর্থাৎ নকশালপন্থী রাজনীতি আদৌ কোন ভুঁইফোড় ঘটনা নয়, হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা কিছু নয়। বরং ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের নিজস্ব কারণ থেকেই তা সঞ্জাত। ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মধ্য থেকে তার জন্ম, সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তার ক্রমবিকাশ। সংশোধনবাদের সমালোচনাত্মক বিচারধারা (Critique) হিসেবে তার উদ্ভব ও অগ্রগতি।' কিন্তু তিনি যে কথাটি বলেননি তা হল কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্মকাল থেকেই এই ধারা চলে আসছে। ফলে ১৮৪৮ এর ইউরোপের বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্কস-এঙ্গেলসরা যখন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে বিপ্লব সফল হওয়ার বাস্তব পরিস্থিতি সেদিন ইউরোপে ছিল না, তখন তাঁদের বন্ধুরা তাঁদের বিশ্বাসঘাতক বলতে দ্বিধা করেননি। বিপ্লবী আন্দোলনের উগ্রপন্থী অথবা অতিবাম ধারা আজও বহমান এবং নকশালপন্থী আন্দোলন তারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই ধারা সেদিনও ছিল আজও রয়েছে। মার্কস-এঙ্গেলসদের কথা সেদিনও অনেকেই শোনেননি ফলে তাঁরা ভেঙে দিয়েছিলেন প্রথম আন্তর্জাতিককে।

একটা কথা সেই সঙ্গে মনে রাখা দরকার ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনে বামপন্থী ঝোঁক বরাবরই ছিল এবং তাতে রসদ যুগিয়েছে তৃতীয় আন্তর্জাতিক। যখন ভারতবর্ষ পরাধীন এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ধারার নেতৃত্বে এবং প্রকৃতপক্ষে জাতীয়স্তরে কমিউনিস্টদের আবির্ভাবই ঘটেনি, তখন তারা ঘোষণা করেছেন ভারতবর্ষের বুর্জোয়ারা সব সাম্রাজ্যবাদের দালাল হয়ে গিয়েছে এবং এদের মুখোস খুলে দেওয়াই হল কমিউনিস্টদের প্রধান কাজ। একই ভাবে ১৯৪৮এ দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে এরা প্রবর্তন করলেন একই সঙ্গে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার স্লোগান। এই সব নীতি ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে কোথায় ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল সেই সব তথ্য অনেকেরই জানা।

নকশালপন্থীরা একইভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সোবিয়েত পার্টির বদলে চিনা পার্টির দ্বারা, এরাও অতীতের রুশ পার্টির মতো ১৯৬৭এর ২৪ মার্চ পিকিং রিভিউ মারফত ভারতের কমিউনিস্টদের জানাল যে 'The Indian people's opposition to the Congress Party is growing stronger and stronger and the crisis in which Indian reactionary rule finds itself is more acute than even. The whole of India to-day is littered by dry faggots. It is certain that revolutionary flames will rage throughout the vast territories of India....' (পৃ: ৫৩) এমনই আরও অনেক কথা। ফলে এ দেশের অনেকে বিপ্লবী আন্দোলনে আত্মাহুতি দিয়েছেন, কিন্তু বিপ্লব এগুতে পারেনি।

ভারতবর্ষে মার্কসবাদীদের ব্যর্থতাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য শ্রীবসু মাকর্সবাদের সঙ্গে যোগ করতে চেয়েছেন ফুকো-দেরিদা-লিওতার চিন্তাধারাকে, কিন্তু সে প্রয়াস কতটা সফল হবে তার উত্তর লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের গর্ভে। তবে মাকর্সবাদ এমনই দর্শন যা 'মরিয়াও না মরে রামের' মতো বিশ্ববিপ্লবী আন্দোলনের বিভিন্ন যুগে বারবার মাথাচাড়া দিয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও তা একইভাবে বিপ্লবী আন্দোলনকে প্রভাবিত করবে এতে কোনও সন্দেহ নেই।

**নকশালবাড়ীর পূর্বক্ষণ — কিছু পোস্ট মডার্ন ভাবনা — প্রদীপ বসু**/প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩/ ১২০.০০

# অন্ধকারের কথকতা অথবা আশাভঙ্গের গল্প

## অসীম রেজ

কোনও কোনও লেখকের কাছে আমাদের ভাঙাচোরা বিক্ষিপ্ত, অসামঞ্জস্যপূর্ণ, সংকটময় অস্তিত্বের একটি নিটোল কাহিনী গড়ে তোলা কঠিন হয়ে ওঠে। একটি ঘটনার সূত্র ধরে অসংখ্য ঘটনার ভিতর ঢুকে পড়া, স্বপ্নের অংশ, স্মৃতি, দৃশ্যপরম্পরায় গাঁথা পারস্পরিক সম্পর্কহীন ঘটনা ও চিন্তাভাবনার জাল বিস্তার করে একটি গল্পের কাঠামো খাড়া করার প্রচেষ্টা খুবই দুরূহ বোধ হয়। একে গল্প আখ্যা দেওয়া যায় কি না সেটা তর্কের বিষয়। তবে চিন্তাস্রোতের এমন এলোমেলো বিক্ষিপ্ত রূপটিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে একটি নির্দিষ্ট চেহারায় তুলে ধরার কৌশলটি মূলত নির্মাণ-ধর্মী বা 'স্ট্র্যাকচারাল' রচনার মূল লক্ষ্য। কাহিনীহীন নির্মাণধর্মী গল্প লেখার এমন প্রয়াস নতুন কিছু নয়। কমলকুমার মজুমদার বা অমিয়ভূষণ মজুমদারের মতো লেখকেরা এই পথ ধরে অনেক আগেই এগিয়েছেন। পরবর্তী সময় যাঁরা এই পথ অনুসরণ করতে চেয়েছেন তাঁদের কাছে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জ



বোধহয় পরিমিতিবোধ। যেহেতু যে কোনও নির্মাণকর্মই একটি সচেতন প্রয়াস, সেহেতু ঠিক কতটা বলব, কতটা বলব না এমন দায়িত্ব থেকে যায়। লিখতে গিয়ে চিন্তাসূত্রের জালে আমরা জড়িয়ে পড়ি। অনেক কিছু বলার তাগিদ ভূতের মতো পেয়ে বসে। এমন তাগিদে বর্ণনার পর বর্ণনা দিয়ে আমরা সংকটের এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় অজান্তে ঢুকে পড়ি। হাতড়ে হাতড়ে পথ খুঁজে বেড়াই। কখনওবা এখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ আমাদের অজানা থেকে যায়। গল্প গড়েও গড়ে ওঠে না। মূর্তি অসম্পূর্ণ থাকে। রচনার দুরূহ পথ ধরে পাঠক এগিয়ে শেষ অব্দি হতাশ হন। পাথর ভেঙে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার কষ্ট পাঠক ভুলতে পারে না যদি না সেখানে সে সূর্যোদয় দেখে।

মধুময় পালের 'রাত্রির পরিধি' এবং 'সাহেবগলি' গ্রন্থ দু'টি পড়ে এমন সব ভাবনা প্রথমেই উঠে আসে। অর্ধ সত্য, অর্ধ মিথ্যা, নিরেট নিঃসত্ত অন্ধকার জীবনের পথ চলার ক্লান্তিকর অভিব্যক্তি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন 'রাত্রির পরিধি' গ্রন্থটিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ও ডিটেলের কাজে। 'বিহান' নামে একটি চরিত্রের আড়ালে লেখক যাত্রা শুরু করেছেন তাঁর অতীত জীবনের নানান সুড়ঙ্গপথে। দৃশ্যের পর দৃশ্যে উঠে এসেছে তাঁর শৈশবস্মৃতি, যৌবনের আবেগ, অবদমিত প্রেম, যৌনাকাঙ্ক্ষা, নারী, সামাজিক শাসনে খণ্ডবিখণ্ড জীবনের চালচিত্র। অনিশ্চয়তা, ভয় ও অস্থিরতা ঘিরে বহুতর ঘটনার এক অসম্পূর্ণ আখ্যান। লেখক আখ্যানের একটি অংশে বলেছেন 'এই দৃশ্যমানতায় আমি একটা গল্পের রেখা খুঁজে ছিলাম। কঙ্কাও খুঁজেছিল। যিনি পড়ছেন, তিনিও খুঁজবেন। যেন আমরা সবাই একটা সূত্র খুঁজতে এসেছি, যা কোনও বিশ্বাসযোগ্য ঘটনার হদিশ দেবে এবং শেষ পর্যন্ত গল্পের অবয়বে নিজেদের শ্রম ও আগ্রহ চরিতার্থ হতে দেখব।' (কঙ্কা, পৃ: ৫৭) এই গ্রন্থের নারীরা — দিদিমা, রাণীমা, করবী, কঙ্কা, দোলা ও অন্যান্যরা লেখকের অন্ধকার জগতে বারবার হানা দিয়েছে;তাঁকে স্বপ্ন দেখিয়েছে; পথ ভুলিয়ে তাঁকে নিয়ে গেছে এক রহস্যময় জগতে। যেন এরা কেউ বাস্তবের রূপ নয়, স্বপ্নের অংশ। গোটা গ্রন্থটিতে এক জীবনানন্দীয় 'মরবিডিটি' তাঁকে ভূতের মতো পেয়ে বসেছে। এক লাশকাটা ঘরে লেখক যেন একা। গ্রন্থের নামকরণটি জীবনানন্দ দাশ থেকে নেওয়া। এরই মধ্যে এসেছে সমাজ, রাজনীতি, দৈনন্দিন জীবনের লড়াই, মরা-বাঁচা নিয়ে এলোমেলো টুকরো টুকরো খাপছাড়া, সংগতিহীন, ব্যক্তির অসম্পূর্ণতার চিত্র।

এক অন্ধকার চক্রবৎ পথ থেকে যেন লেখক বেরোতে পারেন না। অস্তিত্ববাদের পুরনো সংকট তিনি আবার আমাদের মনে করিয়ে দেন। লেখকের জীবনকে দেখার পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও নির্মাণকৌশলে ফাঁক চোখে পড়ে। কখনও প্রসঙ্গগুলি সম্পর্কহীন হয়েছে; কখনও অতিরিক্ত বর্ণনা ও তথ্যের ভারে কাহিনী স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়েছে। কখনও তিনি অবচেতনের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছেন; কখনও বা অতিসচেতনায় কাহিনী তার স্বাভাবিক গতিময়তা হারিয়েছে।

পরবর্তী গল্পগ্রন্থ 'সাহেবগলি'তে লেখকের উত্তরণ আশা করেছিলাম। কিন্তু লেখক তাঁর চক্রব্যূহ থেকে বার হতে পারেননি। এই গ্রন্থে তাঁর প্রধান অস্ত্র হল ভাষার শাণিত ব্যবহার। এখানে তাঁর দেখা জীবনটি হল সাংবাদিকের দৃষ্টিতে 'মাইক্রোস্কোপিক' দেখা। সমাজজীবনের অসংখ্য খুঁটিনাটি, নানা স্তরের মানুষ, তাদের বিচিত্র জীবনপ্রণালী বিশেষত গ্রাম্যজীবনের নিখুঁত চিত্রায়ণ আমাদের আকর্ষণ করে। সংবাদপত্রের ভাষা, মৌখিক ভাষার তারতম্য ও কাব্যিক ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তিকে তিনি একত্রে কাজে লাগাতে চেয়েছেন। এমনকী কিছু 'স্ল্যাং' ও ব্যবহার করেছেন যা বাদ দিলে ভাল হত। তিনি যেন এক ধারালো ছুরি দিয়ে সমাজদেহটাকে ফালা ফালা করে কেটেছেন যাতে শুধু হাড়-পাঁজরই নয়, নাড়িভুঁড়িও বার হয়ে এসেছে। তাঁর আক্রমণ মূলত সামাজিক শঠতা, ক্রূরতা, মিথ্যাচার ও নগ্নতাকে। সমাজজীবনের এই অন্ধকার দিকটিকে তিনি 'সামাজিক সত্তার আত্মকথা' হিসাবে দাবি করলেও এটি আসলে জীবনের খণ্ডিত অংশ মাত্র। বেঁচে থাকার অর্থটা তিনি আমাদের খুঁজে দিতে পারেননি। মধুময় নতুনভাবে লিখতে চেয়েছেন যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে তাঁর রচনার কৌশলটি অনাবশ্যক জটিলতা বয়ে এনেছে যা বহু পাঠককে এ-গ্রন্থটি পাঠ থেকে নিরুৎসাহিত করবে। তাঁর জীবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও বৈদগ্ধ্যকে তিনি সার্থকভাবে কাজে লাগাতে পারবেন যদি রচনার দুরূহ পদ্ধতিটি ত্যাগ করে আরও সহজ ও স্বচ্ছভাষায় পাঠক-হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। এর জন্য হয়তবা আরও শৃঙ্খলার প্রয়োজন। আখ্যানের এক জায়গায় তিনি বিহানের ভাবনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন — 'বিহানের উপন্যাসে এসব থাকবে। ইচ্ছে আছে। এসবই তার নিজের কথা। কিন্তু লেখা হবে কিনা সন্দেহ। উপন্যাসের একটা শৃঙ্খলা দরকার। সব নির্মাণেরই শৃঙ্খলা আছে। বিহান বোঝে, আজও সেটা সে টের পায় নি।' (বিবাহ, পৃ: ৩৩)।

আমরা আশা করব মধুময় এই সংশয় কাটিয়ে উঠবেন। আগামী দিনে আমাদের উপহার দেবেন একটি প্রাঞ্জল আখ্যান, তাঁর অসম্পূর্ণ জীবনের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত।

**রাত্রির পরিধি — মধুময় পাল**/রত্না প্রকাশন, কলকাতা-৭৫ /৩০.০০

**সাহেবগলি — মধুময় পাল**/নয়া উদ্যোগ, কলকাতা-৬ / ৫০.০০

# অক্ষরে তোমার ব্যক্তিত্ব

## উৎপল ঝা

তিনজন নারীর কাব্য অভিব্যক্তি যদি পাশাপাশি রাখা যায় তবে কিছু পার্থক্য যেমন চোখে পড়ে তেমনই কিছু সাদৃশ্যও খুঁজে পাওয়া যায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীর যথার্থ বিকাশের প্রতিবন্ধক এবং সে প্রতিবন্ধকতা তাঁরা তাঁদের যাপিত জীবনে প্রত্যক্ষ করেন ও অনুভব করেন। সংবেদনশীল শিল্পীর ক্ষেত্রে সে অনুভব সত্য কিন্তু প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রে দুস্তর ব্যবধানও চোখে পড়ে। কারও কারও দেখা বহিরঙ্গের বেড়া ডিঙোতে পারে না, কেউ আবার বহিরঙ্গের আবরণ ছিন্ন করে সত্যের সমীপে পৌঁছে তার শিল্পিত রূপকে সর্বজনীন করে তোলে। সামাজিক আবেষ্টনী থেকে কেউ কেউ যেমন নিজস্ব একাকিত্ব কাটিয়ে ওঠেন, কেউ আবার প্রকৃতির সান্নিধ্যে আস্থা খুঁজে পান। কিন্তু যিনি নিজের সত্তার গভীরে পৌঁছতে পারেন, তাঁর অনুভবী সংবেদন যথার্থ শিল্প হয়ে ওঠে । এবং শুধু শিল্পীকে নয়, শিল্প অনুরাগী সকলের কাছে তা আস্থার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।

অনুভূতির এই স্তরগুলি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে শতরূপা সান্যালের 'কণ্ঠে ফিরে যা' মন্দার মুখোপাধ্যায়ের 'কোন বালিকা চাইল' এবং বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের 'সামনে আপনারা ' কাব্য গ্রন্থে। কবি বিজয়া মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সামনে আপনারা' কাব্যগ্রন্থের শুরুতে তাঁর কাব্য অভিপ্রায়ের কথা জানিয়েছেন —

> যে জীবন যাপন করি, আর
> যে জীবন যাপন করা উচিত ছিল–
> এ দুয়ের মধ্যে এক মস্ত ফারাক, যেন সমুদ্র সমান।
> অনুভবের শরিক যদি কেউ থাকে, এই গ্রন্থে
> তারই জন্য আমার সব কথা।

কাব্যগ্রন্থের মূল ভাবটি অভ্রান্তভাবেই ফুটে উঠেছে এখানে, সামনে যে অনুভবী পাঠকরা রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যেই তাঁর কাব্য ব্যঞ্জনা, শুধু পাঠকরাই উদ্দিষ্ট নন। এখানে তাঁর নিজের সঙ্গেই সঙ্গোপন আলোচনা, আত্মকথন বুঝিবা। 'মিলির সঙ্গে একা সংলাপ' কবিতাতেও সেই বার্তা, সেই যাপিত জীবনের কথা ধ্বনিত—'সঙ্গী নেই, সঙ্গীর সময় নেই/আমারই সময় শুধু বয়ে যায়/' আর সেই সময়ের উপকূলে দাঁড়িয়ে যে বোধের সমীপে তিনি উপনীত হন, তা সঞ্চারিত করে দিতে চান পাঠকের মনে--'চোখ তো ওপরটুকু দেখে, চোখের ভেতর থেকে টের পায়/ মন। মন টের পায় সামনে বিশাল জলরাশি, স্পর্শরূপহীন, অশব্দ আবহমান জল/ ব্যাপ্ত হয়ে ঘিরে ফেলতে আসে'।

তিন দশকের বেশি সময় ধরে যে কবি কবিতার ভুবনে সৃজন-লগ্ন হয়ে আছেন তিনি বহির্জগত থেকে ক্রমে নিজের সত্তার গভীরে, বোধের গভীরে ডুব দিয়ে যে আলো-আঁধারের স্বরূপ অর্জন করেছেন, তা সঞ্চারিত করেছেন তাঁর কাব্যগ্রন্থের ৬৪টি কবিতায়। 'যা আছে তা ব্যক্তিগত, ভস্মচাপা পোড়ার ক্ষত/ কখনোই তা বলা যায় না; ধরা যায় না তাৎক্ষণিকে/ ব্যক্তিগত অসাধারণ, রয়েছে যা ভ্রূণের মায়ায়।' ব্যক্তিগত সেই বোধ তথা উপলব্ধি ধরা পড়েছে তার চারপাশের সমাজজীবন থেকে বিশেষত মোহনপুরের টুনটুনি, হরিদাসী, অমলা, চিনু, মিলি, প্রতিবন্ধী নীপা, দিদি, স্টেফিগ্রাফ প্রভৃতি বাস্তব চরিত্র ঘিরে , নারীর আবহমান কাল বঞ্চনার ইতিহাস ঘিরে রয়েছে তাকে। এবং সেই অনড় সমাজ নিগড়কে ভেঙে ফেলার অনুচ্চকিত কিন্তু দৃঢ় সংকল্পের কথাই খোদাই করা আছে সংখ্যাধিক্য কবিতায়—

১. পাথরের কানা ঘেঁষে শ্যাওলাসম আলগা ভেসে যায়
পৃথিবীর সুসভ্য গোলমাল
পুরনো পরদার কোণে ফেঁসো হয়ে লেগে থাকো,জেদ
শুধু মেথি, কালোজিরে, কেন সারাবেলা?

(দিদি)

২. গিন্নি হয়ে জুড়ে থাকো, বুড়ো বয়সে পাবে ছাতুছোলা
যে যোনা মেধার দিকে,বড়ো কষ্ট, মাথায় পাথর ।

(সে)

সমাজ পরিবর্তনের বার্তা যারা একদা বহন করে এনেছিলেন, নারীমুক্তির আশ্বাস যা ছিল একদিন, এখন সেখানে–'বিপ্লব হয়েছে ধ্বংস /এখন শুধুই ফিরি করে/স্বার্থপর প্রতিযোগী শান্তিধূপ স্লোগান।'

এমনতর আশা আর আশাভঙ্গের বেদনা ঘোষিত হয়েছে ছত্রে ছত্রে—'এভাবে মানবী তুমি অনেকের চেয়ে ঢের বড়ো।' পৃথিবী জুড়ে শঙ্কা ও দূষণ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে তাই কবির করুণ জিজ্ঞাসা—'মাটি কি উচ্ছেদ হয়, কেনা যায় ভূগর্ভের শাঁস/ পৃথিবীর গায়ের বল্কল।' প্রকৃতির সঙ্গে নারী যে মমতায়, মাতৃস্নেহে লগ্ন হয়ে থাকেন তাতে অবিমৃষ্যকারিতাকে শাসন করার অধিকারী তিনি। আর তাই 'বৃক্ষ' তাঁর কাছে 'বৃক্ষের অধিক' হয়ে ওঠে। আতঙ্কিত মাতৃরূপী নারী চেয়ে দেখে—'বিভ্রান্ত বালকের চোখে এখন শুধুই প্লাস্টিক পর্দা/জল নেই,স্বপ্ন নেই, শুধু ফোটোগ্রাফ।'

পুরুষশাসিত সমাজের নারীর মুক্তির জন্য পুরুষের ছদ্ম প্রয়াস



কবির চোখে চিরন্তন বিরোধাভাস — তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে চিহ্নিত —

১. নারী ও পুরুষ তাকে গ্রাহ্যই করে না যথারীতি
নারী বলে, ধ্বংস হোক প্রতিস্পর্ধী উদ্ধত পুরুষ
পুরুষ আলগোছে বলে, শিক্ষা পাক অকৃতজ্ঞ নারী
মনে ভাবে, হতচ্ছাড়ি যাবে কতদূর, কিন্তু গেল।

অবশেষে স্বাধীনতা, সংবাদ অফিসে রিপোর্টার
নারীমুক্তি দিয়ে তার প্রতিবেদনের হাতেখড়ি।

হাত রপ্ত হলে পর ফ্যাশান ও রান্নাবান্না—
ধবল পাতায়।

অসংখ্য সুন্দর মুহূর্ত, চিত্রকল্প ঝলসে উঠেছে ছত্রে ছত্রে— 'ধবল ছোঁয়াচে নয়, মনঃকষ্ট শরীরে ফুটেছে। 'জরদাবর্ণ ঘোর বাদামি তার হাসি।' এমনতর অসংখ্য নিদর্শন তুলে ধরা যায়। 'এখন দুর্বার ,'তুষ', 'বোঝাপড়ার খেলা', 'ভাসান','গল্পের গাছ,' 'ইচ্ছেলতা ', 'বাড়ি ওলা',' মেয়ে আর মা' এমনতর প্রায় সবকটি কবিতা মুগ্ধ বিস্ময়ে পাঠককে অভিভূত করে। শুধু 'গড়িয়াহাট রোড' এবং 'মায়াপিসিমার দু'দিন' কবিতা যেন সেই অব্যর্থতায় পৌঁছতে পারে না, তাঁর কবিতায় 'বেড়াল, 'ঠোঙা' 'যাপিত জীবন'-এর কথা ঘুরে ফিরে এসেছে। 'বেড়াল' এবং 'লক্ষ' বানান যদিও অস্বস্তি জাগায়। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, 'সহিষ্ণু ড্রয়িং হয়ে উঠোনে থমকানো বৃষ্টিজল' দেখেছেন যিনি, যিনি 'অন্তরে শিকড়ে' 'ব্রহ্মাণ্ড বিস্তার' লক্ষ করেছেন সেই কবি স্বকীয় বোধে দীপ্ত। সমগ্রতার নিরিখে কবিতার জগতে তিনি রক্ষণযোগ্যতা অর্জন করেছেন,পরিমিতির অভ্রান্ত লক্ষ্যে তিনি পৌঁছতে পেরেছেন। 'সামনে আপনারা' কাব্যগ্রন্থে 'বিপন্ন বাতাবি গন্ধ' অনুভবী পাঠককে আকুল করে তোলে।

'কবির নাম? শরৎ আকাশ/ কী লেখেন? ভালোবাসা/'

কবি মন্দার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কোন বালিকা চাইল' কাব্যগ্রন্থের শুরুতেই এই অভিপ্রায়ের কথা জানিয়ে দেন। নামকরণের মধ্যে ছেলে বা মেয়ে-ভুলানো বাংলা ছড়ার আভাস জড়িয়ে রয়েছে। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি , জগত ও জীবনের প্রতি প্রেম 'অযুত অক্ষরে' উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়। 'এমনি এমনি ভালোবাসা'র মতো অফুরন্ত অসীম বিস্তার তার। তাঁর কবিতায় উচ্চারিত জীবন-প্রেম অনাস্বাদিত আনন্দে মন ভরে তোলে। তাঁর দেখার মধ্যেও নারীর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠে–'আঠার দাগ দেখে বোঝা যায়/ভুমধ্যে টিপ পরেছিলাম/'মন্দার তাঁর স্বকীয়কাব্য-ভাষা খুঁজে পেয়েছেন।

প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গ তাঁর কবিতাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। নারী এবং প্রকৃতি শরীর কখনও বা মিলে মিশে একাকার। যেমন 'ভেজা আমপাতা' কবিতায়—'তোমাকে চিনেছি আমি/আঘ্রাত কুমারী তুমি/ তুমি বনভূমি/তুমি উপত্যকা/ উন্মুখ সুখে চাও প্রসব সংকেত/' 'বলেছ সাজিয়ে দেবে' কবিতাতেও সেই একাত্মতা চোখে পড়ে —'রতিতৃপ্ত নারী/ আসন্ন ভোরের মতো নীরব প্রসবা/প্রখর জৌলুসরাশি লক্ষবর্ষ, পরেও।' প্রকৃতির মতোই শহুরে নারীও 'গেঁয়ো কৃষিজীবীর' মতো উদগত বাসনা মেলে ধরে –'আমরা যে গেঁয়ো কৃষিজীবী। দিন আনি দিন খাই/আকাশে লাঙল টেনে/ন'তলার জানলায়/ চুপচাপ দোপাটি ফোটাই।'

'ওকে সময় দেব' কবিতায় সিজারিয়ান সভ্যতার বিরুদ্ধে নারীর বিদ্রোহ ঘোষণা, 'ছ'পন কড়ি' কবিতায় নারীর নারী হয়ে ওঠার আবহমানতা। 'শিরোমণি বাটী' কবিতায় সৃষ্টির অভিলাষ এবং 'লজ্জা পেয়েছি খুব' কবিতায় নারীর বিকাশের ক্ষেত্রে সংসারের প্রতিবন্ধকতা সুন্দর চিত্রময়তা লাভ করেছে।

'ছেঁড়া পাতা' কবিতায় পুরুষের প্রতি নারীর তির্যক ব্যঙ্গ ফুটে ওঠে 'এতো খুব সহজ/ তোমাদের একই স্ত্রী/ অসংখ্য নারী গোপনীয়...... আমার স্বামীরা তো/হাতে গোনা পাঁচ/' 'আমরা','শুভবিজয়া', 'পরবের গান' কবিতায় স্বতন্ত্র বুননেও তিনি স্বচ্ছন্দ । আবার 'রাজা মিহিরকুল', 'শিশু ভোলানাথ' 'যুদ্ধ' কবিতায় সমাজ মনস্কতা এক ভিন্নমাত্রা লাভ করে।

জীবনে অনুরক্ত থেকেও নারীর শৃঙ্খল তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না, সমাজের, পুরুষের বঞ্চনা ও ছলনায় 'মহেঞ্জোদারো মেয়ে'র চুড়ি পরা হাত তাঁর কাছে 'সামাজিক বেড়ি চিহ্ন' হয়ে দেখা দেয়। মন্দার মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় শুধু প্রকৃতির রূপে-বর্ণে-গন্ধে মুগ্ধ হয়ে পথ হারাননি, তাঁর চারপাশের জগৎ-জীবনের নানা অনুষঙ্গ ধরা পড়ে 'সংবাদ শিরোনামে','যুদ্ধ ', 'তিন কিশোরী' বা 'চার, সাদা থান' কবিতায়। 'লজ্জা পেয়েছি খুব' এবং 'চার সাদা থান' কবিতায় যে নাটকীয়তা রয়েছে তাও পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। এইভাবে মন্দার মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় বারবার নিজেকে ভাঙার, পথ বদলের পরীক্ষা চালিয়ে যান। ছন্দ ও বিষয়ও যায় পাল্টে, দেখার এই বিশেষভঙ্গি, ব্যঞ্জনা এবং নিপুণ শব্দ চয়নে, শরীরী ভাষার প্রয়োগে এক নতুনতর ঝংকার সৃষ্টি করেন।

'সাত সাতটা সমুদ্র মহিষ মাথায় চড়িয়ে নিয়ে/ অনায়াসে পা রাখি শূন্য মহাকাশে'–বলতে পারেন যিনি তাঁর কাছে পাঠকের আরও অনেক প্রত্যাশা। তাঁর উচ্ছ্বাস কিছুটা স্তিমিত হলে 'পলাশ পিয়ালের দেশ' থেকে 'দ্রিম দ্রিম দুন্দুভি মৌতাত' ছাড়িয়ে, বহিরঙ্গের আবরণ ভেদ করে নিজের সত্তার গভীরে অনুভবী সর্বজনীন জীবন সত্যকে শব্দবন্ধনে বাঁধবার উদ্‌যোগ তিনি নিশ্চয় নেবেন, যা তাঁর কবিতাকে গভীরতর তাৎপর্য মণ্ডিত করবে, কবিতাকে রক্ষণযোগ্যতা দেবে।

'কণ্যে ফিরে যা'— শতরূপা সান্যালের প্রথম কবিতার বই। 'পূর্বকথায় জানা যায় তিনি বালিকা বয়স থেকেই কবিতা লিখছেন, চলচ্চিত্র নির্দেশক শতরূপার বহুবিধ পরিচয় — তিনি গীতিকার, অভিনেত্রী, গল্পকার, সুরকার, চিত্রশিল্পী এক কথায় 'অল রাউন্ডার'। এমনতর বহুমুখী বর্ণচ্ছটা ঘিরে আছে যে শিল্পীকে তাঁর কবিতার বই স্বাভাবিক ভাবেই পাঠককে আকৃষ্ট করবে। বিশেষত তিনি অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এসেছেন। নিজস্ব রক্তক্ষরণের মধ্যে তিনি জীবনকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জেনেছেন, তাঁর এই অনুভব কাব্যভাষার যে শরীরী রূপ ধারণ করেছে তা জানবার জন্য ঔৎসুক্য জাগা স্বাভাবিক।

তাঁর মানবিকতাবোধ এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নারীর একাকিত্ব এবং প্রেমহীন জীবন-সত্যের আলো-আঁধারকে রূপদানে প্রবৃত্ত করে। আবহমান বন্দীদশা থেকে নারীর মুক্তির আকৃতি এবং বঞ্চনাযোধের সঙ্গে তাঁর কবি-সত্তার একাত্মতা ঘটে যায়। ফলে'এক ধর্ষিতা মৃত বালিকার কামিজের নীচে তাঁর নিজের 'ব্যথার রক্ত' খুঁজে পান। তাঁর পদক্ষেপে দ্বিধাগ্রস্ত নারী স্বরূপ— 'এক পা ভিতরে এক পা বাইরে। এভাবে রয়েছি অনেক সময়'। বঞ্চনার ক্ষোভ ও বেদনার সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে জীবনের অমোঘ টান — 'তুমি যদি বলো কানে কানে/ ধানসিঁড়ির কোন শব্দমালা/ শিউরে উঠি ভাললাগা ছুঁয়ে/ভালবাসা মেলে ডালপালা।' এবং ভালবাসার ডালপালা মেলার জন্য একজন অনুভবী সঙ্গীর প্রয়োজন 'এত সুন্দর পৃথিবীর আলো কালো/মিছে হয়ে যাবে কেউ না থাকলে পাশে' এই 'কেউ' নিশ্চয় যে-কেউ নয়। বিশেষত যেখানে 'অন্ধকার জেগে থাকবে একা হৃদয়ের গর্ভগৃহে' যেখানে 'ফিরে আসবে না আঠারো বছর / ফিরে আসবে না জলের বাসর' সেখানেও প্রতীক্ষা জেগে থাকে — 'জেনো ভালবাসা আজও হয়নি ধ্বংস/ এখনও সে চায় তোমারই ভাষায় কইতে।'

কাব্যগ্রন্থের ৫৮ টি কবিতার গ্রন্থনায় তিনি তাঁর অনুভবের কথা অকপটে, সহজ সরল ভাবে এমনকী অনেক ক্ষেত্রে কাব্য অনুষঙ্গ ব্যতিরেকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন, ভাবনার স্পষ্টতায় অনেক ক্ষেত্রে কাব্য সুষমা ব্যহত হয়েছে, তাঁর ব্যবহৃত উপমা ও প্রতীক বহুব্যবহৃত বা অতিপরিচিত বলে গণ্য হতে পারে। বর্তমান জগত ও জীবনের জটিলতা আধুনিক বাংলা কবিতাতেও ছাপ ফেলেছে, ইঙ্গিত বা ইশারা কাব্যশরীরে যে রহস্যময়তার ঘেরাটোপ সৃষ্টি করে, তা পাঠককে আকৃষ্ট করে। শতরূপার কবিতায় বড় বেশি স্পষ্টতা। তাঁর কবিতা পাঠে মনে হতে পারে কবিতাগুলি লেখার পরপরই ছাপতে দেওয়া হয়েছে —অর্থাৎ কবির আবিষ্টতা কবিতায় লেগে রয়েছে। যে নিরপেক্ষ দূরত্বের মধ্য দিয়ে গেলে, আরও তীক্ষ্ণতা পেত সে সময় বা সুযোগ থেকে কবিতাগুলি বঞ্চিত।

তাঁর কবিতায় বিষাদ 'তুষের মতন' জ্বলে, একা তালগাছ' এক পায়ে', ভাত 'নরম গরম মুঁইফুল', 'বুকের মধ্যে দাউ দাউ চিতা', অমৃতকুম্ভ 'ভরা থাকে বিষে' এই বহু পরিচিত ব্যঞ্জনার অতিরিক্ত কোনও ব্যঞ্জনা যুক্ত করে না। তিনি আর একটু নির্মোহ হলে, 'তুমি এলে মুঠো মুঠো গান/ জোনাকির মত ঝিকমিকায়' কিংবা 'প্রজাপতি ডানা মেলে বন্ধ ইঞ্জিনে কলা দেখিয়ে' বা 'ছোট্ট ঘরের চারদিকে জানলা যে, কোথাও একটু লুকোবার কোণ নেই'— এই ধরনের বাক্যবন্ধ অনায়াসে গভীরতর ব্যঞ্জনায় পৌঁছতে পারত, এবং সে ক্ষমতাও ছোট ছোট পংক্তির ছড়ায় প্রতিভাত। ভাল লাগে ওমেয়ে, বধূ গভীররাতে, জতুগৃহ, জল কিশোরী 'কণ্যে ফিরে যা, একা' জল প্রভৃতি কবিতা। 'কণ্যে' শব্দটি বোধকরি মঙ্গলকাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে, স্বতন্ত্রভাবে তা চিহ্নিত না হওয়ায় একটু অস্বস্তি জাগায়।

তাঁর কবিতায় কিছু কিছু পংক্তি গভীরতর ব্যঞ্জনা বহন করে আনে, উত্তরাধিকার কবিতায় 'মেডিকেলে সঙ্কে হলো রৌদ্র খসে গেল/ জানালার সবুজ শার্সিতে ' আবার 'ও আকাশ' কবিতায় জীবনের প্রতি তীব্র অনুরাগ ফুটে ওঠে—' ও আকাশ তুমি/ আমায় নেবে কি বুকে / তীব্র সোহাগে/ জীবনের অভিমুখে।'

যে কবির কলমে 'একাই দেখবি পলাশের ডালে/ আগুন ফাগুন হয়ে বসে আছে।' কিংবা ' এ জীবনে আর দেখাই হবে না/ ঢেউয়ের মাথায় দুধ সাদা ফেনা।' তাঁর কাছে কবিতার ভাষা যে 'অবাধ' নয় তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আগামী দিনে কবি শতরূপা পাঠকের প্রত্যাশার কাছে নিশ্চয় পৌঁছবেন সেই আশাস তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে।

সামনে আপনারা — বিজয়া মুখোপাধ্যায়/
মহাদিগন্ত,বারুইপুর/ ৩০.০০
কোন বালিকা চাইল- মন্দার মুখোপাধ্যায়/
প্রতিভাস, কলকাতা — ২/৩৫.০০
কণ্যে ফিরে যা — শতরূপা সান্যাল/
সপ্তাহ পাবলিকেশানস — কলকাতা-১২/২৫.০০

স্মরণ

# মতাদর্শ ও কবি অরুণ মিত্র

ঈশ্বর মানবদেহ স্মরণে আনলে কবি অরুণ মিত্র দীর্ঘায়ু। সাত দশক তিনি সক্রিয় ছিলেন, কবিতা লিখেছেন। পাঁচের দশকের গোড়া থেকে তিনি বিস্তৃত পাঠকের কাছে পৌঁছতে থাকেন। সদ্য তখন ফরাসিদেশ থেকে ফিরেছেন, তারপর চলে যাবেন এলাহাবাদে। অরুণ মিত্রের দীর্ঘ সৃষ্টিকালে কোনও একটি বিশেষ বিষয় কখনওই প্রধান হয়ে ওঠেনি। জীবনের নানা দিক,অনুষঙ্গ, অভিজ্ঞতা তাঁকে আলোড়িত করেছে, যেহেতু সংবেদনশীলতা তাঁর প্রবল, যেমন প্রকৃত কবিদের থাকে, সুতরাং তাঁর চিত্ত ও মনন নিরন্তর বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ফিরেছে। বাংলার জোলো হাওয়া ও সবুজতা, ফরাসিদেশের ছুঁচল আধুনিক জীবন এবং এলাহাবাদের খর রোদ ও হু-হু শীত তাঁর রক্তেমাংসে এনেছিল নতুন কিছু বিস্ময়, এ কথা ভাবতেই পারি। ফলে জীবন ও ব্রহ্মাণ্ডকে অনুভব করার ভিন্ন মনন ও মন হয়ত তাঁর আয়ত্তে এসেছিল। কবি তাঁর কবিতা রচনায় সতত সৎ না হলে সৃষ্টি হয়ে পড়ে আবিল, তৈরি হয় অকবিতা। তা ছাড়া কোনও একটি বিষয়ের গণ্ডিতে আটকে থেকে একই কথা বারবার বলাটা যে ক্লান্তিকর একঘেয়েমি, এ কথা অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে কবিরা যখন জেনেই গিয়েছিলেন তখন অরুণ মিত্রের মতো কবির কবিতায় কখনওই খুঁজে পাব না একটি কোনও বিষয়ের পৌনঃপুনিকতা।

তবু কেউ কেউ অরুণ মিত্রকে বাঁধতে চেয়েছেন একটিমাত্র বিষয়ের হাতকড়া পরিয়ে। তিনি নাকি কমিউনিস্ট মতাদর্শের কবি! এ এক বিস্ময় ছাড়া আর কি? অরুণ মিত্রের নিশ্চিত একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল, থাকতেই পারে, তার সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক কতটুকু? কমিউনিস্ট মতাদর্শ এবং কবিতা, এই দুটি বিষয়ে অরুণ মিত্র একেবারে পরিষ্কার একটি সিদ্ধান্তে দাঁড়িয়ে কবিতা লিখেছেন। কবে 'লাল ইস্তেহার' শিরোনামের একটি কবিতা লিখেছিলেন সুতরাং তিনি কমিউনিস্ট কবি এই কথা বলা মানে অরুণ মিত্রের কবিতা-ভাবনাকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া। তিনি নিজের কবিতা সম্পর্কে বলেছেন, '.... আমার সংবেদনই আমাকে পুরোপুরি চালায় এবং জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমার অভিজ্ঞতা তার পেছনে কাজ করে। আমার সচেতন কোনও জ্ঞান তখন হস্তক্ষেপের সুযোগ পায় না।' 'সচেতন কোনও জ্ঞান' শব্দত্রয়ীকে লক্ষ করব আমরা। এই কথাগুলিরও একটা পৃষ্ঠপট রয়েছে। প্রয়াণের মাসখানেক আগে একটি লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'মার্কসবাদের প্রতি আকর্ষণ তো ছিল বটেই এবং একটা সময় দেখবে যে আমার 'প্রান্তরেখা'-র পরে আমি আর কবিতা লিখছি না। ফলে গ্যাপ পড়ে গেছে একটা বই থেকে আর একটা বই বেরুতে। মার্কসবাদের প্রতি আকর্ষণের জন্যেই মনে হয়েছিল কবিতা লিখে কী হবে।... হ্যাঁ পরে দেখলাম যে ওটা আমার ভুল চিন্তা। আমার ভিতরে যে অনুভব বা পর্যবেক্ষণ সেটা শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে না কেন?'

এই কথাগুলি একটা বিতর্কেরও অবসান ঘটাচ্ছে। মার্কর্সবাদ যদি কারও জীবনে ব্যবহারিক ক্রিয়া হয় তা হলে তার আর কবিতার প্রয়োজন কী? কবিতা কোনও মতাদর্শকে খুশি করবার জন্য রচিত হতে পারে না। প্রকৃত মার্কসবাদী কর্মী চলবে ইস্তাহার আর অনুশাসনের অক্ষর আঁকড়ে — তার নিজের কোনও কথা থাকবে না। দিনগুজরানের চাকা সংগঠনের কঠিন লাইনে এগোবে নয় পেছবে, যার দৈর্ঘ প্রস্থ আঙ্কিক সমীকরণে বাঁধা। অরুণ মিত্র তাঁর জীবনে এই কথাটি বুঝেছিলেন অভিজ্ঞতার কয়েকটি স্তর পার হয়েই আত্ম-অতিক্রমণের সড়কে দাঁড়িয়ে। তাই তাঁর 'লাল ইস্তাহার' কবিতাটি যতই মতাদর্শীদের নাড়া দিক, সেদিন কিন্তু কবিতা-পাঠকদের আলোড়িত করেছিল, ফরাসিদেশ থেকে ফিরে 'পরিচয়' পত্রিকায় যে কবিতাটি লিখেছিলেন, যেখানে গাঢ়তর ব্যঞ্জনা ছিল 'উঠোনের লালমাচা' শব্দ-দুটিতে।

সাক্ষাৎকারে তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'প্রান্তরেখা'র নাম। এই গ্রন্থের প্রায় তেরো বছর পর তাঁর দ্বিতীয় কবিতার বই 'উৎসের দিকে' প্রকাশিত হয়। প্রান্তরেখায় একবার চোখ রাখা যাক। লক্ষে আসবে, এখানে নানা কবিতায় যেমন কমিউনিস্ট মতাদর্শের দিকে উচ্চকণ্ঠ টান আবার দেখব কিছু কবিতায় হৃদয়-সংবেদ্য কাব্যভাষা। দু'-তরফের উদাহরণ :

১. পিছনে ছড়ানো ভঙ্গুর ভীড় জমাট বাঁধে
মিছিল মিলেছে জনস্রোতে,
ঘনিষ্ট মন দ্রুত মুহূর্তে অনাবৃত
ফাটলে ফাটলে ছায়ারা ডোবে।
আবিষ্কারের চমক লেগেছে সবে —
নাবিকের চোখে দ্বীপের সীমানা ভাসে
পায়ের তলায় দ্রুততম হল যেন
বহুদিনকার উধাও গতি।
(ভূমিকা)

২. আশা-অশঙ্কায় জাগা খর অনুভব —
কম্বুরেখা ওঠে তার উর্ধ্বে অবিরাম;
অভ্রলিহ চূড়া আজ, লেগেছে সেখানে
ঈগল নখরাঘাত, বিচ্ছিন্ন পল্লব
পাখ্‌সাটে উড়ে যায় নিষ্ঠুর সংগ্রাম।
হে হৃদয়, মূল মেলো বিদীর্ণ পাষাণে।।
(হে হৃদয়)

৩. ঘোর ভ্রূ-ভঙ্গ তোমার, বিঘ্ন দুঃসহন
ছোট্ট একটি বাতায়ন আনে শত বেতাল
ভুজবল্লরী বাড়ালে, বন্ধ কর কি তাও?
তবে নিঃশ্বাস নেবার কি হবে, কোন্ উপায়?
(উত্তর মেঘ)
বা
দু বাহু ঘেরাও করে বার বার অভ্যস্থ আহ্লাদে
সোনার হরিণ আর স্মরণের বিপর্যস্ত সোনা,
দু হাতে পাথর-কাটা কঠিন কাঠামো বুঝি বাধে।
হৃদয়ের আন্দোলন ঘড়ির কাঁটায় যায় শোনা।।
(দোটানা)

এই উদাহরণগুলি থেকে উঠে আসছে কবির দ্বিধা। তাঁর মনে যেন প্রশ্ন, পথ কী? 'হে হৃদয়' কবিতার 'পাষাণ' শব্দটি পরে আর একটি কবিতায় পাচ্ছি এইভাবে —

কিন্তু কোনো সৌরভে আমি ভিড়লাম না
কোনো কুয়াশা আমাকে স্তিমিত করল না
কারণ আমার বিশ্বাস ন্যস্ত ছিল একটি পাথরে
এক অনমনীয় পাথরে।

'পাষাণ' এখানে 'পাথর' হয়েছে। সামান্য একটু বদল অথচ কী আশ্চর্য তার ব্যবধান! কিন্তু এই ব্যবধান বড়ই মৌলিক। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে আমরা উপস্থিত হয়ে দেখব তিনি চিন্তাভাবনায় অন্য রকম, অন্য মানুষ। প্রথম কবিতার বই ও দ্বিতীয় কবিতার বই প্রকাশের মধ্যে তেরো বছরের নৈঃশব্দ। এই নৈঃশব্দ কি কবিতার রহস্য-সন্ধানের কাল? সম্ভবত। তাই 'উৎসের দিকে' কবিতার-বইটিতে পেয়ে যাচ্ছি নতুন বাকপ্রতিমা, নান্দনিক নিবিড়তা ও আত্মদর্শন। সমাজ বদলের কথা কাব্যসৌন্দর্যের শর্তে নমনীয় ও বিনয়ী। একমাত্র বিষয় তো নয়ই। কবি অরুণ মিত্র এখন শুধুমাত্র কবিতার কাছেই প্রার্থনারত —

আমি হাসি আর কান্নার পেছনে আমার প্রথম স্বপ্নকে খুঁজেছি
তুমি প্রসন্ন হও।

সুধীন দত্ত এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ছায়া ছিল 'প্রান্তরেখা'-র বেশ কিছু কবিতার ছন্দে এবং শব্দে, সেই সঙ্গে ছিল তথাকথিত দায়বদ্ধতার চাপ। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে এই সবকিছু থেকেই সরে এলেন তিনি। তখন তাঁর সমস্ত সমর্পণ শুধু কবিতার কাছে।

তাঁর জীবনের নানা পর্বে তিনি কেবলই কুড়িয়েছেন মানুষকে, মানুষের পারিপার্শ্বকে। তিনি কখনওই উদাসীন থাকেননি, নিজের বিচ্ছিন্নতা ও বিষাদ তাঁর কবিতাকে ক্ষণতরেও আচ্ছন্ন করেনি। জীবনের শেষ দিন অবধি তিনি জীবনরসিক, চোখ ফেরাননি মানুষ ও পৃথিবী থেকে —

আমি কয়েক পা চলি
আবার হাঁড়িকুড়ি ছাই ভাঙা উনুন
জামাকাপড়ের আঁশ শিমুলের মত ওড়ে,
পাথরের অক্ষরগুলোয় নোনা ধরেছে
তবু তাদের চিৎকার থামে নি

এই ভাবে তিনি জীবনের মধ্যে ঘুরে বেড়ান। তাঁর চারপাশে কত পথ মানুষের কাছে পৌঁছবার। প্রত্যন্ত কোনও কুয়াশার অন্ধকারে তাঁর আকর্ষণ নেই, তাজা লাফানো হৃৎপিণ্ডের দিকে তাঁর ঝোঁক। এই ঝোঁক রোমান্টিক ঝোঁক, কোনও বস্তুবাদী ঝোঁক নয়। রোদের দিকে তাকিয়ে থাকলে যদি কেউ ভাবে বিপ্লবের দিকে তাকিয়ে থাকা তা হলে তা নিরর্থ কষ্টকল্পনাই।

'কাপ্তান, আরও তোড়ে কথা ছাড়ো, তোমার জন্যে সাজসরঞ্জাম তৈরী রয়েছে। তোমার মুখে খই ফুটবে আর টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটবে বুকে। একেবারে বিভূচক্কর লাগিয়ে দেওয়া চাই, কাপ্তান।'

এরকম পংক্তিগুলি আসলে জীবনরঙের পংক্তি। জীবন থাকতে চায় একান্ত নিজের পথিমধ্যে, সেখানে নানা স্রোত। একজন মানুষ একটি সাম্রাজ্যের মতো জটিল যেমন, কোনও



মুহূর্তে শিশুর মতো সরল। কখনও ঘোরতর লড়াকু, কখনও দিন কাটে বেদনায়। এই যে এরকম জীবন তার পরিক্রমা সরলরৈখিক নয়। নয় বলেই জন্ম নেয় নানা আবর্ত। এই আবর্ত বাস্তবে পার হবার জন্য এক এক সময় এক এক রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুজ্ঞা দর্শন ইত্যাদি তৈরি হয়। সময় যত সরে সরে যায় অনুজ্ঞা ও দর্শনগুলি মুছে গিয়ে আবার নতুন দর্শন নতুন অনুজ্ঞা। কিন্তু প্রায়-ইতিহাস-কাল থেকে আজ অবধি মানুষ এমন কিছু অর্জন করেছে যার আর ধ্বংস নেই, শুধু বিকাশ এবং মাত্রার তারতম্যই ধ্রুব। শিল্প-সাহিত্য সেই রকমই অর্জন। এর উত্তরণ কাল থেকে মহাকালে। রাজনৈতিক বা সামাজিক দর্শন কিংবা শাসন এই ভাগ্যের অধিকারী নয়। অরুণ মিত্রের কবিতায় যে জায়গাটা কাল থেকে কালোত্তীর্ণ বলে এই মুহূর্তে আমাদের মনে হবে, সেখানে অরুণ মিত্র একান্তই মৌলিক, কারও কাছে তাঁর দাসত্ব নেই। কিন্তু যখনই অরুণ মিত্র কোনও একটি নীতি বা দর্শনের দিকে আগ্রাহান্বিত হয়েছেন তখনই তাঁর কবিতা হয়েছে নিরাত্মা, নিছক কিছু শব্দবন্ধ, যেমন

সামরিক দিনে টলে নি সেনা।
নেহাইতে- পেটা কত ইস্পাতে কলক লেগে
জ্বলে আকাশ;
অস্ত্রফলকে মুখ দেখা যায় — আগামী কাল
ঝুঁকে তাকায়।

শস্যক্ষেতের গান ছিল শুনি, বধির মাটি
শোনে নি সে স্বর স্মরণকালে,
আষাঢ়ে গল্প চাষারা শুনেছে সস্প্রতিও
সেনানীর পদপাতে আজ নব প্রতিশ্রুতি।

এই পংক্তিগুলির মধ্যে আর যাই থাক কবিতা নেই। বড় বেশি বানানো। এখানে স্বপ্নেও ভাবতে পারব না কালোত্তরণের কথা। কিন্তু যখন পড়ি,

পাথরগুলো খুঁটিয়ে দেখি
যদি কোনো ঝর্ণার ছোপ কোথাও লেগে থাকে
তাদের উপর বারবার কান রাখি
যদি তারা গুঞ্জন করে

বা এই রকম সব পংক্তি, যার অভাব নেই অরুণ মিত্রের কবিতায়, তখন মনে হয় এক অনন্ত জলে অবগাহন হল যা বয়ে চলেছে উৎস থেকে মহাসময়ে। এই জলস্রোতে মানুষ জীবন ব্রহ্মাণ্ড মতাদর্শ বিশ্বাস নাস্তিক্য মত মানুষী-ব্যাপার, অন্য প্রাণীদের কথা, নিসর্গ তাবৎ সব এসে এককার, এক। এই অনুভব যে কবিতা দিতে পারে, তার যাত্রাই বোধ হয় কাল থেকে কালে, অমরত্বে।

অরুণ মিত্রের 'কবিতার পথে' নামের লেখাটিতে একটি মজার ঘটনা রয়েছে। তিনি তখন ফরাসিদেশে। একদিন তাঁর আবাসিকরা তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে বেরিয়েছেন নৈশ-অভিযানে। সবাই তাঁরা হাঁটছিলেন সমুদ্রের ধার দিয়ে। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত। তারপর 'চলতে চলতে দেখি আমাদের রাঁধুনি দম্পতি কাজের পর চলেছেন ছুটির কয়েক ঘণ্টা রাতের শহরে কাটাতে। তাঁদের দেখতে পেয়েই ছেলেরা ঘিরে ধরে দাবি জানাতে লাগল ''তোমরা চুমু খাও''। নরনারীর চুম্বন অবিশ্যি ফ্রান্সে খুবই সাধারণ এক দৃশ্য। হাটে বাটে রোদে জ্যোৎস্নায় বিজলি আলোয় যে কোনো সময়ে দেখা যায় এই চুম্বন-লীলা। কিন্তু সে তো যুগল আবেগের স্বতোৎসার। অন্যের দাবিতে প্রেম এমন প্রদর্শনী খুলবে কেন?'

এই ক'টি পংক্তির মধ্যেই যেন অরুণ মিত্রের কবিতা-ভাবনার শেকড় প্রোথিত। আবেগের স্বতোৎসারই হল কবিতার মূল জায়গা। সেখানে অন্য দাবিকে প্রশ্রয় দেবার অবকাশই নেই। তাই, অরুণ মিত্র কোনও মতাদর্শের মুখ চেয়ে কবিতা লেখেননি, এ-কথা বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হবে না কারুরই। তিনি রয়েছেন চিরন্তন কবিদের সারিতেই। **অর্ধেন্দু চক্রবর্তী**

যে লিটল ম্যাগাজিন থেকে অরুণ মিত্রের সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতিটি নিয়েছি তার নাম দিতে পারছি না, কারণ আমার কাছে রয়েছে শুধু সাক্ষাৎকারের পৃষ্ঠাগুলি। সেই পৃষ্ঠাগুলিতে নীচে ছাপা রয়েছে এ.স.পা.বি।

*কবি অরুণ মিত্র সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ আলোচনাটি অনিবার্য কারণে এই সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না। পরবর্তী সংখ্যায় সেটি অবশ্যই প্রকাশিত হবে। এবার পাঠকদের প্রত্যাশাপূরণে অনিচ্ছাকৃত অপারগতার জন্য আমরা দুঃখিত এবং মার্জনাপ্রার্থী।*

# সময়ের কবি মণীন্দ্র রায়

ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর এক চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন বাঙালি পাঠক এমনই বিস্মৃতিপরায়ণ যে অল্প কিছু দিন না লিখলেই লোকে লেখকের নাম ভুলে যায়।

কথাটা যে সর্বাংশে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, বিশেযত লেখক যদি কবি হন। এলিয়ট সাহেব যতই বলুন না কেন "Time present and time past / Are both perhaps present in the time future"। বাঙালি পাঠকের বিস্মৃতিপটু মন ও মননের কাছে এলিয়ট সাহেবের এই আপ্তবাক্য কিন্তু তেমন ফলেনি। তা ছাড়া "Perhaps" শব্দটি মধ্যে একটি অনিশ্চয়তা তো আছেই! অর্থাৎ নিজের উক্তিটি সম্পর্কে তাঁর খানিকটা দোলাচল ছিল। আমরা কি রবীন্দ্রনাথও আজকাল পড়ি? মিডিয়া যেভাবে ক্রমশই আমাদের ঘিরে ফেলছে, পৃথিবী যেভাবে একটা বোতাম টিপলেই ঘরে এসে জুড়ে বসছে, তাতে সাহিত্যের যে সমূহ ক্ষতি, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। চোখে দেখা আর বই হাতে নিয়ে পড়ায় অনেক তফাত।

১৯১৯ থেকে ২০০০ঃ অঙ্কের হিসাবে কম বেশি ৮১ বছর। ২০ বছর বয়সে পরিচয় পত্রিকায় আত্মপ্রকাশের হিসাব ধরলে লেখার বয়সও প্রায় ৬১। সে হিসাবে সময় ও লিখনপ্রতিভার তুল্যমূল্যে, আমরা কি সত্যিই মণীন্দ্র রায়কে তেমন করে স্মরণ করি বা করেছি? সাম্প্রতিক কালে একমাত্র 'পরিচয়' পত্রিকায় কবির ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। কবি যে তা দেখে যেতে পেরেছিলেন তার জন্য পরিচয় সম্পাদক অমিতাভ দাশগুপ্তের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। শুধু মণীন্দ্র রায় কেন প্রয়াত অনেক লেখকের লেখাই তেমন করে আমাদের ধেয়ানে আসে না। যেমনটি উচিত ছিল। 'উচিত' শব্দার্থ বাংলা সাহিত্যে অনেকদিনই তাৎপর্য হারিয়েছে। না হলে চল্লিশ দশকের এই বিশিষ্ট কবিকে আমরা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম কী করে? এখানেই আবার অতিপ্রজ রবীন্দ্রনাথের সেই "কিছুদিন না লিখলেই লোকে লেখকের নাম ভুলে যায়" বাক্যবন্ধটি মনে পড়ে। জীবনের শেষ পনেরো বছর মণীন্দ্র রায় প্রায় কিছুই লেখেননি অতি বিরল কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া। আজ তাঁর প্রয়াণের পর চিতায় মঠ না হোক আমরা বেদনার ভাষা গড়ে তুলছি এবং সেই বেদনাকে শব্দবন্ধ করে ছাপাচ্ছিও। এতে তাঁর আর কতটুকু লাভ? এই "লাভ" শব্দটিই আজ আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে। এই লাভই সাহিত্যকে স্বল্পমেয়াদি ব্যবসা করে তুলছে। তবু এ স্মৃতিচারণ লেখবার আগে আমি যখন মণীন্দ্র রায়ের রচনার সিংহভাগই নতুন করে পড়ে নিলাম, তখন আরও একবার আবিষ্কার করলাম, সময়ের কাছে তিনি খুব যোগ্যভাবেই তাঁর ভূমিকা পালন করেছেন। শ্রেষ্ঠ, যোগ্য, এই শব্দগুলি বাদ দিলেও প্রত্যেক কবিরই দুটি ভূমিকা থাকে। এক, সময়ের কাছে দায়বদ্ধতা; দুই এবং সেটাই সবচেয়ে জরুরি, ভাষাকে নতুন অর্থ, ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য দান। যেমন করেছিলেন মধুসূদন, করেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং নিকট সময়ে জীবনানন্দ।

কি ভাব ও ভাষায়, অথবা ছন্দের পরীক্ষানিরীক্ষায় মণীন্দ্র রায় হয়ত বা কোনও নতুন উন্মেষ ঘটাননি কিন্তু সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা অর্থাৎ প্রথম কবিভূমিকাটি তিনি অত্যন্ত যোগ্যভাবেই পালন করেছিলেন।

ত্রিশের শেষ এবং দুই বিশ্বযুদ্ধের টালমাটাল দিনের ব্যবহারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য তাঁর লেখায় আমরা যথেষ্ট পেয়েছি। আসলে সময়ের কোন অংশটুকু অধিকার করে তিনি বেঁচে ছিলেন তা তাঁর শব্দ নির্ভুলভাবে আমাদের জানিয়ে দেয়। মার্কসবাদ তাঁর অন্যতম প্রতিপাদ্য হলেও প্রধান প্রতিপাদ্য ছিল না। বরঞ্চ প্রেমের কবিতাগুলিতে এক বিশেষ স্ফূর্তি আমরা লক্ষ করি। 'স্মৃতির সংলাপ' গ্রন্থের ৩২ পাতায় লিখেছিলেন —

"রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি দেওয়া আমার সাজে না। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলাম, এখনো আছি। কিন্তু সেটা জীবনদৃষ্টির তাগিদে, চারিত্রিক সংহতির আশায়। *যাকে বলে সক্রিয় কর্মী, এ্যাকটিভিষ্ট*, সেভাবে লিপ্ত হইনি কখনও।"

সূচনায় মণীন্দ্র রায়ের কবিতায় সুধীন্দ্রনাথের উপস্থিতি খুব ভাল ভাবেই অনুভব করা যেত। যেমন "একচক্ষু" নামক দীর্ঘকবিতার শেষ স্তবক —





"তরঙ্গের খর জিহ্বা হিরণ্ময় সান্ধ্যকূলে হানে
তমিস্রার বৃশ্চিক প্রলেপ। দিন
মুছে আসে। মুক্তপক্ষ শবরের সায়কে উড্ডীন।
ভগ্নজানু একালের উজ্জীবন সম্ভাবনাহীন
নির্বোধ বুদ্ধির শূন্যে একাক্ষু পলায়নে
মরি মূর্খ কালের হরিণ।

অথবা ১৯৩৯ সালে "ত্রিশঙ্কু" প্রকাশিত হবার পরে যখন তাঁর কবিপরিচিতি বাড়ছিল, তখনকার "স্বদেশ" শীর্ষক কবিতাটি —

"ম্রিয়মান হৃতশক্তি হে স্বদেশ,
প্রণাম। শতাব্দী শেষ
বিহ্বল দিগন্তপারে, স্থাণু জনতার
স্নায়ুজালে — ধমনীর লোহিত বিস্ময়ে।
জাগে স্তম্ভিত মাটির
দলিত নিরুদ্ধ স্বাধিকার।"

কিংবা

"স্বর্ণরশ্মি দিবসের উচ্চকিত গতি
মর্মরিত জনারণ্যে আনে আজ সবুজ উল্লাস।
যুগান্ত — তোরণপথে জয়যাত্রা। শ্লথ পাশ
জীবনের জড়তার।
হে স্বদেশ প্রণাম আমার" (স্বদেশ)

এগুলি নিতান্ত সুধীন্দ্রনাথ-লিপ্ত রচনা হলেও এর গভীর আন্তরিকতা পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ না করে পারে না। মাত্র ২০ বছরের তরুণের এই রচনাকে আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁদের সম্পাদিত "আধুনিক বাংলা কবিতা" সংকলনে স্থান দিয়েছিলেন।

সরাসরি সক্রিয় কর্মী না হলেও সাম্যবাদী প্রতিটি আন্দোলনে তাঁর শাব্দিক উপস্থিতি সর্বদাই লক্ষ করা গেছে। তেভাগা আন্দোলন থেকে প্রতিটি জনতা আন্দোলনের শরিক হয়েছিল তাঁর কবিতা। স্বাধীনতা আন্দোলনে কবিতার ভূমিকা, বিশেষ করে কবির সক্রিয় ভূমিকাও অপরিসীম। সেই সমস্ত কবিরা সরাসরি সর্বজনবোধ্য ভাষায়ই কথা বলতেন। গায়ক কবি মুকুন্দ দাসের গানের ভাষার নৈয়ায়িক বিচার হোক বা না হোক সেটা শ্রোতার প্রাণের ভাষা হতে পেরেছিল। প্লেটো একবার বলেছিলেন, কবিকে মাল্যবান কর, নানা উপচারে শ্রদ্ধা জানাও, তারপর তাকে নির্বাসন দাও। এই আপাতবিরোধী উক্তিকে উনি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে, মানুষ কবিদের কথাই শুনবে কবিরা উপস্থিত থাকলে। কিন্তু কবিদের দিয়ে তো দেশ-পরিচালনা চলে না। তার জন্য চাই রাজনীতিবিদ অথবা রাজার। অর্থাৎ কবিদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাই বুঝিয়েছিলেন প্লেটো। যাকে আমরা ব্যঞ্জনা বলি, বা ইন্দ্রিয়ব্যবহারের বৈচিত্র্য বলি, বলি চিত্রকল্প বা আরেকটু এগিয়ে বলি উপমাই কবিত্ব, এগুলি সাহিত্যে অনেক পরে এসেছে। অথচ এগুলিই কবিকে আলাদা করে, করে বিশিষ্ট ও সবিশেষ। প্রথম জীবনে মণীন্দ্র রায় কবিতায় এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেননি। পারেননি বলেই জীবনানন্দকে তিনি একেবারেই শনাক্ত করতে পারেননি। সম্ভবত এ কারণেই জীবনানন্দ তাঁর অবহেলার বিদ্বেষে এসেছিলেন। পরে অবশ্য মণীন্দ্র রায় নিজের ভুল স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করেননি। এই সব উল্লেখ করছি এই কারণে, প্রথম জীবনে মণীন্দ্র রায় কবিতার শব্দকে আভিধানিক অর্থ থেকে মুক্তি দেওয়া অথবা "মেয়েলী হাতের স্পর্শ লয়ে যায় তারে" এই ধরনের জীবনানন্দীয় ব্যঞ্জনাকে তেমন প্রয়োজনীয় বলে মনে করেননি।

অথচ পঞ্চাশের পর মণীন্দ্র রায়ের কবিতা আবার একটা বাঁক নিল। একমাত্রিক সাম্যবাদ থেকে তিনি বহুমাত্রিক হয়ে উঠলেন —

"রাজহাঁসের পাখার মতো সাদা যার পাপড়ি,
আর রাজহাঁসের ঠোঁটের মতো সোনালি হলুদ যার বোঁটা,
কোথায় যেন হাওয়ায় ভাসছে শিউলি।
আর প্রতিমার চোখের মতো উচ্ছল সেই আশ্বিনের
আকাশ,
স্মৃতির মধ্যে নতুন কাপড়ের ঘ্রাণ —
মনে হয় এক্ষুণি ঢাক বেজে উঠবে
হারিয়ে যাওয়া কোনো প্যান্ডেলে।"

মাটিকে তখন তিনি নারীর প্রতীকে বদলে নিয়েছেন

"তোমার দেহকে আমি ছুঁই;
তোমার স্তনের ওপর হাত রাখি —
কৃষকের হাত স্পর্শ করে যেমন তার ধানের শীষ"।

অথবা

"কোথায়, কোথায় তুমি নারী, আমার উদ্ধার?
কোথায় তোমার করুণার অবারিত প্রপাত।
এই বাঁজা মাটির খোয়াই, তার উলঙ্গ ক্ষতচিহ্নের মতো
ভূমিক্ষয়—
কতকাল আর আমি ধারণ করবো আমার বুকে?"

শেষে

"আমাকে গ্রহণ করে, নারী, যোগ্য করো।
আমার এই বুকের খাপ থেকে ঝলসে উঠুক তোমার
উলঙ্গ তরবারির মতো স্তোত্র
আত্মাকে জাগতে দাও।" (আমাকে জাগতে দাও)

মণীন্দ্র রায়ের কবিতার বিশ্লেষণ এই স্মরণমুহূর্তে আমার কাম্য নয়। আসলে তাঁর কবিতার সত্যিকার বিচার এখনও পর্যন্ত হয়েছে বলে আমি মনে করি না। অত্যন্ত কাছ থেকে তাঁকে আমি ১৯৫৪ থেকে ১৯৬০ সালের দিনগুলিতে দেখেছি। এক সময় ট্যাক্সি কিনে তা ভাড়া দিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করার চেষ্টা করেছেন কবি। ছোট ছোট প্রায় অনুশ্লেষ্য চরিত্রে দুই একবার সিনেমায় অভিনয়ও করেছিলেন। অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে সাপ্তাহিক "অমৃত" পত্রিকা সম্পাদনাও করেছিলেন ক'য়েক বছর। অনেক নতুন কবিকে পাদপ্রদীপের আলোয় আনতে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। জীবনে যাকে বলে অর্থকরী সাফল্য তা কখনওই তিনি পাননি। এর জন্য সদাহাস্যময় পরিহাসমুখর মানুষটির কোনও দুঃখবোধ কখনওই তাঁর আন্তরিক ব্যবহারে স্পষ্ট হয়নি। অথচ চল্লিশ আর পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, সংঘাতময় রাজনৈতিক দিনগুলি তাঁর কবিতায় কখনও দুঃখ কখনওবা মানবিক বিবেক হয়ে ফুটে উঠেছে। আমাদের শ্রদ্ধাবান করেছে। কিন্তু কথাবার্তায় তার কোনও প্রকাশ ছিল না। এই সময়ের কবি শুধু সমসাময়িক কবি হয়েই থেমে থাকেননি।

আজকের আধুনিক কবিতা কোনও একজনের একক চেষ্টায় গড়ে ওঠেনি। একক কাব্যভাষার জনক রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ ছাড়া বাংলা কবিতা অনেকটাই যৌথ মেধার ফসল। এ লেখা আসলে ব্যথিতচিত্ত আমার নিজের সঙ্গে একান্তে কথা বলা। মণীন্দ্র রায়ের সঙ্গেও।

**সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত**

# বোধি-স্পৃষ্ট কবি মণীন্দ্র রায়

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের বয়সে, অর্থাৎ একাশি বছর বয়সে কবি মণীন্দ্র রায়ের মৃত্যু হল। অবশ্য, তাঁর শেষ জীবন কেটেছে দীর্ঘকালীন রোগভোগের মধ্যে। আমি তাঁকে দেখেছি ষাটদশকের শুরুতেই, কিংবা তারও কিছু আগে থেকেই। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী তো ছিলেনই, ছিলেন ইউরোপীয়দের মতন গায়ের রং, চোখের কটা মণি, ঈষৎ লাল চুলের সুন্দর সুপুরুষ। সব সময়ই হাসিখুশি, কৌতুকমিশ্রিত কথাবার্তার টান সহজেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করত সকলকে। প্রাণোচ্ছল মানুষটির প্রতি প্রথম আলাপেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম সদ্যতরুণ কবিযশোপ্রার্থী এই আমি।

আমি তখন সম্পাদনা করছি 'কবিপত্র'। এক অগ্রজের সঙ্গে গিয়েছিলাম ওঁর বাড়ি, নিউ আলিপুরে। কয়েকটি বই দিয়েছিলেন সেদিন। পড়ছিলাম আর ভাবছিলাম, এমন গভীর, নির্দোষ লেখার পাঠক তেমন নেই কেন; মনে হয়েছিল, ওঁর সমকালীন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা মণীন্দ্র রায়ের খ্যাতিকে আড়াল করেছে হয়ত মণীন্দ্র রায়কে প্রশ্ন করেছিলাম, 'আপনার কবিতা সঠিক বুঝেছেন এমন একজনের নাম যদি বলেন। তিনি তরুণ সান্যালের নাম করেছিলেন। তরুণ সান্যাল এক দীর্ঘ ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রবন্ধ লিখেছিলেন মণীন্দ্র রায়ের কবিতা নিয়ে কবিপত্রে। তখন (৬৯?) পর্যন্ত ওঁর কবিতা নিয়ে এ রকম দীর্ঘ আলোচনা হয়নি।

তারপর যতই ব্যক্তিকবির কাছাকাছি গিয়েছি, ওঁর রচনা ততই আকৃষ্ট করছিল আমাকে। যদি প্রশ্ন করা হয়, কেন? উত্তর হল, খুবই দায়িত্ববান ও পরিশীলিত ওঁর কবিতা। চল্লিশের দশকের কবি মণীন্দ্র রায়; চল্লিশের কবিতার সাধারণ চরিত্র ছিল, সমাজমনস্কতা। অর্থাৎ সমাজদলের স্বপ্ন কবিদের অনুপ্রাণিত করেছিল। শ্রমিক, কৃষক, মজুর এবং নানাশ্রেণীর সাধারণ মানুষ নিয়ে ভাবনা তাঁদের ভাষায় প্রকাশের প্রয়াস চল্লিশের কবিতাকে সহজবোধ্য ও সোচ্চার করে তোলে। সুকান্ত ভট্টাচার্য বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মনীষাদীপ্ত কবিতা ধারা থেকে সরে এসে সরাসরি বক্তব্য উপস্থাপনা এবং সমাজচিন্তাকে প্রাধান্য দেওয়ার পদ্ধতি নিয়ে এলেন। দিনেশ দাশ, মঙ্গলাচরণ, রাম বসু প্রভৃতি, পরবর্তীকালে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সামাজিক দায়গ্রহণের পথ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বিষ্ণু



দে-র অনুরাগী মণীন্দ্র রায় অন্তর্গত বোধ ও বিস্ময়কে পরিত্যাগ না করে, উপলব্ধির ক্রম উন্মেষ ও উন্মোচনেই আস্থা রেখেছিলেন এর সঙ্গে তিনি মেলাতে চেয়েছিলেন সাম্যবাদী দর্শনের ইতিবাচক দিকটিকে। এই কারণেই, তিনি উদ্দেশ্যবাদী, সোচ্চার কবিদের মতন জনপ্রিয় হ'তে পারেননি। কিন্তু, সেই চারের দশক ছিল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে উত্তাল। একদিকে গান্ধীজির অসহযোগ, ইংরেজ ভারত ছাড়ো, অন্য দিকে বামপন্থী ভাবনার প্রবল আশাবাদ সংবেদনশীল মানুষমাত্রকেই আলোড়িত করেছে।

তবু, তবু আমি যাই
আত্মগত সুখনীড় আর নয়। নয়
বিচ্ছিন্ন অলস স্বপ্ন, গোচারণ, নিকুঞ্জপ্রণয়,
(ক্ষমা ক'রো, তাই।) [অক্রূর সংবাদ]

মণীন্দ্র রায়ের 'একচক্ষু' গ্রন্থের (১৯৪২) এই কবিতাটি, পূর্বজ ধারণার বিপরীতে যাবার প্রেরণাকে নির্দেশিত করে। কবিতাটির শুরুতে আছে —

আমি যাই। / নির্বোধ কৈশোর স্বপ্ন আর নয়, ব্রজবাসী নয়। / এ পৃথিবী
রাত্রিগর্ভ, এ জগৎ ডাকিছে বৃথাই; / কক্ষচ্যুত আমার হৃদয়। /
নীরন্ধ্র পেশল দিন অষ্টভুজে টানে/ আমি যাই।/
শোণিতে শিহরে যেন দ্রাগত ঝঞ্ঝার প্রলয়।।

এখানে লক্ষ করতে হবে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যগন্ধী, স্মার্ট, একমাত্রিক রীতি ব্যবহৃত হয়নি;কবিতার শরীরের আড়াল সরিয়ে রহস্যকে নির্বাসন দেননি কবি। অথচ; সময়ের ছিলটান আকর্ষণ ও চরিত্র তিনি অনুভব করেছেন আর সকলেরই মতো। এই রীতি কোনওদিনই পরিত্যাগ করেননি তিনি, অথচ বিশ্বাসের ক্ষেত্র তাঁর সাম্যবাদী ভাবনাকে কেন্দ্র করে চিরকালই আবর্তিত হয়েছে।

১৯৩৯-এ প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ 'ত্রিশঙ্কু';৪২-এ একচক্ষু;৪৪-এ ছায়াসহচর; ৪৮-এ সেতুবন্ধের গান; ৫১-এ অন্যপথ; ৫৫-এ কৃষ্ণচূড়া;৫৮-এ অমিল থেকে মিলে;৫৯-এ মুখের মেলা ইত্যাদি প্রকাশনার সময় লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, মণীন্দ্র রায় অক্লান্ত লেখক;শেষের দিকে দীর্ঘকবিতা লিখেছেন কখনও 'প্রেম' কেন্দ্রিক, কখনও 'ভিয়েতনাম'-এর যুদ্ধ বা সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলনকে নিয়ে, যেমন 'জামায় রক্তের দাগ'। সামাজিক ভাবনা থেকে সরে থাকেননি কোনওদিনই। প্রকৃত অর্থে বোধি-স্পৃষ্ট কবি ছিলেন মণীন্দ্র রায়;স্বভাবকবি তিনি ছিলেন না। আবার ব্যক্তিক চেতনার আলো-অন্ধকারও তাঁর কবিতায় বেজেছে কাব্যিক ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়ে —

ভালোবাসাই যন্ত্রী এবং যন্ত্র একাধারে
বেজে ওঠাই আমার পরিচয়।
বয়ঃসন্ধি সকাল থেকে পড়ন্ত যৌবনে
শ্রুতির পথে তাই খুঁজি অন্বয়।

আবার ব্যক্তিগত নৈরাশ্য প্রকৃত কবির মতো তাঁরও ছিল, তার প্রকাশ —

আমি যে পাহাড়ে উঠি
চূড়া তার ভেঙে ভেঙে যায়,
থাকে শুধু উপরে ওঠার আয়োজন।

নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য তিনি স্রোতে গা ভাসিয়ে দেননি হয়ত অন্তর্মনে কিছু বিষণ্ণতা ছিল, জনপ্রিয় হতে পারেননি বলে, কিন্তু প্রকৃত কবিতা লিখতে চেয়েছেন বলে তার প্রকরণ মেনে চলেছেন, হয়েছেন ধীরে ধীরে উন্মেষিত। কবিতায় হয়েছে আত্মার উন্মোচন, একজন প্রকৃত অর্থে কবির যা হয়ে থাকে।

**পবিত্র মুখোপাধ্যায়**

# প্রসঙ্গ : 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত' নাট্যের সমালোচনা

বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪০৭-সংখ্যায় 'চেতনা'র 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' নামক নাট্যকর্মের সমালোচনা করতে গিয়ে প্রেমেন্দ্র মজুমদার মশাই অতীব ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছেন, তাই তাঁর যুক্তিজাল বিচিত্রভাবে জট পাকিয়ে গেছে। স্বভাবতই তাঁর কথা তাঁকেই ফিরিয়ে দিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে – 'একই অঙ্গে কত না রূপ!'

'একদিকে নকশাল বাড়ি আর এক দিকে বেশ্যাবাড়ি'– উৎপল দত্তের এই বিতর্কিত উক্তি যখন আলোচনার শুরুতেই স্মরণ করেন শ্রীমজুমদার, তখন মনে হয় — আলোচকের ঝোঁক বুঝি নকশালবাড়ির পতাকার দিকে, কিন্তু পরক্ষণেই 'তীর'- ঘোরানো উৎপল দত্তের ধাঁচে তাঁর অবস্থানটি দ্রুত ভিন্নমুখী হয়ে দাঁড়ায়, এবং তিনি তিক্ত কণ্ঠে ফণা তুলে বলেন — 'আমরা এই নাটকের কাহিনীতে স্পষ্টতই বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর প্রতি তীব্র বিদ্রূপ বর্ষিত হতে দেখেছি।' আবার স্ববিরোধিতার ঘূর্ণায়মান মঞ্চে দাঁড়িয়ে কামতাপুরি আন্দোলনের প্রতি মায়া দেখিয়ে বলে বসেন — 'এরকম বিকৃতভাবে সমস্যাটি তুলে ধরাটা কোন সুস্থ রুচির পরিচয়?' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য: সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের সমস্যা বিষয়ক এক আলোচনাচক্রে 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' নাটকের মঞ্চায়ন বন্ধ করার উগ্র হুমকি ছাড়া হয়েছে বামফ্রন্ট মন্ত্রীর সামনে, বাম বুদ্ধিজীবী পবিত্র সরকার-আদির উপস্থিতিতে। আর শ্রীমজুমদার আদর্শগত-বিষয়গত-প্রয়োগগত দিক থেকে এটাকে শুধরে নিতে বলেছেন।

আসলে এ-নাটকের তাৎপর্যটাই ঘুলিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে কিছু মহল্লা ও মহলে। এখন দুর্নীতি, প্রসাধনী বিজ্ঞাপন-সংস্কৃতি, আর উদগ্র লটারি কামনার ছলাৎ-ছলাৎ থাপ্পড়ে গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষকে করে তুলছে ভ্রষ্টাচারের নাট-বোলটু, নয়ত ঠেলে দিতে চাইছে অ্যালিয়েনেশনের ঊষর গর্ভে, ঠিক যেন এ নাটকের বাঘারুরই মতো। মানুষের কাছে চেতনার আলো পৌঁছে না-দিয়ে ধরে বেঁধে তাকে টেনে আনতে গেলে দৃঢ়তম দড়িও ছিঁড়ে যেতে বাধ্য। তাই তো মানুষ মুক্তির আলো থেকে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। তাই তো বাবা আম্বেদকরের গড়া সংবিধান ফেলে, পণ্ডিত নেহরুর পরিবারতন্ত্র ছেড়ে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী পেরিয়ে পশ্চাৎপদ মানুষ কাঁসিরাম-মায়াবতীর মতো ক্ষুদ্র-নেত্র ব্যক্তিত্বের মাঝে নেতৃত্বের সন্ধানে ফেরে 'দুটিপাতা একটি কুঁড়ি'র শ্রমজীবী মানুষ মাতে গোর্খাল্যাণ্ড-কামতাপুরি গড়ে মুক্তির স্বাদ পেতে কেন?

নিজের অদম্য প্রাকৃতিক শক্তি ও স্বাভাবিক সরলতাবশে বাঘারুরা তবু হাঁটে — এ-অচলায়তন সমাজ ছেড়ে, একটা কিছুর সন্ধানে। সন্ধানের ব্যাটনটা হস্তান্তরিত করার তাগিদে একখান নবীন, নিরাশ্রয় হাতও পেয়ে যায় সেই বাঘারু, চারদিকের শোষণ ও অসাধুতার জঙ্গলে, যেখানে ক্ষুদ্র স্বার্থে মানুষ বিচ্ছিন্ন ও বিভেদ-ক্লিষ্ট হয়ে ধাক্কা খায় এধারে-ওধারে, ডাইনে কিংবা বাঁয়ে, যখন পার্টি সব করে রব — যান্ত্রিকতার ইনকিলাব বা অন্যতর কিছু আউড়ে। এখানে কাউকে ডি-ক্লাস্‌ড্‌ হতে হয় না, ফোঁটা-তিলক কাটতেও বাধা নেই কারুর। দুর্নীতির সঙ্গে অনৈতিকভাবে আপস করে ক্ষমতা বজায় রাখাই পার্টির সত্য হয়ে ওঠে। 'স্ট্রাগল্‌ ফর পাওয়ার' যে 'স্ট্রাগল্‌ ফর এগজিস্টেন্স'কে পিষ্ট করে মারে, এ-সত্য উপেক্ষিত হয়। খাদ্যাভ্যাস পালটেও এম-এল-এরা চেতনাকে টিকিয়ে রাখতে পারে না, এরা পাত্তা পায় না অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ারের মতো পুঁচকে আমলার কাছে পর্যন্ত, কারণ এদের নেতার-নেতার দহরম-মহরম-সমঝোতা-মোলাকাত হয়ে আছে প্রশাসনিক আমলাশ্রেণীর সঙ্গে। তাই সংখ্যাক্ষীণ সৎ-আমলার দাবি মতো এম-এল-এ সৎ থাকতে ফেল করে। সৎ-আমলাও তাই মানুষের স্বার্থরক্ষায় অপারগ হয়ে পড়ে। আইন-আদালত হয়ে ওঠে প্রহসনের নামান্তর। মানুষ হয়ে যায় ডোবাজমির সীমা-থাম্বা, মানুষের পিঠ হয়ে ওঠে জল-জমির ম্যাপ বা উঁচুমহলের পারাপারের ভরসা। দুই বাংলার বিপরীতমুখী প্রশাসনেও কোনও ফারাক থাকে না – মিনিটের কাঁটার তিরিশটা ঘর ছাড়া।

এম-এল-এ'র 'কাকা'-ডাকে জোতদারের চিঁড়ে ভেজে না। সে চোখ রাঙিয়ে নতুন দলের সন্ধান করে। এটাই সিস্টেম। একে সেবা করে তুষ্ট করা যায় না, ভাঙতে হয়। আর নিষ্ঠার সঙ্গে যদি সিস্টেমের সেবা করা যায়, তবে ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত কিছু সুখ-



সুবিধে বাড়িয়ে নেওয়া যায় বটে, কিন্তু দাস-রূপী বাঘারুদের সঙ্গে এতে দূরত্ব বাড়তেই থাকে। সিস্টেমটা চলতে থাকে জোর কদমে। একে ভাঙবার শপথ নিয়েছিল যারা একদিন, তারা অনেকে পালটে গেছে নানাভাবে। এ-নাটকে একজন পরিবর্তিত নকশাল আমলার ভূমিকায় এসেছেন। অতীত স্বপ্নের হাতছানি সত্ত্বেও এখন তিনি সৎ-সনিষ্ঠ হয়ে আপন কাজটুকু করে যেতে চান, মানুষের সীমিত স্বার্থে। অবরবর্গীয়দের ছিঁচকে দুর্নীতি উপেক্ষা করলেও তিনি রাঘব-বোয়ালদের পুকুরচুরি ঠেকাতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু কে না জানে যে সীমিত ক্ষেত্রের বজ্র-আঁটুনি এ-সিস্টেমে ফসকা গেরো হতে বাধ্য? মানুষের মঙ্গল তাই কথার কথা হয়ে থাকে।

নগ্নদেহী বাঘারু কাদাখোয়ারা আসলে শোষিত-পীড়িত নরনারীরই প্রতিভূ, প্রতিনিধি। অথচ শ্রীমজুমদার নাটকটিকে নারীবর্জিত বলে বুঝি নারীবাদী আন্দোলনের প্রতি মেকি সহানুভূতি জানাতে চাইলেন এই সুযোগে। গল্প-নাটকেও কি তবে মহিলা-সংরক্ষণের নীতি লাগু করার কথা ভাবতে হবে? তৃপ্তি মিত্রের 'অপরাজিতা' বা আজকের ঊষা গাঙ্গুলির 'মুক্তি'র যত দোষই থাকুক, পুরুষ-বর্জনার কলঙ্ক ওঁদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে বলে শুনিনি। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে আসলে আভাসিত হয়েছে এক রাজনৈতিক বন্ধ্যাত্বের যুগ, শাসিত মানুষের অসহায় অবস্থান। স্থানটা তাই তিস্তা পার না হয়ে গঙ্গা-পদ্মা-তিতাস-ব্রহ্মপুত্র-ভলগা-মিসিসিপি-হোয়াংহোর পারও হতে পারত।

শ্রীমজুমদারের বোঝা উচিত যে আমাদের 'গণতান্ত্রিক' সিস্টেমে শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকার নিখাদ চাবিকাঠিটি জনগণের সচেতন সমর্থন বা স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির ফসল নয়। রাজনৈতিক নাটক করার অনুকূল পরিস্থিতি কেন্দ্র-রাজ্য, দেশি-বিদেশি কোনও সরকারেরই দয়ার দান নয়। শতাধিক বর্ষের 'নীলদর্পণ', 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী', বা সত্তরদশকের 'প্রবাহ', 'লাল লণ্ঠন' বা 'হিমালয় থেকে ভারী' এই সত্যেরই প্রখর সাক্ষী। তেইশ নয়, তেপান্ন বছরের স্বাধীনতা শেষেও সাধারণ মানুষের মুক্তির অর্থনৈতিক তিস্তাপার কেবলই ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে কেন? কেন ভেঙে যাচ্ছে মানুষের সততার ভিত — দুর্নীতি আর ধাঁধাবাজির ঢেউয়ের আঘাতে? সামনে নির্বাচন, অতএব সত্যকে মঞ্চে তোলা যাবে না, কেন?

সমাজ-বিশ্লেষণার এ বৃত্তান্ত অভিনয়ে সজীবতর। এর আলোকসম্পাতে কোনও অবাঞ্ছিত মায়ার খেলা নেই, বরং আছে একটা জ্বালার বিবর্ণতা। তিস্তার প্লাবন-উত্তালতা দড়ির দেয়ালে দোলায়িত হয়ে মঞ্চের সীমার মাঝে মুহূর্তে অশেষের ইঙ্গিত জুড়ে দেয়। মানুষের রুক্ষ, স্থবির জীবনের মৌচাক চিপে চিপে প্রায়শ মধুক্ষরণ ঘটায় এ নাট্যের আবহ আর গীত। লৌহদৃঢ় মঞ্চের অমসৃণ কারিকুরি সঞ্চালিত করে একটা বাড়তি বোধ : আমরা 'পদ্মানদীর মাঝি;' 'গঙ্গা' বা 'তিতাস একটি নদীর নাম' ফেলে এসেছি অনেক দূরে, কত সব যান্ত্রিক কারিগরির পথ ভেঙে, কিন্তু চেতনার ছড়ে অগ্রগতির দোলা কোথায়? বাঘারুরা আজও শুধুই হাঁটে, হয়ত অস্পষ্ট অজানা কিছুর সন্ধানে। ভবিতব্য আভাসিত হয় বিষণ্ণতার বিবর্ণ আলোআঁধারে। এ বিশ্লেষণার মাঝে সমাজ বদলের, সব কিছু বদলের, এক অভিমানী আকাঙ্ক্ষা ফুটে ওঠে – আগামী প্রজন্মের প্রতি মমতাবশে। এতে অনৈতিকতা কোথায়?

এ বৃহদ্বপু উপন্যাসের লেখক শ্রী দেবেশ রায় এবং স্লিম-স্মার্ট নাটকের নির্মাতা শ্রী সুমন মুখোপাধ্যায় মূলত বামপন্থার অনুসারী হয়েও শিল্প-সত্যের দাবির প্রতি সৎ ও সনিষ্ঠ থাকতে চেয়েছেন, থাকতে পেরেছেন, তাই তাঁদের নির্মিতি পেয়েছে এক ক্লাসিক সৃষ্টির ব্যাপ্তি ও গভীরতা, নইলে সমাজ-প্রগতির একমাত্র চালিকাশক্তি যে বাম-আন্দোলন, তার ফিউটাইল বা অকেজো হয়ে পড়ার কথা এমন দুঃসাহসের সঙ্গে উচ্চারিত হতে পারত না। বোঝা যেত না — কেন আজ বুড়োশালিখ-নীলদর্পণ-নবান্নের কৃষকেরা বাঘারুতে পর্যবসিত হয়ে পড়েছে। বাঘারু পাড়ভাঙা তিস্তা পার করে দিচ্ছে নেতাদের, অথচ তার গা থেকে আদিমতার ধুলোবালি ঝরে পড়ছে না কিছুতেই। দাবি থাকলেও মানুষের নাম পায় না সে। তার জমি নেই, জোত নেই। 'জগন্নাথ' বা আ কিউয়ের আত্মপ্রতারণাও তার নির্ভর নয়। সে অভিমান ভরে বলে, তার দল নেই, পতাকা নেই, হয়ত কোনও দেশও নেই। এ যে সভ্য দেশের, সভ্য সমাজের, সমগ্র সভ্যতার পক্ষে কত বড় লজ্জার, তা আমরা ভাবতে চাইছি না কেন? কেন, প্রিয় সম্পাদক? কোন সঙ্কীর্ণতাবশে, কোন মহৎ নির্বাচনী তাড়নায়, আমরা নিরন্ন মানুষের বৃহত্তর মঙ্গলের ব্যাপারে বাচনহীন হয়ে থাকব?

নির্মল সাহা।
৩ মহামায়া লেন,
কলকাতা — ৭০০০ ২৬।

# আলোচকের উত্তর

শ্রীনির্মল সাহাকে ধন্যবাদ। তিনি আমার লেখাটি পড়েছেন এবং সে বিষয়ে তাঁর মতামত জানিয়েছেন। যদিও আলোচ্য নাটকটিকে সমর্থনের একটি পূর্বনির্দিষ্ট দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমার অধিকাংশ যুক্তিই তিনি এড়িয়ে গেছেন, আর যে কয়েকটিও বা তাঁর আলোচ্যসূচিতে স্থান পেয়েছে সেগুলিরও যথেচ্ছ অপব্যাখ্যা পাঠককে বিভ্রান্ত করতে পারে। সুতরাং আগ্রহ না থাকলেও দু'একটি কথা আবার বলতেই হয়।

প্রথমেই জানানো দরকার যে 'চেতনার তিস্তাপারের বৃত্তান্ত নামক নাট্যকর্মের সমালোচনা করতে গিয়ে' আমি 'অতীব ক্ষুব্ধ হয়ে' পড়েছি এমত মনে করার কোনওই কারণ নেই। 'সমালোচনা' করেছি তো অনেক পরে, নাটকটি একাধিকবার দেখার পরে। 'ক্ষুব্ধ' যদি কিছু হয়েই থাকি তবে তা হয়েছি প্রথমবার নাটকটি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই। আমার মনে হয়, যে কোনও সচেতন মানুষই নাটকটি দেখে ক্ষুব্ধ হবেন। এবং নির্মলবাবু একটু খোঁজ করলে জানতে পারবেন নাটকটি সম্পর্কে এমত ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছেও বটে। বাজারি গণমাধ্যমের প্রবল ঢক্কানিনাদে সেই ক্ষোভের উচ্চারণ অশ্রুত রয়ে যাচ্ছে হয়তবা নির্মলবাবুদের কাছে, আমার আলোচনা যদি তার কিছুটা প্রতিধ্বনিত করে থাকে এবং তা নির্মলবাবুদের শ্রুতিগোচর হয়ে থাকে তবে তা সার্থক হয়েছে বলতে হবে।

আলোচনার প্রাথমিক ' কোঁক বুঝি নকশালবাড়ির পতাকার দিকে', তারপর 'তাঁর ঘোরানো উৎপল দত্তের ধাঁচে' অবস্থান দ্রুত ভিন্নমুখী' করে 'তিক্তকণ্ঠে ফণা তুলে' 'শাসকগোষ্ঠীর প্রতি তীব্র বিদ্রূপ বর্ষিত' হওয়ার বিরোধিতা (?) এবং পরিশেষে 'স্ববিরোধিতার ঘূর্ণায়মান মঞ্চে দাঁড়িয়ে সেরুকরণের যে বিভ্রান্তি প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করে চলেছে, সাধারণ মানুষ তো বটেই, বহু বুদ্ধিজীবীও তার শিকার হয়ে পড়েছেন। নকশাল, সিপিএম, কামতাপুরি ... ইত্যাদি অভিধায় ব্যক্তিকে এমনকী তার চেতনাকেও চিহ্নিত করতে না পারলে তার স্বস্তি নেই। এই চিহ্নিতকরণই হল বাজার অর্থনীতির মূলমন্ত্র। 'টার্গেট গ্রুপ' নির্ধারণের প্রাথমিক ধাপই হল চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া। বিশ্ব-পুঁজি এখন দেনার দায়ে জর্জরিত গরিব দেশগুলিতে উদগ্র উল্লাসে মেতেছে এই 'টার্গেট গ্রুপ'- অনুসন্ধানে। সমস্ত ক্ষেত্রে রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতির সমস্ত স্তরে যাবতীয় সুস্থচেতনাকে জট পাকিয়ে দেওয়ার যে পরিকল্পিত চক্রান্ত চলছে পুঁজির নির্দেশ তথা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে বহুজনই তার শিকার। যারা সেটা বুঝতে পারে 'কোঁক' দেখানো 'ফণা তোলা' বা 'মায়া দেখানো'র মতো আলো-আঁধারি বিন্যাসের সহায়তা নেওয়ার কোনও প্রয়োজন তাদের হয় না। এ সব বিন্যাস প্রয়োজন হয় উলঙ্গ রাজার পোশাকের স্তুতি করার দায়িত্ব যারা গ্রহণ করেছেন তাঁদের। পোশাক-বিহীন রাজাকে ন্যাংটো বলতে দৃষ্টির স্বচ্ছতা এবং উচ্চারণের স্পষ্টতাই যথেষ্ট।

'কিছু মহল্লা ও মহলে' এ-নাটকের তাৎপর্যটাই গুলিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে বলে আহত পত্রলেখক নাটকটির সঠিক তাৎপর্য ব্যাখ্যার যে দায়িত্ব পালন করেছেন সে বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। বড় ছোট মাঝারি, সর্বাধিক প্রচারিত, বহু প্রচারিত — নানা পত্রপত্রিকায় এই তাৎপর্যের এত ব্যাখ্যা ইতিমধ্যেই পড়েছি যে নির্মলবাবুর ব্যাখ্যা সেখানে নতুন কোনও মাত্রা যোগ করে না। কিন্তু 'সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের সমস্যা বিষয়ক এক আলোচনাচক্রে তিস্তাপারের বৃত্তান্ত নাটকের মঞ্চায়ন বন্ধ করার উগ্র হুমকি'র সঙ্গে আমার আলোচনাটি 'প্রসঙ্গত উল্লেখ' হল কি করে ঠিক বুঝলাম না। 'আদর্শগত-বিষয়গত-প্রয়োগগত দিক থেকে' নাটকটি 'শুধরে' না নিলে 'নাটকটির মঞ্চায়ন বন্ধ করার উগ্র হুমকি' কি আমার আলোচনাতেও ছিল? পত্রলেখককে অনুরোধ করব, অনুগ্রহ করে আর একবার রচনাটি পড়ুন। আলোচনার উপসংহারে আমি বলেছিলাম, 'কি আদর্শগত দিক থেকে, কি বিষয়গত দিক থেকে, কি প্রয়োগগত দিক থেকে শুধরে নেওয়ার মানসিকতা আছে কি না সেটাই বড় ব্যাপার। যা করা



হয়েছে সেটাই সঠিক এবং চূড়ান্ত ভেবে নিলে ইতিহাস থেকে বিষয়টি আপনিই মুছে যাবে।' — এটা হুমকি? ইতিহাসের হয়ে হুমকি দেওয়ার অধিকার বা সাহস পত্রলেখক কথিত 'দুঃসাহসীদের' থাকতে পারে, আমার অন্তত নেই। সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয়, যে আলোচনাচক্র প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে ১২ সেপ্টেম্বর বাংলা আকাদেমির জীবনানন্দ সভাঘরে অনুষ্ঠিত সেই আলোচনাসভাটিতে কি পত্রলেখক নিজে উপস্থিত ছিলেন? তিনি নিজের কানে শুনেছেন 'আলোচনাচক্রে তিস্তাপারের বৃত্তান্ত নাটকের মঞ্চায়ন বন্ধ করার উগ্র হুমকি ছাড়া হয়েছে বামফ্রন্ট মন্ত্রীর সামনে, বামবুদ্ধিজীবী পবিত্র সরকার—আদির উপস্থিতিতে'? সত্যের এই বিকৃতি নাটকটির টিকিট বিক্রিতে সহায়তা হয়ত বা করতে পারে, কিন্তু সততার পরিচয় দেয় না। এটা ঠিকই যে সেদিনের আলোচনায় কোনও কোনও বক্তা 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত' উপন্যাস ও নাটকে রাজবংশীদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ, সংস্কৃতি, লোকভাষা, ভাবাবেগ ইত্যাদির বিকৃত চিত্রায়ণকে প্রবল ধিক্কার জানিয়েছেন, তেমনই আবার বামফ্রন্ট সরকারের দু'জন প্রবীণ মন্ত্রীসহ পবিত্র সরকার ও সনৎ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই উত্তরবঙ্গের মৌলিক সমস্যাগুলিকে নিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনাও করেছেন। সেই আলোচনাসভায় উপস্থিত থাকার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, অনুগ্রহ করে বাজারি গণমাধ্যমের কায়দায় সত্যকে 'স্টোরি'তে রূপান্তরিত করবেন না। 'সীমিত ক্ষেত্রের বদ্ধ আঁটুনি এ সিস্টেমে ফসকা গেরো হতে বাধ্য' এই সত্যে পত্রলেখক যখন পৌঁছেই গেছেন তখন তিস্তা পারের 'স্টোরি'ও যে কোনও 'সিস্টেমে' বদলের 'হিস্টরি' গড়তে পারবে না এই মৌলিক সত্যটিও তিনি বোধহয় উপলব্ধি করেছেন। এবং শেষ পর্যন্ত 'সিস্টেম'কে ঠিকঠাক রেখে পত্রলেখক বিশেষিত 'শোষিত-পীড়িত নরনারীরাই প্রতিভূ, প্রতিনিধি' 'নগ্নদেহী বাঘারু'র অনির্দেশ যাত্রায় তো প্রমাণ হয়েই গেল যে 'স্টোরি'র হিরো নম্বর ওয়ানের 'স্ট্রাগল ফর এগজিসটেন্স' এর দৌড় কতদূর।

'শ্রীমজুমদার নাটকটিকে নারীবর্জিত বলে বুঝি নারীবাদী আন্দোলনের প্রতি মেকি সহানুভূতি জানাতে চাইলেন, এই সুযোগে।— পত্রলেখকের এই উক্তি সম্ভবত প্রাসঙ্গিক চর্চার অধিকারের সীমারেখা এবং শালীনতাবোধের সীমা অতিক্রম করে একই সঙ্গে। তাঁর পরের বাক্যটি আরও আপত্তিকর — 'গল্প নাটকেও কি তবে মহিলা সংরক্ষণের নীতি লাগু করার কথা ভাবতে হবে?' 'নারীবাদী আন্দোলন' বা 'মহিলা সংরক্ষণের নীতি' বিষয়গুলি তিনি বুঝতে না পারেন, কিন্তু অহেতুক অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য করে বিষয়গুলি নিয়ে বিদ্রূপ করার অধিকার তিনি পেলেন কোথা থেকে? মানবীবাদকে সমর্থন করতে 'শ্রীমজুমদার' কে যে কোনও 'সুযোগে'র অপেক্ষা করতে হয় না নির্মলবাবু সেটা না জানতেই পারেন, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকলেই অপরের সমর্থন যে 'মেকি সহানুভূতি' হবেই এই অতি সরলীকরণও কিন্তু পূর্বকথিত চিহ্নিতকরণেরই উপাদান। অতি সরলীকরণের বিপজ্জনক প্রবণতা ছেড়ে পত্রলেখক আমার আলোচনাটি যদি আর একটু গুরুত্ব দিয়ে পড়তেন তা হলে হয়ত এ সমস্যা হত না। আমি সুনির্দিষ্ট ভাবে লিখেছি 'এই নাটকে নারীচরিত্র এসেছে জনতার ক্ষুদ্র একটা অংশ হিসাবে। বানভাসি মানুষ যখন চর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পালাচ্ছে তখন শ্যাম্পু করা এলো চুলের দু'জন নারীকে দেখা গেছে।' অবশ্য তাঁরা প্রতিটি শোয়ের আগেই শ্যাম্পু করেন কি না বলতে পারব না, তবে আমি যতবার দেখেছি শ্যাম্পু করাই দেখেছি। একেবারে মঞ্চের কাছাকাছি বসে দেখায় দেখতে কোনও ভুলও হয়নি। অবশ্য কোন ব্রান্ডের শ্যাম্পু ছিল সেটা বলতে পারব না, বলতে পারব না কোনও কসমেটিক্স কোম্পানির স্পনসরশিপ ছিল কি না! তবে পরবর্তীকালে তিস্তার বাঁধ তৈরির সময় ওই দুই নারীর একজনকে রঙিন কাপড় কিনতে এবং অন্য জনকে ঠোঁটে রঙ মাখতে দেখে যে ধাক্কাটা পেয়েছি তাতে মনে হয়েছে স্পনসরশিপ দেওয়া কসমেটিক্স কোম্পানিটির পরিচয় বিজ্ঞাপিত হলে বরং যোলোকলা পূর্ণ হত। আমার তো জানা ছিল না যে মানবগ্রজাতির এই অর্ধাংশটি নির্মলবাবুর ভাষায় 'প্রসাধনী বিজ্ঞাপন-সংস্কৃতি'র শিকার, জানা থাকলে 'মানবীর প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন'-এর প্রশ্ন তুলে নিজেকে বিব্রত করতাম না।

পত্রলেখক বলেছেন, 'তিস্তাপারের বৃত্তান্তে আসলে আভাসিত হয়েছে এক রাজনৈতিক বদ্ধ্যাত্বের যুগ, শাসিত মানুষের অসহায় অবস্থান। স্থানটা তাই তিস্তাপার না হয়ে গঙ্গা-পদ্মা-তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র-ভলগা-মিসিসিপি-হোয়াংহোর পারও হতে পারত।' — এহেন কল্পনাশক্তিকে তারিফ করতেই হয়, মোটামুটি হিন্দি ফিল্মের 'ডিম সিকোয়েন্স'এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত'র স্রষ্টারাও এ রকম ভাবতে শুরু করলেন না তো! পোশাকের তারিফ শুনে উলঙ্গ রাজার যেমন মনে হয়েছিল সত্যি বুঝি তাঁর পোশাকটি অতি উৎকৃষ্ট!

'শ্রীমজুমদারের বোঝা উচিত যে আমাদের "গণতান্ত্রিক" সিস্টেমে শাসনক্ষমতায় টিকে থাকার নিখাদ চিকাচিটাই জনগণের সচেতন সমর্থন বা স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির ফসল নয়' — পত্রলেখকের এই পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে এই তথাকথিত গণতান্ত্রিক সিস্টেমে জনগণ নিছক বোড়ের ঘুঁটি। মেনেও নিলাম না হয় যে 'জনগণের সচেতন সমর্থন

বা স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি' দিয়ে এই সিস্টেমে কিছু হওয়ার নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে পত্রলেখকের ঠিক পরবর্তী বাক্যটির নিহিতার্থ কী দাঁড়ায়? 'রাজনৈতিক নাটক করার অনুকূল পরিস্থিতি কেন্দ্র-রাজ্য, দেশি-বিদেশি কোনও সরকারেরই দয়ার দান নয়।' তা হলে কার দান? 'জনগণের'ও নয় 'সরকারের'ও নয়, তবে কার? জনগণের উপর আস্থাহীন, কেন্দ্র-রাজ্য- দেশি-বিদেশি সরকারের প্রসাদপুষ্ট 'বুদ্ধিজীবী'দের?' ভেঙে যাচ্ছে মানুষের সততার ভিত' আর এঁদের সততা শাশ্বত মুক্তির বাণী শোনাচ্ছে বুঝি? এবং সেই বাণী শুনতেই বুঝি 'বাঘারুরা আজও শুধুই হাঁটে হয়ত অস্পষ্ট অজানা কিছুর সন্ধানে। ভবিতব্য আভাসিত হয় বিষণ্ণতার বিবর্ণ আলো আঁধারে'? এই তবে নাটকের নির্যাস! অস্পষ্ট অজানা কিছুর সন্ধানে বাঘারুদের হেঁটে যাওয়া এবং বিষণ্ণতার বিবর্ণ আলো আঁধারে ভবিতব্য আভাসিত হওয়া? তা হলে তো পত্রলেখক আমার বক্তব্যকেই সমর্থন করেছেন। আমি বলেছি 'বাঘারু হারিয়ে গেছে অনির্দেশের যাত্রায়। কল্পলোকের সন্ধানে শূন্যতায় বিলীন হয়েছে সে'। আমি নাটকের এই পরিণতির সমালোচনা করেছি। ভবিতব্যবাদী পত্রলেখক ভবিতব্যের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন 'সমাজবদলের, সবকিছু বদলের এক অভিমানী আকাঙ্ক্ষা'কে। গোলমালটা এখানেই। এবং পত্রলেখকের প্রশ্ন —'এতে অনৈতিকতা কোথায়?' এর উত্তরটাও রয়েছে এখানে। এই ভাবের ঘরে চুরি করাটাই অনৈতিকতা, 'চেতনার ছড়ে' পিছনে হাঁটাকে 'অগ্রগতির দোলা' বলে চালানোর অপচেষ্টাটাই অনৈতিকতা।

ঔপন্যাসিক ও নাটকার 'মূলত বামপন্থার অনুসারী হয়েও শিল্পসত্যের দাবির প্রতি সৎ ও সন্নিষ্ঠ থাকতে চেয়েছেন, থাকতে পেরেছেন' জেনে আশ্বস্ত হওয়া গেল। বামপন্থার অনুসারীদের পক্ষে শিল্প ও সত্যের দাবির প্রতি সৎ ও সন্নিষ্ঠ থাকতে চাওয়া ও থাকতে পারাটা যে প্রায়-অসম্ভব কর্ম এটা আগে জানা ছিল না। এবং 'তাঁদের নিমিত্তি পেয়েছে এক ক্লাসিক সৃষ্টির ব্যাপ্তি ও গভীরতা' এ তথ্যটাও নতুন জানা গেল। 'ক্লাসিক' যে তার পরিধি, তার সময়, তার গভীরতা এত ক্ষুদ্র, এত কম, এত সংকীর্ণ করে ফেলেছে সে কথাও আমাদের আগে জানা ছিল না।

আমরা আরও জানলাম বাঘারু 'অভিমানভরে বলে, তার দল নেই, পতাকা নেই, হয়ত কোন দেশও নেই'। এত 'অভিমান' অনুমান না করতে পারাটা, স্বীকার করছি, আমার ব্যর্থতা। কিন্তু পতাকা বা দল না থাকলে অভিমান হবে কেন? সেটাই তো কাম্য? বলেছেন তো পত্রলেখক — 'ডাইনে কিংবা বাঁয়ে, যখন পার্টি সব করে রব — যান্ত্রিকতার ইনকিলাব বা অন্যতর কিছু আউড়ে'— তা হলে দল না থাকাটাই তো কাম্য অবস্থান? তা হলে আবার 'অভিমান' কেন?

নির্মলবাবু একটা কথা কিন্তু অত্যন্ত সঠিক বলেছেন — 'এখানে কাউকে ডি-ক্লাস্ড হতে হয় না, ফোঁটা তিলক কাটতেও বাধা নেই কারুর'— আর সে জন্যই তো এখানে পূর্ণমাত্রায় এ-ক্লাস্ড হয়ে এবং দিব্যি ফোঁটা তিলক কেটে 'নিরন্ন মানুষের বৃহত্তর মঙ্গলের' নামে মনুষ্যত্বকে বিদ্রূপ করার যথেচ্ছ ক্যারিকেচার করা যায়।

প্রেমেন্দ্র মজুমদার

যোগাযোগের জন্য
চতুরঙ্গ দপ্তর খোলা থাকে
মঙ্গল বুধ শুক্র
বিকাল তিনটে থেকে সন্ধে সাড়ে সাতটা

H·D·F·C
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED

সাউথ অব পার্ক স্ট্রিটে
একমাত্র বাঙালি রেস্তোরাঁ

পারিজাত

অপেক্ষাকৃত ন্যায্য মূল্যে এখানে পাওয়া যায়
মাছ ও মাংসের বিভিন্ন উপাদেয় খাদ্যসম্ভার
বিড়লা তারামণ্ডলের বিপরীতে মাত্র
কয়েক সেকেন্ডের পথ
থিয়েটার রোড ও চৌরঙ্গি রোডের সংযোগস্থল।